শারদীয় • ১৪০২

সাপ্তাহ

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/২ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধাও আছে।
- মনে রাখবেন-এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত।

প্রধান শাখা অফিস :

২৪ এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা,
গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগনা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১ টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত ঃ ১৩২৫ বঙ্গাব্দ/১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	ঃ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	ঃ	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	ঃ	সদস্য
সুভাষ রায়	ঃ	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	ঃ	সদস্য
অধিকাচরণ দত্ত	ঃ	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	ঃ	সম্পাদক

সম্পাদক ঃ মানসকুমার রায়

প্রচ্ছদ ঃ রতন মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)

কলিকাতা - ৭০০ ০০১ ফোন ঃ ২২০ ৮১১৮

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৩

প্রবন্ধ

সুশীল ঘোষ	❑	ভারতের পরিবর্তিত উদারনের দেকাল ও একাল	৫
তরুণ সান্যাল	❑	প্রত্যাশা যে দড়াই	৯
মানসকুমার রায়	❑	নিরন্ত ঘোড়া	১৩
অসীম রায়	❑	শেড্ সেক্রেটারি বা ডিফ এক্সিকিউটিভ চাই	১৭
ড. নজরুল ইসলাম	❑	বাংলার হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়	১০১
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	❑	প্রসঙ্গ ঃ প্রেম প্রয়োজন	৩১
সুধীরকুমার ব্যানার্জি	❑	প্রতিকূল পরিবেশে শরৎকালীন সমবায় ব্যাঙ্ক	৪৯
ভোলানাথ দত্ত	❑	বিজ্ঞানী থেকে নীড়ম্যান	১১৩

গল্প

শেখর বসু	❑	সন্ধ্যা কালো	২৩
প্রদীপ ভাদুড়ি	❑	সমুদ্রের জননী	৩৫
দীপ ভট্টাচার্য	❑	খোঁজ	১২৩
জীবন সরকার	❑	নদী বয়ে যায়	৪১
দিব্যেশ লাহিড়ি	❑	নিঃস্বনি	৬৩
তুলসী মুখার্জি	❑	অবসর-আলাপন	৭৩
পার্থপ্রতীম গোস্বামী	❑	সে	৬৯
সায়নদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	❑	প্রতিবাদী	১৪৯
রতন মুখোপাধ্যায়	❑	ছায়েনা	১৫৩

জন্ম : ২২-১১-১৯২২ মৃত্যু : ৫-৯-১৯৯৫

তুমি রবে নীরবে

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

বিশেষ রচনা

সমীর চট্টোপাধ্যায়	নারদ	১০৯
অসিত মজুমদার	লিঙ্কন মেটিসমূর্গে যেমেন	৪৭
মেনকাদেবী রায়	অভয়	৭৭
অমলকুমার রায়	ওরলিন - রাঁচো ও ঘটনা	১৫৫

অনুবাদ গল্প

শ্যামল মৈত্র	লিট্ল মঙ্গি	১৪৫
অরুণী চট্টোপাধ্যায়	নাসরিন	১৪১

ভ্রমণ কাহিনী

মেঘরাজি মজুমদার	অমরনাথ অমরনাথ	৫৫

রস রচনা

অরূপ রায়	আমার কাওজ্ঞান	১১১

ক্রীড়াজগৎ

অজয় বসু	ভারতদের খেলায় অভাবনীয় উৎপাত	১০৩
শ্যামসুন্দর ঘোষ	এক গড়া মজার ক্রিকেট	১১৫
অর্ঘ্য ঘোষ	বিশ্বকাপ ক্রিকেট	১৩৫

নাটক

শ্রীবাসপাল সরকার	রামকাহিনী	৮১

কবিতা

কৃষ্ণ ধর	শহিদ বেদির পাদতলে	১০
শীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	আজও দেখছি	১০
অনন্ত ঘোষ হাজরা	এইসব পড় দিন ...	১৪
অপরাজিতা দেবী	পড়ন্ত রোদুর	১৪
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	নিজের প্রহরী	১৫
প্রফুল্লকুসুম ঘোষ	কষ্টের কথা যদি বলো	১৫
মধুর দাশগুপ্ত	আলো	১৬
দিবাকর মৈত্র	সূচনা	১৬
অলকেশ দাশগুপ্ত	সেদিন	১৬
বীরেন সাহা	ফুল ফুটছে	১৭
গৌতম হাজরা	নিমন্ত্রণ	১৭
বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	মুখ	১৭
অজিত বাইরী	চৈত্রের বাগান	১৮
অনিলবরণ নাথ	নারীর কাছে কিছু নেই	১৭
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে	১৮
শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়	এই তো কিছুক্ষণ আগে	১৮
প্রবীরকুমার শাসমল	পড়ন্তবেলা	১৯
সুস্মিতা হালদার	সময় নির্দিষ্ট	১৯
প্রদীপ মাইতি	কোনদিকে	১৯
অনুপম চ্যাটার্জী	চলে যাই	১৯
মেবালিস বাগচী	শারীরিক	১০০
প্রণবকুমার চক্রবর্তী	বড় উঠলে শব্দ শুনতে পাই	১০০
মেবালিস প্রধান	মুকলা জনের মমতায়	১০০
শরাণ সেন	এখানে দাঁড়াও	১৬

সম্পাদকীয়

শারদোৎসব — বাঙালীর নিজস্ব এক উৎসব। বর্ষার পর শরৎ — প্রকৃতি তার রঙ বদলায়। বর্ষার ধারাস্নান থাকেনা, শরতের সোনা গলানো রোদ ঝলমল করে কিন্তু কী ভালোই না হতো, যদি প্রকৃতি ও মানুষের জীবন একই খাতে প্রবাহিত হতো। না তা হবার জো নেই। অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ। অপরদিকে স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছে মুষ্টিমেয় মানুষ। যে কোন উৎসবই ওদের সামনে খুলে দেয় ধনগরিমা প্রকাশ করার সুযোগ। তাদের আমোদ-আহ্লাদ-কলরব-মুখর মুখের পাশাপাশি দেখা যাবে অসংখ্য ম্লান মূক মুখ। ধনবৈষম্য যতদিন থাকবে ততদিন তার ব্যত্যয় হবে না। তবু কৃত্রিম উত্তেজনায় সাধারণ মানুষকে ভরপুর করে রাখার অবিরাম প্রচেষ্টা চলবে।

"বণিকের মানদন্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদন্ড রূপে"

— রবীন্দ্রনাথ

পুঁজিবাদের বিশ্বায়ন সম্পর্কে কার্ল মার্কস

"উৎপন্ন হবার জন্য সমাজতন্ত্রবাদীদের এক অবাধের প্রয়োজন দূরবর্তীকাল অতিক্রম নিয়ে বেড়ার সময় পৃথিবীতে। অবের অবস্থা বাঁচতে হবে বিশ্ব হতে হবে সর্বত্র, সব অবাধের সঙ্গে তুলতে হবে যোগাযোগ।

"বিশ্বজনীন যোগাযোগ সম্ভবের সব যোগের উৎপন্নের ভাব ভেঙে দূরবর্তীকাল এসে নিয়েছে এক বিপ্লবীর চরিত্র। প্রতিক্রিয়াশীলদের চোখ উহা ফাঁকির নিজের পায়ের তলা থেকে তারা সরিয়ে নিয়েছে জাতীয়তার ভূমি, যার উপর তা দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত বীর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে, অথবা ধ্বংস হতে প্রতিদিন। এদের সরিয়ে নিয়ে নতুন নতুন শিল্প। এমন শিল্পের সূত্রপাত সব সভ্য যোগের কাছে হয়ে ওঠে বাঁচা-মরার প্রশ্ন ; তারা আর কাজে লাগায় যা দেশী কাঁচামাল, তাদের কাঁচামাল আসে দূরতমতম সব অঞ্চল থেকে। যে সব নিজের উৎপাদন শুধু দেশের ভোগে লাগে না, লাগে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে। পুরনো যাবতীয় চাহিদা মেটাবে হয়ে যেগের উৎপাদন। তার জায়গায় আসছে খুঁজে পাই নতুন নতুন চাহিদা, যা মেটাতে লাগে দূরের দেশ ও দূরতম সামগ্রী। পুরনো স্থানীয় ও জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা আর একদেশের অন্যদের আসছে পাই সব ক্ষেত্রের সম্বোধন, দুনিয়াজোড়া সব জাতির পারস্পরিক নির্ভরতা।

"উৎপাদনের যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তির চৌদ্দী উন্নতি ঘটিয়ে, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত সুযোগ সুবিধার সাহায্য নিয়ে দূরবর্তীরা সভ্যতাকে, এমন কি সবচেয়ে বর্বর জাতিদেরও টেনে আনে সভ্যতার বুকে। তার সস্তাদরে সস্তা দামই হচ্ছে সেই ভারী কামান, যা দিয়ে সে ওড়িয়ে দেয় সমস্ত চিনের প্রাচীর, যা দিয়ে সে বর্বরদের জন্য করে বিদেশীদের প্রতি তাদের দুর্দমনীয় ঘৃণা দমন করতে। তাদের হচ্ছে তাদেরও আগামীর সব জাতিই বন্ধ হয় দূরবর্তীয় উৎপাদন রীতি গ্রহণ করতে। যাকে তারা বলে সভ্যতা, সভ্যতে তা গ্রহণ করতে বন্ধ করে দূরবর্তীয়। অর্থাৎ সভ্যতে তারা দূরবর্তীয় করে তুলতে চায়। এক কথায় নিজেদের প্রতিমার তারা সৃষ্টি করে এক বিশ্ব" □ — কমিউনিস্ট ইস্তাহার

"Hand in hand with this centralisation of expropriation of many capitalists by few, develops ..... the entanglement of all nations in the net of the world market, and with this, the international character of the capitalist regime"

Das Capital, Karl Marx

With Best Compliments From

Calcutta Reserve Bank Employees' Co-operative Credit Society Ltd.

R B I Buildings
13, N S Road
Calcutta - 700 001

৪২তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ
১৪-২০ নভেম্বর, ১৯৯৫

উদ্‌যাপনের দিনগুলি :

১৪.১১.৯৫ : সমবায় মূলনীতির পুনর্বিন্যাস দিবস।
১৫.১১.৯৫ : সমবায় সচেতনতা দিবস।
১৬.১১.৯৫ : সমবায় বিপণন, প্রক্রিয়া এবং উপভোক্তা দিবস।
১৭.১১.৯৫ : সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন দিবস।
১৮.১১.৯৫ : সমবায় পরিষেবা ও সমবায় আবাসন দিবস।
১৯.১১.৯৫ : মহিলা, যুব ও দুর্বলতর শ্রেণী দিবস।
২০.১১.৯৫ : সমবায় নেতৃত্ব দিবস।

ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়নের সেকাল ও একাল

সুনীল ঘোষ

হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য বিজ্ঞান ও শিল্প পরিষদের মুখ অধিবেশনে ১৯৬০ সালের ২৭শে জুলাই ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের একাংশের উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হ'ল।

"ভারতবর্ষে আমাদের উপর একটি সমস্যা সমাধানের ভার বর্তেছে এবং তা হল ভারতের বিরাট জনসমষ্টির জীবনযাত্রার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে তাদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো। ইউরোপ, আমেরিকা বা রাশিয়ার সমস্যা কিন্তু অন্যরকম। তারা তাদের জনগণের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর স্তর অনেক আগেই অতিক্রম করে এসেছে। সেখানকার প্রতিটি নাগরিকের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিতে একটা ব্যাপ্ত প্রাপ্ত অংশ আছে — অবশ্য কোথাও কিছুটা কম, কোথাও কিছুটা বেশি। ঐসব দেশগুলির জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বর্তমানে তাদেরকে সম্পূর্ণ আলাদা এক ধরণের সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ার কারখানা চালু হওয়ার ফলে তারা এখন তাদের অর্ধেক শ্রমশক্তির সাহায্যে আগের মত অথবা তার থেকেও বেশি উৎপাদন করতে পারে। বাকি অর্ধেককে নিয়ে তারা কি করবে, এটাই তাদের বর্তমান সমস্যা। আমাদের কাছে বর্তমানে কেন আগামী দুই প্রজন্ম পর্যন্ত, এমন কি তার পরেও এটা কোনও সমস্যাই হবে না। কিন্তু এটা আমাদের সবসময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যে সমৃদ্ধ সমাজ তারা সৃষ্টি করেছে সেই সমাজে কিভাবে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেই কারণেই ইউরোপ অথবা আমেরিকার মাপকাঠিতে আমাদের সমস্যাগুলোকে বিচার করার প্রবণতা আমাদের পক্ষে মারাত্মক ভুল। আমাদের সর্বপ্রথম দরিদ্র স্তরে আমাদের জনগণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং কাজ — জীবন ধারণের এই মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির ব্যবস্থা করা। কর্মসংস্থানের ব্যাপারেই এগুলো করা যেতে পারে।

কিন্তু এসব আমরা কি করে করবো। কেউ কেউ মনে করেন এটা প্রত্যেকের উপরেই ছেড়ে দেওয়া উচিত সে কি করবে বা না করবে। কেন না মানুষের সমস্ত অর্থনৈতিক কারবারই পরিচালিত হয় তার নিজের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে। এইভাবে প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ স্বার্থে কাজ করে যায় তাহলে তার মোট ফলাফল সমাজের পক্ষে ভালই হবে। কিন্তু এইভাবে সব কিছুই ব্যক্তির মর্জির ওপর ছেড়ে রাখা আগে যত বেশি মানুষ পছন্দ করত এখন অধিকাংশই তা করে না। এখন অনেক অন্তত শক্তি আছে যেগুলি সুষম বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং সেজন্য আমাদের অর্থনৈতিক কর্মোদ্যমের জন্য কম বেশি পরিকল্পিত উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হই। যদি তুমি তোমার অতিরেক কিছু পেতে চাও তাহলে তোমাকে তার জন্য মোট সম্ভাব্য উপায়ে তার চেষ্টা করতে হবে। আমরা এটাকে কোনও সুযোগের জন্য ছেড়ে রাখতে পারি না। যদি কখনও কোন যুদ্ধ বাধে, তাহলে দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতেই হবে এবং এ বিষয়টি কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে রাখা যায় না। সেনা-শিবিরগুলিকে যুদ্ধ করার জন্য হর তৈরি করতে হবে। দেশকে যুদ্ধের জন্য সৈন্যবাহিনীর সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে হবে। এটা করে নেওয়া ঠিক হবে না যে সবকিছুই আপনা থেকে সন্তোষজনকভাবে এসে যাবে। যুদ্ধের সময় করা হতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, সমস্ত কারখানাই পরিচালনা করতে হবে যুদ্ধ করার প্রয়োজনে। যখন আমরা কখনও কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হব আমাদের এই ধরণের মনোভাব গ্রহণ করতে হবে তাকে কাটিয়ে উঠবে। যদি অবশ্য পরিস্থিতি তেমন ভয়ঙ্কর অথবা গুরুত্বপূর্ণ না হয় তখন কিছুটা আলাদা দেওয়া যেতে পারে। যে কোনো দেশ যদি তাদের বৈষয়িক ঘাটতি দ্রুত পূরণ করতে চায় তাহলে তাকে পরিকল্পিত পদ্ধতি গ্রহণ করতেই হবে। সে পরিকল্পনা নিয়ে মত পার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু এছাড়া দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অন্য কোন সম্ভাব্য উপায় থাকতে পারে না।"

দু-দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ করে তৃতীয় পরিকল্পনার গোড়ায় এই ছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও তাঁর সরকারের বিশ্বাসের ও বক্তব্য। পরিকল্পিত অর্থনীতির অবয়বে দেশের রূপায়ণের এই ছিল তখন নেহরু পরিচালিত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের নীতি। এই পরিকল্পনার মধ্যে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষেত্র চিহ্নিত ছিল এবং তৃতীয় সামঞ্জস্য রক্ষাকারী মধ্যবর্তী ক্ষেত্র হিসাবে সমবায়কে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই নীতির ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই ছিল এবং তার সমালোচনাও ছিল। রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশেরই সমালোচনার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত পুঁজির ক্ষেত্রের সংকোচন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের (সমবায় সহ) সম্প্রসারণ। এটা অবশ্য ঘটানো যায়নি, মূলত শাসক দলের ব্যক্তিগত পুঁজি ভোগকারী রাজনৈতিক অংশের চাপের জন্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করতে হবে যে, জওহরলাল বেসরকারি পুঁজির অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করেছিলেন।

তাছাড়া অবাধ লাগে নেহরু যুগের অবসানে একই শাসক দলের পরিচালনাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বিগত চার বছর যাবৎ বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার শর্তাবলীর কাছে ক্রমাগত আত্মসমর্পণ করে দেশকে কোথায় নিয়ে এসেছে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকলে পরিণামে দেশের হাল কি হবে। '৯১-এর আর্থিক বছর থেকে শুরু করে আই এম এফ এবং অন্যান্য বিদেশি অর্থলগ্নিকারী সংস্থা থেকে বারবার ঋণ নিতে নিতে ইকনমিক সার্ভেতে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী '৯৪-এর আর্থিক বছরে ঋণের পরিমাণ প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে। ঋণের টাকা শোধ করতে ঋণ নিতে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯২-৯৩ সালে যা ঋণ নেওয়া হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ ঋণ শোধ করতে বেরিয়ে গিয়েছিল। মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৪০% ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ : এইভাবে আমাদের দেশ এক ঋণ-ফাঁদের জালে জড়িয়ে পড়েছে এবং আই এম এফ সহ বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থাসমূহ তাদের দেওয়া শর্তগুলি ভারতকে দিয়ে বাস্তবায়িত করছে। গত কয়েক বছর ধরে উদ্বৃত্ত পুঁজিবাদী

দেশগুলিতে আর্থিক ও কাঠামোগত মন্দা চলছে। সুতরাং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কর্তৃক আরোপিত পর্যবেক্ষণীয় অবস্থানে ঐসব দেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদি যাতে অন্যদেশে তৃতীয় বিশ্বের বাজার দখল করে নিতে পারে তার চেষ্টা তারা করছে। তাদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে বাজার অর্থনীতি প্রবর্তন, আমদানি শুল্ক হ্রাস ও উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি। ফলশ্রুতি বিদেশি পণ্যের রমরমা ও দেশীয় শিল্পের সর্বনাশ। এখানে আশা দেখানো হয়েছে অর্থনীতির উদারীকরণ, অর্থনীতির বিশ্বায়ন। অবশ্য ওরা কিন্তু নিজের নিজের দেশের ক্ষেত্রে উদার অর্থনীতির এই প্রেসক্রিপশন চালু করার কথা ভাবতেও পারে না।

এই চাপের কাছে নতিস্বীকার করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ওষুধের রাষ্ট্রীয় মূল্যনিয়ন্ত্রণ নিয়ে ক্ষেত্র থেকেই পশ্চাদপসরণ করছে, যা, সংবিধানসম্মত সামাজিক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্র থেকেও ক্রমশ হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক কারণ দেখিয়ে। তাত্ত্বিক কারণ, বাজার অর্থনীতিতে সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হবে উপযুক্ত অর্থনৈতিক নিয়মে, যা কিনা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মত কোন অন্যায় করতে পারে না। আর তাত্ত্বিক কারণের আবরণে স্বদেশি ও বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দেশের অর্থকরী সম্পদ সমূহের অধিক দুর্মূল্যকে মূলধন করা। এই অবস্থাকে সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে তার নিয়ন্ত্রক নীতিগুলিকে শিথিল করতে হবে আর অর্থনৈতিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ বন্ধ করে সবকিছুই বাজারের পরিচালনার উপর ছেড়ে রাখতে হবে। অবশ্য ইউনিসেফ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী মোট দেশজ সম্পদ উৎপাদনের ঊর্ধ্বগতি বজায় থাকলেও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ভার থেকে সরকার যদি বিরত থাকে তাহলে জাতীয় অর্থনীতিতে তার বিপজ্জনক নেতিবাচক প্রতিফলন ঘটবে। এতৎসত্ত্বেও বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ভারত সরকারের উপর আর্থিক ঘাটতি কমাবার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে। এই ঘাটতি কমাবার জন্য তারা কখনো প্রশাসনিক খরচা এবং জনগণের প্রতি সামাজিক দায় বহিভূত খাদ্য ভর্তুকি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতেও খরচ কমিয়ে এনে আমাদের অধীন কিছি পরিশোধের ব্যবস্থা রাখতে। এইজন্যই সরকার তার জনগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব থেকে ক্রমশ সরে আসছে। সকলের জন্য শিক্ষা ও সকলের জন্য স্বাস্থ্য সরকারের এই ঘোষণা কেন কিছু দিন হল বন্ধ হয়ে গেছে।

বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার যাবার আগে এই কথাটি সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই কোন জাতি তার স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতিকে উপেক্ষা করে উন্নতি লাভ করতে পারে না, আর সরকারি ব্যবস্থাপনা ছাড়া এই দুটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটতেও পারে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যারা আমাদের দেশে তাদের পরিচালনা সংস্থাগুলির মাধ্যমে এই ওকালতি করছে, তাদের নিজ নিজ দেশে কিন্তু এই দুটি ক্ষেত্রে বাজেটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করে।

পরিস্থিতির গভীরতা বুঝতে গেলে ইউনিসেফের অতি সাম্প্রতিক রিপোর্টটি জানা দরকার। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের তিনি আনার মধ্যে দুই-চতুর্থাংশই ভারতীয়। মৃত্যু রেজিস্টার ৫৪% ভারতীয় এবং ভারতের নবজাত শিশুদের ৬১% কম ওজনের এবং অপুষ্টিতে ভোগে। আর ১০% ভারতবাসীর উপযুক্ত স্নান ও শৌচাগার আছে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতবাসী জীবানুযুক্ত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। ফ্লেগ ছড়াও ম্যালেরিয়া, কলেরা, আন্ত্রিক প্রভৃতি মহামারীতে হাজার হাজার ভারতীয় প্রত্যেক বছর মারা যায়, অথচ এই রোগগুলির আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা আছে এবং অন্যান্য দেশ তা করেও থাকে। অবস্থা যখন এতটা গোলমেলে সেই সময় সরকার স্বাস্থ্য রক্ষার পরিকাঠামো আরও মজবুত না করে এই ক্ষেত্র থেকে ক্রমশ পশ্চাদপসরণ করছে। বিগত চার বছর যাবত চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ ক্রমশ কমিয়ে আনছে। ১৯৯০-৯১ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে ভারত তার মোট জাতীয় সম্পদের পরিমাণের তুলনায় জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার খাতে বিশ্বে সবচেয়ে কম অর্থ ব্যয় করে এবং ১৪-এর আর্থিক বছরে এর পরিমাণ আরও কমে এসে দাঁড়ায় ১.৫%-এ। এই একই খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করে ১৩.৩% এবং কানাডা, ফ্রান্স ও জার্মানী প্রত্যেকের ব্যয় ১০%।

একদিকে এই ব্যয় সঙ্কোচ এবং অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোম স্থাপনে উৎসাহ প্রদান [illegible] চলেছে। এর ফলে চিকিৎসার খরচ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং গরীব চুক্তির ক্রমবর্ধমান বাজারে ওষুধ পত্রের দাম যে গতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তাতে যে সামান্য সুযোগ সরকারি স্তরে পাওয়া যেত তাও সাধারণ মানুষের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে মানুষের স্বাস্থ্য একটা গভীর পরিণত হয়েছে। চিকিৎসা একবার আরম্ভ পর তা এর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ যোগাতে পারে তাও কেবলমাত্র সচ্ছলদের, গ্রামীণ জনসাধারণের চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর হাল অবনতির চরমে। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকাঠামো থেকে সরকার যতই হাত গুটিয়ে নিচ্ছে অবস্থা ততই জটিল আকার ধারণ করছে। পৃথিবীর কোনও দেশেই জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারের এই উদাসীন নেই।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও নরসীমা সরকার আই এম এফ-এর নির্দেশের কাছে ভারতীয় সংবিধানের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশিকাকে বিসর্জন দিয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার আগেই স্কুল ছেড়ে দেয় ৪০% ছাত্র-ছাত্রী এবং অষ্টম শ্রেণীতে 'ড্রপ আউটের' সংখ্যা ৫৮%। তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা প্রায় ৮০%। মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই হার পরবর্তীকালে আরও বেড়ে চলেছে। দেশে শিশু শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। সরকার রাও নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে কবে বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের সুযোগ করে দেবেন না কেন আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত পথে যে আর্থিক সংস্কার চলেছে তাতে পরিস্থিতির বিশেষ কোন হেরফেরের সম্ভাবনা কম। ১৯৯৫-৯৬-এর বাজেট পরিকল্পনা খাতে শিক্ষার বরাদ্দ আগের বছরের থেকে ১৬ ভাগ বাড়ানো হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করছে। কিন্তু যেটা তারা চেপে যাচ্ছে সেটা হল পরিকল্পনা বহির্ভূত শিক্ষাখাতে ৪.৪ ভাগ কমানো হয়েছে এবং বিদ্যালয়গুলির বৃহৎ অংশই পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে পড়ছে। প্রতি বছর ১০% হারে মুদ্রাস্ফীতির হিসাব ধরলে দেখা যাবে এই অর্থ বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় কিছুটা কম। বিশ্বব্যাঙ্ক একদিকে অর্থনীতির উদারীকরণ-এর পক্ষে ওকালতি করে আর অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্রমবর্ধমান সামরিক পরিকাঠামোর অবকাঠামোর উন্নয়ন করে তাদের বার্ষিক বিবরণীতে। এটা ঘটছে নিয়ন্ত্রণগুলি কর্তৃক কারখানার শ্রমিকের রক্ত নিংড়ে নিয়ে মুনাফা অর্জন এবং সেই মুনাফার

একটি অংশ নিয়ে মন্দির তৈরি করে' তাদের লোকশিক্ষকদের পরিচয় দেওয়া। স্কুলে সরকারী আর্থিক সাহায্যতা কমিয়ে সেখানে বেসরকারি অর্থ যোগানের সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়ে শিক্ষার বিষয়টিকেও বাজার অর্থনীতির মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ভিতর দিয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং নৈতিকতা বিষয়ে সরকারের নেতিবাচক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। বিদ্যালয়ে সরকারি সাহায্য যতটুকু দেওয়া হয় তার সবটাই প্রায় চলে যায় শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন খাতে। শিক্ষাক্রমকে উন্নত করতে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং বেসরকারি সাহায্য এই বিষয়ে শিক্ষাক্রম নির্ণায়কের ভূমিকা নেবে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অবস্থা আরও করুণ, কেননা পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত উভয় খাতেই বাজেট বরাদ্দ ১৫-১৬ সালে আগের বছরের তুলনায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে স্বাস্থ্যের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও দ্রুত বেসরকারি অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটছে। প্রতিটি শহরে ব্যাঙের ছাতার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এরা যা খুশি অর্থমূল্য ধার্য করছে ছাত্র-ছাত্রীদের তাই নিয়েই সে সব জায়গায় ভর্তি হতে হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজগুলিতে অনেক জায়গায় উচ্চ হারে ক্যাপিটেশন ফি চালু হয়েছে। সরকারের শিল্প ঘরে এবং বেসরকারি অর্থের অনুপ্রবেশ যতই বেশি ঘটছে ততই উচ্চ শিক্ষা একটি পণ্য হিসাবে ধনী শ্রেণীর কাছে সহজলভ্য ও মধ্যবিত্ত ও পরিবর্তনের কাছে দুর্লভ হয়ে উঠছে।

এই সীমাবদ্ধ আলোচনার মধ্য দিয়েও নেহরু সরকারের দেশের পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্পর্কে নরসীমা রাও সরকারের পরিকল্পিত উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যটা আশা করি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। কেননা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আজও আছে, হয়ত আগামী দিনেও থাকবে। কিন্তু উন্নয়নের যে ভিত্তিগুলি তৈরি হয়েছিল তার অংশেরূপের ওপর দিয়ে এই পরিকল্পনার রথ তার পথ করে নেবে ভারতীয় জনগণের সুবৃহৎ অংশের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান ও সংস্কৃতির বিনিময়ে। □

With Best Compliments From

The Postal Co-operative Credit Society Ltd.

G P O Buildings.
Calcutta - 700 001

With best compliments from

The Electro Urban Co-operative Credit Society Ltd.

Victoria House
Calcutta - 700 001

ডাকঘর

মাসিক আয় প্রকল্প

সুদের হার বছরে ১৩%

•

সুদ মাসে মাসে দেওয়া হয়

•

এক বছর পর টাকা তুলে নেওয়া যায়

•

৬ বছরের মেয়াদ শেষে ১০% বোনাস

কিষাণ বিকাশ পত্র

৫½ বছরে টাকা ডবল

•

২½ বছর পর টাকা তোলার সুবিধা

পোষ্ট অফিস

রেকারিং ডিপোজিট স্কীম

অল্প অল্প করে টাকা জমা দিয়ে একসঙ্গে মোক টাকা পাওয়ার অপূর্ব সুযোগ

•

কয়েকটি ক্ষেত্রে জীবন বীমার সুযোগ

•

১০০ টাকার পাশবই-এ ৫ বছরের মেয়াদ শেষে পাওয়া যাবে ৮৩৩৪ টাকা

এজেন্টের মাধ্যমে স্বল্পসঞ্চয় করুন

জনসাধারণের সুবিধার জন্য সরকারি স্বল্পসঞ্চয় এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা আপনার অফিস/বাড়ী থেকে টাকা সংগ্রহ করে ডাকঘরে জমা দেবেন এবং যথাসময়ে আপনার পাশবই/সার্টিফিকেট আপনাকে পৌঁছে দেবেন

- এজেন্টের হাতে টাকা দেবার সময়ে অবশ্যই তাঁকে সরকারি মেসেঞ্জার ব্যাজ নিয়ে নিশ্চিত হন
- আপনার পাশবই ও সার্টিফিকেট সময়মত ফিরে পাবার দাবী করুন
- মূল/আসল ফেরৎ দেবার প্রয়োজন হলে এই নিয়ে নিশ্চিত হন যে এই আপনার কোন নিকট প্রতিনিধিকে লিখে দিন

যে কোন বিজয়ীর ডাকঘরে পাওয়া যায়

স্বল্পসঞ্চয় অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রবন্ধ

প্রত্যাসন্ন যে লড়াই

তরুণ সান্যাল

জর্জ ইর্ভিন, ওর্মে বাল্লিক বিরোধের আতারোনো একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "অলোড়িৎসের পর পৃথিবীতে কবিতা লেখাটাই বর্বরতা।" ইয়োরোপে ইহুদি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য হিটলার তার গেস্টাপো ও এস এস বাহিনী ৬০ লক্ষ ইহুদি আবালবৃদ্ধবনিতাকে না খাইয়ে অনাহারে রেখে, গুলি করে, গ্যাস চেম্বারে আগুন জ্বলে খুন করেছে। ইতিহাসে এই নিধনযজ্ঞের নাম মহাবিনাশ, হলোকস্ট। ইওরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত খুন হয়েছে পাঁচ কোটি মানুষ। এক লক্ষ মেশেই দু'কোটি। এশিয়ার রঙ্গমঞ্চে মার্কিন ও জাপানি বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে দেখিয়েছেন, দু'পক্ষের সৈন্যই মারা পড়েছে প্রায় সত্তর লক্ষ। ১৯৩৭ থেকেই চিনের উপর নৃশংস জাপানি হামলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন হয়েছে, মৃতদেহ হয়েছে। জানা গেছে, জাপানি সৈন্যরা বন্দির বন্দুকের বদলে চিনা বন্দীদের বুকে-পেটে-পিঠে মেশিনগান প্র্যাকটিস করতো। জাপ সরকার ফেরিয়া দখল করে জাপানি সৈন্যদের নর্ম সহচরী বানিয়েছে হাজার হাজার কোরিয়ান তরুণীকে। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট হিরোশিমার পারমাণবিক মেঘের আঘাতে যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে মুহূর্তে দু'লক্ষ মানুষ সাবড়। সে তো আমরা প্রতি বছরই ঐ বিভীষিকা স্মরণ করে বিস্তার বিই মৃত্যু ব্যবসায়ী রাজনীতিক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও সেনা-নায়কদের। হিরোশিমার সেদিন যারা মরেছে, তারা মরে বেঁচেছে। যারা বেঁচে ছিল, তারা ছিলে ছিলে তাল পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তায় বিষে পচে-গলে মরেছে। পঞ্চাশ বছর পরেও সেই জীবন্মৃতদের মৃত্যুর বিরাম নেই। সম্প্রতি জানা গেছে, কয়েকটি দেশে শক্তিশালী নিরাক সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা শুরু করেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের এক প্রবাল দ্বীপে। পরিবেশরক্ষী একদল স্বেচ্ছা-সেবী আদালতে করে ঐ পরীক্ষার অজুহাতে নিয়ে পরীক্ষা বন্ধ করাতে চেয়েছে। একটা জাহাজ তাদের ডুবিয়ে দিয়েছে আগেই, বাকি জাহাজের উপর হামলা চালিয়েছে ফরাসি সরকার। ফরাসি সৈন্যবাহিনীর অন্তত কেউ কেমনও গুলি বিস্ফুরণ হয়েছে, তাকে পাঠানো হয়েছে ঐ প্রবাল দ্বীপে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বোমা পরীক্ষার সরঞ্জাম বসাতে। বেতারাঘাতে তেজস্ক্রিয় বিষে আক্রান্ত হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পঞ্চাশ বছর কেটে গেলেও তার রেশ মরেই যেতে। এক জাতির সঙ্গে অন্য এক জাতির আক্রোশ-বিদ্বেষ। এমন কি নিজ দেশের মানুষজনকেও মারবার মতিক সহ বানানো হচ্ছে। যেমন নাৎসিরা করেছিল জার্মান, ইহুদি, কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের।

যুদ্ধ আগেও হয়েছে। যুদ্ধের কারণ এক সময় ছিল পরের সম্পদ কেড়ে নেওয়া, অথবা নিজের সম্পদ রক্ষা করা। কারণ পশু শিকার ছিল জীবন ধারণের উপায় তখন আমাদের অরণ্যে তোমাদের প্রবেশ নিরাপদ ছিল না। কেননা পশুর যোগান সীমাবদ্ধ। কিন্তু জনসংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় অথই হলো সেই উপায়টির সংস্থানে টান পড়া। কৃষি আবিষ্কারের পর্যায়েও একই কারণ ছিল। কৃষি উৎপাদন খুব একটা বাড়াবার উপায় ছিল না, লোক বাড়িয়ে বেশি জমি চাষিল না করলে। তাই ছিল দাস পাবার জন্য হামলা। ইতিমধ্যে সমাজে শ্রেণী বেড়েছে, যারা সমাজের মাথা তারা জমির মালিক, খনির মালিক, বনের মালিক হলে, বাকি সবাই তাদের জমি-খনি-বনে কাজ করে দেয়। কখনো দাস হিসাবে, কখনো ভূমিদাস হিসাবে। সে যুগে এক মহান প্রথানই দলবল জুটিয়ে অন্য মহানের মধ্যমি জমির উপর হামলা করতো। এই প্রধানরা সব রাজাগজা। সব মহানেরই গ্রহণের তয় আছে। তারা শক্তসমর্থ বাড়ি বানিয়ে তাদের নানা সামগ্রে পুষতো। এদের সম্মিলিত নাম সৈন্য। এই মহান প্রধানের কোন প্রজার ঘরে মেয়েটি সুন্দরী জন্মেছে, কোন রাজার (মহানের) ঘরে একটি সুন্দরী রাজকন্যা বড় হলো, ব্যাস, প্রজা হলো তো জবরদস্তি ধরেবেধে নিয়ে এলো। নাহিলে যুদ্ধ করো, বীর্যশুল্ক করে তাকে ঘরে আনো। রাজবংশের ছেলেমেয়েরা যে সুন্দর দেখতে হতো, তার কারণ এই নারী লুঠ করার ক্ষমতা। তারা যে জল খেয়ে পারতো, তাও ঐ লুটেরাদের ক্ষমতার দক্ষিণেই ঘটতো। তবু রাজা রাজাই। সমাজ বিন্যাসের বিশেষ পর্যায়ে রাজাই ছিল সমাজ এককার শক্তি। সেটাকে মেনে নেবার প্রতীক। সভ্যতার আরেক নাম মানুষ মারার হলা-কলা বাড়ানোও নয়। জানা গেছে, কুক সাহেব এক দ্বীপে নেমে গুলি করে অনেক মানুষ মেরেছিলেন, তাতে অবাক সরদার জিজ্ঞাসা করে, এত মানুষ যে তুমি মারলে সব খেতে পারবে তো?

কি কি লুঠ করতে হয় কোন দেশ তার করতে? সে দেশের প্রেডি-খেডি-চাহি। অর্থাৎ খাদ্য-নারী-বাসস্থান। প্রায় ভরুইবীয় সার-ভাইতাল তব হু বিটোস্ট আর কি। পৃথিবীতে শস্য-নারী-গৃহ ছিল সীমাবদ্ধ। কৃষি উৎপাদন ছিল আজলিল, জনসংখ্যার সিংহি ভাগে ছিল নারী, আর কৃষি উৎপাদনের কিছু সম্পদ জমা হলেই তো তা ছেড়ে মেরে সুন্দর বাড়িঘর বানানো যায়। পরাস্ত দেশগুলিকে ছেনতা করার কারণও ছিল অনেক গেলা, পাকাবাদের মাঠ পুড়িয়ে দেওয়া, বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া, তরুণী মেয়েদের চরম অপমান করা। আমরা ছেলেবেলার ইতিহাসে পড়েছি, সেনাপতি শীবাজি শিবাজীদের দমন করেছিলেন। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে কিন্তু ইজ্জত লোভ দেখিয়েছিলেন, আর তরুণীদের মেয়ের কর্তন নিয়ে। বহু রাজা অবশ্য রাজ্য চালাবার জন্য কিছু নীতি নিয়ম চালু করেছিলেন। নাহলে ঐ যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে না — "নৃপতি অমরেও যাহন না মনে / চলেছে পীড়ন

যুক্ত দু পাশে / ওনিতে আসিনি পর মাঝখানে / ন্যায় বিধানের ভাষা'। রাজার আসনেই ন্যায় নীতির বিধান। অন্তে অন্তে তবু মনুসংহিতা-অনুশাসন-বাণীর পাওয়া গেছে।

যতদিন উৎপাদনের উপায় ছিল কৃষিই মাত্র, কৃষির উৎপাদনের সঙ্গে মানুষের বেঁচে থাকার বিষয়টাই প্রধান ছিল। তোমার দেশে অনাবৃষ্টি, তাহলে বাহুবলেও অনাবৃষ্টি বন্ধ। বর্ণী-নির্বনে বিভেদ নেই। 'পর্জন্যে' গ্রাম থেকে জমিদার মহেন্দ্রেরও নিস্তার নেই। তবে তার ঘরে কিছু আসে — মুষ্টিমুষ্ট ছোটে। পরিষ এমন কি নারায়ণেও তখন ছেড়ে প্রস্তুত। বিষে এমন ক্ষমতাশালী।

এমন সমাজে বীরত্ব বলতে কি বোঝায়, আপন ছেলে-বেটি-বউ রক্ষা করা। তাছাড়া, আপনেরটা নিজেই করা। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি, ঢাল তরোয়াল হাতে বীরেরা স্বদেশভূমি রক্ষা করছে। তিন দেশ জয় করছে। শিশু কবিতা বা লোকছড়ায় বরা পড়েছে এমনি আক্রমণকারী বর্গীদের ছবি। 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' আরো ভয়ানক ছবি আছে। "একজন ছাড়ে তো অন্য জন ধরে / রমণের তরে নারী হা হা শব্দ করে"। হিন্দু পাদ পাদশাহীর নন্দী ভৃঙ্গীরা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে উড়িষ্যা ও বাংলায় যে কাণ্ড করেছিল, আজও শিবাজির নামে বল পাকানো বাল ঠাকরের বাঙালিদের ওপর মহারাষ্ট্রী ঘৃণাই পড়ন্তের সেই রীতি প্রথা অনুসরী যেন।

পুঁজিবাদ কিন্তু কৃষিকে মূল উৎপাদনের উপায় আর মনে করে না। সমাজের স্তিতি যত বেশি কৃষি ততই দেশের অধিকাংশে মানুষ কৃষিতে কাজ কৃষি করে। জাতীয় আয়ের সিংহভাগটাই আসে সেখানে কৃষি থেকে। মার্কিন দেশে যেমন শতকরা তিন ভাগ মানুষ, ব্রিটেনে চার ভাগ মানুষ কৃষিকর্মে রত থাকে। তাহতে। প্রায় সাতষট্টি শতাংশ। দেশে যত কলকারখানা বাড়ে ততই মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অনুপাত কমতে থাকে। অবশ্য, রাসায়নিক সার, আবিষ্কৃত উচ্চ ফলনশীল বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি, উন্নত সেচ প্রভৃতির সাহিত্যে কৃষি উৎপাদন বহু বহু বৃদ্ধি পায়, দেশের চেহারা উন্নত পড়ে। এই তো ভারতের মতো দেশে ১৯৫১ সালে কৃষি উৎপাদন ছিল মাত্র পাঁচ কোটি টন। এখন তা বেড়ে হয়েছে আঠারো কোটি টন। আরো বাড়বে। শোনা যাচ্ছে, গমা অববাহিকার জমিতে যে সব উৎপাদন বন্ধ সম্ভব তা দিয়ে শুধু ভারতকে নয়, সারা পৃথিবীর চল্লিশ শতাংশ মানুষকে খাওয়ানো যায়। যেমনি তদুপ জাতীয় খাদ্য উৎপাদন বাড়বে যে সবের একাদশ গোরু-মোষ-ভেড়া-ওওর-হাঁসমুরগিকে খাইয়ে মাংস-দুধের যোগান বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায়। বিজ্ঞান-প্রকৌশল বিপ্লব এসব অবস্থা ঘটিয়েছে। পৃথিবীর মানুষের, সত্যি সত্যি খাওয়া পড়ার ভাবনা নেই, যদি পৃথিবীময় ন্যায় সমাজ গড়ে ওঠে। ন্যায় উৎপাদন ও ন্যায় বন্টন পাওয়া যায়। মুনাফা না মিললে উৎপাদন করব না, এমনটি যদি উৎপাদনের নীতি বা এধিকম হয়, তবে কৃষিপণ্যের চাহিদা না থাকলে এমনতরো অবস্থা ঘটতেই পারে। মানুষ জন যদি বেকার থাকে, হাতে তাদের টাকা পয়সা না থাকে, তাহলে, ব্যক্তিগত পুঁজি ও উৎপাদনে এমন অবস্থা আসতে পারে। গোলায় গোলায় ধান আছে, তবু মানুষ না খেয়ে মরছে প্রথম বন্ধর। পরের বন্ধর গোলায় ধানও নেই, মানুষের না খেয়ে মরারও শেষ নেই। প্রথম বন্ধর ফুসল না হওয়ায় পরের বন্ধর চাষ সীমাবদ্ধ করা হলো বলে।

যা বলছিলাম। অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহের কথা। তা যুদ্ধ বিগ্রহ হয় কেন? এক দেশের মানুষ, তাদের নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থে অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করার জন্য অস্ত্র ধারণ করে। এক্ষেত্রে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত দু রাষ্ট্র ছাড়াও অন্য অন্য রাষ্ট্রও সে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। কেননা, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিও করে, যার দরুণ সাধারণ শত্রুকে মোকাবিলা করা। আবার, শক্তিশালী রাষ্ট্র কখনও কোনো কোনো শর্ত অনুযায়ী দুর্বল রাষ্ট্রকে রক্ষা করার দায়িত্বও নেয়। দুর্বল দেশটি আক্রান্ত হলে, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে 'রক্ষক' বা 'অভিভাবক' বন্ধদের রাষ্ট্রটি যুদ্ধ ঘোষণা করে। যেমন ১৯৩৯ সালে ওরা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডকে জার্মান রাষ্ট্র আক্রমণ করায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করে। ১৯১৯ সালের আগে পোল্যান্ড বলে কোনো রাষ্ট্রই ছিল না। জার্মান ও রুশ সাম্রাজ্য পোল্যান্ডকে অনেক দখল করে রেখেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিগুলি পোল্যান্ড রাষ্ট্রটি সৃষ্টি দেয়, এবং সেক্ষেত্রে পোল্যান্ডের সঙ্গে এমন চুক্তিতে তারা আসে যে, পোল্যান্ড বিপন্ন হলে তার পাশে দাঁড়াবে ঐ শক্তিমান রাষ্ট্রেরা। কিন্তু রাষ্ট্র তো সবার প্রতিনিধিদের সুযোগ পড়ে থাকে। আসতে তা শাসক-শোষক শ্রেণীর অন্য শ্রেণীকে দমন করার হাতিয়ার।

এরকম চুক্তি ইয়োরোপে নিয় বিগ্রহের আগেও মানা দেশের মধ্যে হয়েছে। তবে এশিয়া ও ইয়োরোপের যুদ্ধ পদ্ধতিতে অনেক তফাত তফাত আছে। ইয়োরোপে ছিল বিস্তৃত ফিউডাল ব্যবস্থা। জমি জিরেতের মালিক ছিল নানা জমিদার ভূস্বামী। সে ভূস্বামী চাষীর কাছে ভাড়, ফসল ও টাকার খাজনা নিতো। রাজাও ছিল এমনি এক জমিদার। বড়ো জমিদার। যে বড়ো জমিদার-পরিবারের জ্যেষ্ঠকে প্রধান বলে অন্য জমিদাররা স্বীকার করে নিতো, সেই হতো রাজা বা রানি। রাজা বা রানি ছিল সমান মর্যাদার মধ্যে প্রধান মাত্র। কার্ট অ্যান্ড দ্য ইকেরালস। সব জমিদারিতে বড়ো ছেলেই জমিদারির পদবীটি ব্যবহার করতে পারতো। অন্য ছেলে মেয়েরাও কেউ জমি, কেউ টাকা পয়সা ইত্যাদির উত্তরাধিকারী হতো। জমিদারদের মধ্যেই পরস্পরের বিয়ে শাদির চলন ছিল। সে দেশেতো বামুন-ঘরি-বৈদ্য-শূদ্র বলে জাত-বেজাতে জমিদারদের ভাগ করা হতো না। তাই সব রাজাই একে অন্যের শোণিত সম্পর্কে আত্মীয় বলে স্বীকৃত হতো। সবাই এ-ওর কাজিন। কার্ট কাজিন, সেকেন্ড কাজিন। আর ঐ কাজিনত্ব পাবার জন্যই 'রাজরক্তহীন' সেপোলিয়নকে অস্ট্রিয়ার রাজকুমারীকে বিয়ে করতে হয়েছিল, জোসেফিনকে ফেলিয়ে। রাজরক্তে সন্তান জন্ম দিয়ে করাসী সিংহাসন আইনসিদ্ধ করতে। ব্রিটেনে অষ্টম এডোয়ার্ড তাঁর ছোট ভাই ষষ্ঠ জর্জ-এর পক্ষে সিংহাসন ছেড়েছিলেন, এক তালাক পাওয়া মহিলা শ্রীমতি সিমসনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন বলে।

সে যাই হোক, ইয়োরোপে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হতো বটে, কিন্তু সন্ধি হলে, যে যার রাজত্ব ঠিক মতোই ফেরত পেয়ে যেতো। এক রাজা যুদ্ধে জিতলে, অন্য রাজাকে কিছুদের

প্রহসন দেখিয়ে খুব একটা খুশীমন করতে দেখা যায় না। খুশীমন হতো ঘরে ঘরেই। ভাই-ভাইকে, কাকা-ভাইপোকে, বোন বৈমাত্রিক বোনকে আক্রমণ খুন করেছে।

যুদ্ধের মধ্যেও কিছু নিয়ম-টিয়ম মানা হতো। সোর্ড প্রতাপশালী রোমের সৈন্যরাও সূর্য ডুবলে আর যুদ্ধ করতো না। রোম সাম্রাজ্য গড়বার জন্য এই 'সূর্যাস্ত নিয়মও' একটা কারণ। রোমে একশো জন অন্তে দুর্দান্ত সৈন্যদের নিয়ে এক একটা কারেকো গড়া হতো। প্রতিটি সৈনিককে বলা হতো পদাতিক বা লেজিয়ন। যে বার জার্মান বর্বরেরা, গল-ব্যাভালরা। রোম আক্রমণ করলো, ঐ লেজিয়নরা তো সারাদিন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করলো। জয় হয় আর কি। ইতিমধ্যে সন্ধে এলো। সন্ধে হতেই প্রেম চন্দির মতো লাজুক তুলে শিবিরমুখী হলো তারা। আর গল-ব্যাভালেরা 'মার' 'মার' রবে আক্রমণ করলো লেজিয়নদের। লেজিয়নরা প্রথম মরতে মরতে ঠোটের কোণে বিদ্রূপের হাসি নিয়ে বললো, "বর্বর সবে বলে। ব্যাটারা সভ্যতাতো বোঝেই না। সভ্য যুদ্ধের নিয়মটুকুও জানেনা। ছি।'

খবরের কাগজে প্রায়ই পড়ি দু'দল মানুষ বোমা পিস্তল পাইপগান, সোর্ড নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে এ পাড়ায় ও পাড়ায় গ্রামে গঞ্জে লড়াই করছে। আসল লক্ষ্য অঞ্চল দখল। লোকসভায় ভবিষ্যতের রায় পড়া হচ্ছে, মানচিত্রকে রাজনীতিকরা খেলাচ্ছে। বলা হচ্ছে রাজনীতির অপরাধীকরণ ঘটছে। গ্রীস বা রোম কিম্বা ভারত, পারস্য, চিন বা আরাভ-সূত্রের যে দেশই হোক না কেন, একদল মানুষ রাজত্বের হামলাবাজিতে বুদ্ধি যোগাতো। এদের মন্ত্রী বলা হোত। মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত অস্ত্রাঘাতে, কিন্তু পুরো বুদ্ধিটাই দিয়েছিলেন চানক্য। চানক্যের অর্থ-শাস্ত্র পড়ুন। দেখা যাবে রাজার ঝোলা কিভাবে ভর্তি করতে হয় তারই নিয়মকানুন দিয়েছেন তিনি। রাজস্ব সংগ্রহকারীদের বেতন কম করারই সুপারিশ করেছিলেন। কেন? না, রাজস্ব সংগ্রহকারীরা কম মাইনে পেলেই ফুল ও অবৈধপথে তা পুষিয়ে নেয়। বিশ্বজিৎ বসের 'আরণ্যকে' অহংশীলদার বানাবার জন্য শ্বশুরমশাই পিতার ওই যে ম্যানেজারকে উৎকোচের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে দেবার ঘটনাটি মনে পড়লে বলতেই হয় 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে।'

পুঁজিবাদী পৃথিবীতে তো আর পরস্পরের সম্পর্কহীন কোনো রাষ্ট্র নেই। মার্কো-পোলোর সময় চিনা সভ্যতার খবর কিছু ইতালীবাসীরা জানতো না। যদিও রোম সাম্রাজ্য নিতান্ত ঘাটো ছিল না। ইস্ট্রোরোপতো জেমকে বলতো চিনকলের কর্মী, ইটারনাল সিটি। ওদিকে চিন সভ্যতার তখন রমরমা যুগ। অথচ কেউ কারো খবর জানে না। প্রকৃতির শক্তি কাজে লাগানো কোনো যান ছিল না তখন। আর ছিল ঘোড়াই ভরসা বাহন। আর পৃথিবীও তাই ছিল তখন খুব বড়ো, আবার খুবই ছোট। আপন গ্রামটিই তখন 'দেশ' বা পৃথিবী। ভাল ভাষার মিল কাকে বেমন গ্রাম বোঝায়, তেমনি পৃথিবীও বোঝায়।

পুঁজিবাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হোল প্রকৃতির নিহিত শক্তিকে ব্যবহার। অর্থাৎ কলকিলায়, পশু, উষ্ণ, বায়ু তাড়িত শক্তির বদলে বাষ্প, বিদ্যুৎ, খনিজতেল, করলা প্রভৃতির শক্তিকে যন্ত্র চালনার কাজে লাগানো হয়েছে। বর্তমানে আণবিক-পরিবাহকের সহায়তায় বিদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক্সের কাজ বেড়েছে। যন্ত্রদানব এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশে উপগ্রহ ছুটেছে। দেশ বিদেশে বেতার ও দূরদর্শন তরঙ্গ জাল ছড়াছড়ি করছে, চোখ পুড়িয়ে দিচ্ছে, জনগোষ্ঠীর মাথা খাচ্ছে। এই পুঁজিবাদে অস্ত্রশস্ত্রও প্রকৃতির নিহিত শক্তিকে কাজে লাগিয়েই তৈরি হয়েছে। আগেকার দিনে যেমন প্যারিস একিলিসের দুর্বল গোড়ালি লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছে। এখন আক্রমণকারীর আজ অন্যদেশীয় বিষফুল বিষমুখী হাউই, অন্তরীক্ষে লক্ষিত্রে উঠে, বিদ্যুৎ ধনুকের মতো বেঁকে ফাঁদ দিয়ে আক্রান্ত দেশের গোপন শক্তির কেন্দ্রে কেন্দ্রে। একদলের যুদ্ধ এক রথীর সঙ্গে আর এক রথীর, এক পদাতিকের সঙ্গে আর এক পদাতিকের নয়। সৈন্য-বাহিনীতে নিযুক্ত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে জন্মী মানুষ, সেনাপতির নির্দেশ-মাফিক হাউই পাঠাচ্ছে, শত্রুবিমানের ওঠা-নামা হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে নজর করছে। যন্ত্রদানব বা কম্পিউটার বৈজ্ঞানিকের মাথা পাটিয়ে তৈরি করা পেন্টাগন অনুযায়ী অস্ত্র ব্যবস্থার মতো ঘটনা ঘটছে। যুদ্ধ করছে আসলে বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী। অথচ সরাসরি হত্যার ও সম্পদ বিনাশের দোষো তারা নিজে না তারা। তারা বড়ি জোর বিজ্ঞানের কাছে দায়বদ্ধ, মানব সমাজের কাছে নয়। বড় সব জাতাইদের দল।

মহাকাশ, আকাশ, সমুদ্র, মাটি, ভূমণ্ডল সর্বত্রই আজ যুদ্ধের উপকরণ। যতদিন পর্যন্ত কৃষিসাপেক্ষ ও সামন্ততন্ত্র সাপেক্ষ জগৎ ছুপিয়ে সভ্যতম পুঁজিতন্ত্র পর্যন্ত দেখেছি, আর ছিল চলতি ভাষার যা ভদ্রলোকদল, মেটা-মুটি লড়াই হোত দু'পক্ষের সৈন্যের মধ্যেই। পুঁজিবাদ তখন নিজরাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এলো, যুদ্ধ হয়ে পড়লো সামগ্রিক যা টোটাল ওয়ার। এজন্যই এইসব যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছে মহাযুদ্ধ। এক রাষ্ট্রগোষ্ঠী আর এক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সঙ্গে লড়ছে। এ লড়াই সৈন্যে সৈন্যে নয় — অর্থনীতি বনাম অর্থনীতিতে। আর অর্থনীতির ভিত্তিতে থাকে মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, ঔচামাল ও শ্রমের ব্যবহার। তাহলে কোনো রাষ্ট্রকে পরাস্ত করতে গেলে প্রয়োজন পড়ে সেই দেশের যন্ত্রপাতি, ঔচামালের উৎস ও জন-সংখ্যার বিনাশ। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে পারমাণবিক বোমাও তখন ফেলা চলে। একে ন্যায়সংগতোক্তী ব্যবস্থা বলবো না তো কাকে বলবো।

পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল দু'রকমের। শ্রমিক, কৃষক ইত্যাদি পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই করতো। (অবশ্য বহু দেশে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধেও কৃষক ও নানা-বর্ণীয় চাষীর শ্রেণীসংগ্রাম দেখা গেছে।) দ্বিতীয়ত পরাধীন ও উপনিবেশগুলি সাম্রাজ্য-বাদী দেশগুলির থাবর থেকে মুক্তি পাবার লড়াই করেছে। এমন কোন দেশ লড়েছে তাদের বহু নেতা মনে করেছে বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি পেতে হবে জাতীয় 'স্বাধীনতার' জন্য। আরো কেউ কেউ মনে করতেন বিদেশি শাসন এবং শোষণ তো বটেই দেশির শোষকদের শোষণের চাপ থেকেও মুক্ত হতে হবে। এরা বলতেন, জাতীয় 'মুক্তির' লড়াই করছেন তাঁরা। জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের অংশীদাররা ভেবেছেন স্বাধীন দেশের মুক্ত সমাজ গড়ার প্রাথমিক ভিত্তি হোল নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ও শোষণহীন সমাজতন্ত্র

গঠন। এই সমাজতন্ত্র কেউ মনে করেছেন সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কেউ মনে করেছেন বহুদলের গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত বয়স্কের ভোট দেবার সংখ্যা পরিষ্কার সম্মতিতে সমাজতন্ত্রের পথে চলা যাবে। এই দলগুলির সমস্ত কিছুই মূলত তিনটি ধারণার উপর নির্ভরশীল ছিল। এক, উৎপাদনের উপায়ের মালিক ব্যক্তিগত পুঁজিপতি, দুই, শ্রমিক মজুর দেওয়া শ্রমজীবী মানুষই বিজ্ঞানের চলিষ্ণুশক্তি দ্বারা উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকের সিংহভাগ এবং তিন, মোটামুটি অ-ইলেকট্রনিক প্রকৌশলের সঙ্গে উৎপাদনের উপায়গুলি সম্পর্কিত। এমন ধারণার সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের ছবিখানা ছিল খুব সহজ। কাঁচামালের বড় উৎসটাই ছিলো কৃষি ও উপনিবেশ। এমনটি ক্ষেত্রে উপনিবেশ যদি কাঁচামালের উৎস বন্ধ করে দেয় শ্রমিক ধর্মঘট করে দেয় কলকারখানায় যন্ত্রপাতি এবং নতুন এক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে যেখানে কলকারখানা ও জমির মালিক হয়ে দাঁড়ায় শ্রেণী সমাজটাই। এমন লড়াইয়ে শুধু পুঁজিপতি দেশের শ্রমিক আর উপনিবেশের ভিন্ন হয়ে যেতে পারতো এক শত্রুর বিরুদ্ধে। ঐ যে পার্টিজান গান আছে না, উর্দু অনুবাদে —

ওহো তখৎ পর আজিতে হ্যায়
কৌন উনকো বাড়াতো হ্যায় নাম
ইয়ে কবুকো বতাইয়ো যরা পেলিরী
তেরা কি যাতো কি জন।

কিন্তু সম্প্রতি তিনটিই ভুল প্রমাণ হয়ে গেছে। বহুজাতিক কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হওয়ার পর শোষণ শ্রমিকদের নাম দেশের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়া দেখছি। মৌথ মালিকানাধীন কারখানায় বিপুল সংখ্যক মানুষকে প্রতিষ্ঠানের মালিক করে তুলেছে। শ্রমিকেরাই উদ্বৃত্তমূল্য ভোগ করছে শ্রমিক কর্মচারী সুখ কর্মচারী সন্তোষ পেয়ে। আবার শ্রমিকদের চরিত্রও বদলেছে। সমাজে কায়িক শ্রমিকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কমছে, সেবামূলক কাজে নিযুক্ত কর্মীদের তুলনায়। উপরন্তু কায়িক শ্রমিকদের কাজও অনেক বেশী যান্ত্রিকির যন্ত্রের অনুগত হয়ে পড়েছে। ফলে নীল কলারযুক্ত শ্রমিকের তুলনায় সাদা কলারওয়ালা লোকের সংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে ধনীদেশে কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এতবেশী যে কোনো কোনো দেশে জনসংখ্যার তিন-চার শতাংশের বেশী শ্রমিক কৃষিতে কাজ করে না। উপরন্তু বিজ্ঞান নিজেই পণ্য হয়ে উঠেছে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার দাক্ষিণ্য। কাঁচামালের চরিত্র বদলেছে। মানুষের তৈরি করা রাসায়নিক পণ্য উচ্চফলনশীল বীজ ইত্যাদি পুরোনো কাঁচামালের অবস্থান বাতিল করে দিচ্ছে। একদিকে চরম মারণাস্ত্র বিজ্ঞান প্রকৌশল বিজ্ঞান-সেবিত হয়ে সৈনিকের হস্তচ্যুত হয়েছে গিয়ে পড়েছে বিজ্ঞানীর হাতে। কৃষি উৎপাদনও এখন বিজ্ঞানীদের সাফল্যের প্রতীক। বস্তুগত পণ্য উৎপাদন সহ সেবামূলক পণ্যের অভূতপূর্ব সম্ভার এবং তার সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদানের বিপুল সামর্থ বৃদ্ধি গড়ে তুলেছে একটি বিশ্বব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার মূলধনও বাহন বিজ্ঞানী। এবং যন্ত্রের ব্যবস্থার ও পৃথিবীকে কাঁচামালের জগতে ভাগ করে নেবার প্রবণতা নিসর্গের সর্বনাশ ডেকে আনছে। ক্রমশই পরিবেশ বিষাক্ত থেকে বিষাক্ত হয়ে উঠছে। যে শ্রেণী সংগ্রামের বিষয় আমরা এতদিন পর্যন্ত জেনে এসেছি, তা যেমন বাতিল হয়ে যায়নি তেমনি বিশ্বজুড়ে তা নতুন মাত্রা পেয়েছে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে গণ অভিব্যক্তিতে। উপরন্তু তথাকথিত ত্রোয়ালাইজেশনের মানে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোক্তাকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ পণ্য সম্ভার তৈরি করার ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। পরিণামে মানুষের জন্য থাকবে কৃষি উৎপাদনের বিষদূষিত খাদ্য ও নিম্নমানের বস্ত্র জোগান, অন্যদিকে উচ্চকোটি সামান্য সংখ্যক মানুষের জন্য থাকবে জাতীয় উৎপাদনের সিংহভাগ। ফাঁকটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এমন যে জনসংখ্যার ক্ষেত্রেও বিভাজন ঘটে যাচ্ছে। যেখানে সংখ্যা-পরিষ্ঠরা একই দেশে বাস করছে অথচ কেন পরদেশি তারা। তাদের গলাটিপে ধরার জন্যে আছে বিজ্ঞানীর তৈরি প্রচার মিডিয়া ধাওয়া এবং সত্যি-মিথ্যের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অবহিত না রাখা জনতার আজন্ম অভ্যেস।

যুদ্ধবিরতির কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। পঞ্চাশ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। তারপর চলেছে ঠাণ্ডা যুদ্ধের পালা। সে যুদ্ধও শেষ হল। ত্রোয়ালাইজেশনের নামে অনেকে বর্তমান যুগে মূল কথাটি আর দেখতে পাচ্ছে না। তবু বলি এখন লড়াই বিজ্ঞানকে মানবিক মুখাবয়ব দেওয়া এবং পরিবেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ করা ও গ্রামাঞ্চলকে পরিপূর্ণভাবে জ্বলন্ত করার দায় নেওয়ার সামর্থ অর্জন। এবং সত্যি সত্যি এ লড়াই বাঁচার লড়াই। এ লড়াইয়ে জিততেই হবে।

▲▲▲

পুরীতে সপরিবারে থাকার জন্য

দে'জ মেডিক্যাল হলিডে হোম

সমুদ্রের ধারে ● বিজ্ঞানা বাসন সবই আছে ● পরিচ্ছন্ন ● খরচ বেশি নয়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স এমপ্লয়িজ

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

২০ এ, লিন্ডসে স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৮৭

প্রবন্ধ

নিরস্ত্র যোদ্ধা

মানসকুমার রায়

কেউ বলেন খাপা, কেউ বলেন কল্পরাজ্যের বাসিন্দা, স্বপ্নবিলাসী উদ্ভট এক তত্ত্ব — সমাজতন্ত্রের উদ্‌গাতা। আবার কেউ কেউ তাকে অতিরিক্ত অত্রেয়ের সমবায়ের জনক বলে, তবে অবান্তরবাদী এবম্বিধ বিশেষণে ভূষিত বিতর্কিত রবার্ট আওয়েন সত্যি সত্যি ছিলেন এক বিচিত্র মানুষ।

মধ্য ওয়েলসের নিউটাউন নামক একটি গঞ্জ এলাকার এক নিম্নবিত্ত সাধারণ পরিবারে জন্ম। বাবা ছিলেন স্থানীয় ডাকঘরের পোস্টমাস্টার। এরা ছিলেন সাত ভাই বোন — রবার্ট পিতামাতার ষষ্ঠ সন্তান। রবার্ট ছাড়া কেউ ভাইবোনদের কেউ সাতবছরের উপরে উঠতে পারেনি। ছোট বয়স থেকে আওয়েন ছিলেন বয়সের তুলনায় পাকা। সাত বছর বয়সের মধ্যে গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ তার সমাপ্ত হয়ে যায়। তাঁর মেধা দেখে গ্রাম্য স্কুল শিক্ষক ঐ সাত বছরের বালককে তার সহকারী হিসেবে নিয়ে নেন। ঐ গ্রাম্য পাঠশালায় প্রায় তিন বছর সহকারী হিসেবে ছাত্রদের পড়ান। ইতিমধ্যে গ্রামের লোকজনের বাড়ির পাঠাগার থেকে বই নিয়ে তিনি অনেক বই পড়ে ফেলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল রবিনসন ক্রুসো, পিলগ্রীমস প্রোগ্রেস, প্যারাডাইস লস্ট, দি হিস্ট্রি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড এবং মর্লিস এ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রী। এছাড়া ধর্মপুস্তকের জীবনী। বস্তুত প্রচলিত পড়াশুনা বলতে যা বোঝায় তাতে তার বিদ্যা গ্রাম্য পাঠশালা পর্যন্ত।

পৃথিবীর পাঠশালায়

অবশ্য যাঁর মনোবল নতুন কিছু করার আকাঙ্ক্ষা যাঁর মধ্যে অনির্বান দীপ্তমান তার কর্মস্থল গ্রাম্য পাঠশালার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই মাত্র দশ বছর বয়সে ঐ স্কুল ছেড়ে বড় হবার আশ্বেষণে, নতুন জীবনের সন্ধানে। তার হ'ল জীবন সংগ্রাম। মাত্র ৪০ পিন্স পকেটে নিয়ে তিনি পাড়ি দিলেন জানার সন্ধানে। এলেন লন্ডনে এবং পরে স্টামফোর্ডে। চাকরি নিলেন জামা-কাপড়ের দোকানে। দু-তিন বছর এখানে চাকরির পর তিনি লিঙ্কেনশায়ারের স্টামফোর্ড ছেড়ে চলে গেলেন লন্ডনের ক্লিপ্টস্ এন্ড পাদার মালিক একটি বড় কাপড়ের দোকানে। কিন্তু স্টামফোর্ডে থাকাকালীন অনেক সময় পেতেন আওয়েন। অবসর সময়ে চলত তাঁর পড়াশুনা। কিন্তু এখানে ক্রেতার ভিড় অনেক বেশি। তাই অবসর কম। যাই হোক, কিছুদিন পর আওয়েন চলে এলেন শিল্প বিপ্লবের পীঠস্থান ম্যাঞ্চেস্টারে। সেখানে দুয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার পর আওয়েন নিজেই অন্য একজনের সঙ্গে কাপড় কলের যন্ত্রপাতি তৈরি করার একটি ছোট কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু যৌথ মালিকের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ব্যবসা ভেঙে যায়। যন্ত্রপাতি যা রবার্টের ভাগে পড়ে তাই নিয়ে একাই ব্যবসা চালান। লাভ ভালই হ'ত কারণ তখন বাজার ছিল খুবই তেজী।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে রবার্ট এ কাজ ছেড়ে দিয়ে ৫০০ শ্রমিকের একটি সুতাকলের ম্যানেজারের পদ জোগ নেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর। এই ম্যানেজারের চাকরিতে সাক্ষাৎকার (ইন্টারভিউ) সম্পর্কে একটি মজার ঘটনা তিনি নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে এমন এক অল্পবয়সী তরুণ ম্যানেজারের পদে কর্মপ্রার্থী হতে পারে মালিক ব্রিকেওয়াটার তা কল্পনা করতে পারেননি। তিনি তাই তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এই পদের পক্ষে অনেক তরুণ।' আওয়েন বললেন, 'এ প্রশ্ন চার-পাঁচ বৎসর আগে আমার পুরনো মালিকেরা করেছিল। এ ধরনের প্রশ্ন আমি আমাকে আশা করতে পারি না।' অতঃপর তিনি কত টাকা মাইনে চান মালিক জানতে চান। উত্তরে তিনি জানান যে তাঁকে বাৎসরিক ৩০০ পাউন্ড মাইনে দিতে হবে। ব্রিকেওয়াটার অবাক হয়ে বললেন, অন্যান্য কর্মপ্রার্থীরা কেউ এত টাকা মাইনে দাবি করেনি।' আওয়েন বললেন, 'এটা তাদের ব্যক্তিগত অভিমত, বর্তমানে তার যোগ্যতার মাত্রার ৩০০ পাউন্ড। তাই এর কমে তার চাকরিতে যোগদান সম্ভব নয়। এসব সত্ত্বেও তাঁর চাকরি হয়ে গেল। আর অচিরেই তিনি হয়ে উঠলেন বিশেষ একজন যেন সুতো প্রস্তুতকারক। কিন্তু আওয়েনের সঙ্গে ব্রিকেওয়াটারের মতানৈক্য ঘটল কয়েক বছর যেতে না যেতেই। তিনি অন্য কারখানায় যোগ দিলেন ম্যানেজার পদে, একজন অন্যতম অংশীদার হিসেবে। সেটাও স্থায়ী হ'ল না। ইতিমধ্যে তিনি বিয়ে করলেন নিউ লেনার্কের কাপড় কলের মালিকের মেয়ে এ্যান ক্যারোলিন কাকে।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল ম্যাঞ্চেস্টারে ব্রিমওয়াটারের কারখানার ম্যানেজার থাকাকালীন তিনি শ্রমিকদের কাজের আবহাওয়া উন্নত করার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা অত্রেয়েন তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে।

নতুন পৃথিবী গড়তে

এবার আওয়েনের কর্মস্থল স্কটল্যান্ডের নিউ লানার্ক-এর একটি বড় কাপড়ের কল। তিনি এই কারখানার পরিচালক, অন্যতম মালিক। এখানে স্বাধীনতা অন্য জায়গার থেকে তাঁর বেশি। তাই তিনি নয়া সমাজ গড়ার তত্ত্ব এখানে প্রয়োগ করতে থাকলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন একদিকে বংশধারা এবং অন্যদিকে ব্যক্তির জীবন-পরিবেশ, বিশেষ করে তার বিকাশ পর্বের পরিবেশ মানুষের চরিত্রকে রূপ দেয়। আওয়েন যখন নিউ লানার্কে যোগ দেন তখন সেখানে পরিবারের সংখ্যা ছিল ১৩০০-র মতো। পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫০০-এর মতো। তিনি প্রথমেই চেষ্টা করলেন যে নোংরা পরিবেশে মানুষগুলি বসবাস করত তা পাল্টাতে। কিন্তু তা করা খুব সহজ হয়নি। প্রথমদিকে লোকগুলো তাঁকে বিশ্বাস করত না। তাদের ধারণা হয়েছিল যে আওয়েনের দু-মতলব রয়েছে। কিন্তু তিনি এদের ভিতর থেকে বেছে বেছে দু-চার জনকে তাঁর চিন্তাধারার অনুকূলে নিয়ে আসেন এবং

ধীরে ধীরে তাঁর সংস্কারমূলক কাজগুলি করতে থাকেন। তাদের পরিচালনার পরিচালন থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করান। তিনি পুরনো পুরনো দোকানগুলি যেখানে মদ বিক্রি প্রধান ব্যবসা ছিল, তার জায়গায় ভাল দোকান প্রতিষ্ঠা করলেন। কম দামে উন্নত মানের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় বিক্রির বন্দোবস্ত করলেন। শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। বস্তুত শিশু বিদ্যালয়ের তিনিই প্রবর্তক। আর নিউ লানার্কেই এটা প্রথম চালু হয়। দু'বছর বয়সেই শিশুরা এই স্কুলে যেত এবং এখানে তারা এত হৃদিপুলির মধ্যে থাকত যে তারা আর বাড়ি ফিরতে চাইত না। তাঁর অক্লান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঐ কারখানা চত্বরে মাতলামি, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, মামলা-মোকদ্দমা, পরিবর্তের জন্য আইন ও দান-খয়রাতের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তাঁর প্রতিযোগী মালিকরা যেখানে লোকজনকে রোজ ১৩/১৪ ঘণ্টা মেহনত করাত, সেখানে নিউ লানার্ক-এ রোজকার কাজের সময় ছিল মাত্র সাড়ে দশ ঘণ্টা। তুলোর সঙ্কটে যখন চার মাস কাজ বন্ধ তখনও নিউলানার্কের শ্রমিকরা তাঁদের মজুরি পেয়েছে। যা তৎকালীন সময় কেন আজকের দিনেও কল্পনা করা যায় না। এতেও আওয়েন নিজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি শ্রমিকদের যে অবস্থায় উন্নীত করেছিলেন সেটাও ছিল মানুষের যোগ্য জীবন যাত্রা থেকে অনেক দূরে। তার নিজের ভাষায়, 'এইসব লোকেরা আমার কারখানায় পায় যে কোন সময় এদের আমি চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিতে পারি। আর তাহলে আজকে যে সামান্য সুখ ভোগ করছে, তার পরিবর্তে আমার তাদের দুঃখে নিমজ্জিত হতে হবে।'

'আর তা সত্ত্বেও এই ২৫০০ শ্রমজীবী সমাজের জন্যে রোজ যে পরিমাণ বাস্তব সম্পদ সৃষ্টি করছিল তা সৃষ্টি করতে অর্ধশতক আগে ৬০০০০ সংখ্যাবিশিষ্ট শ্রমজীবীর প্রয়োজন হত। আমার মনে এ প্রশ্ন জেগেছিল, ৬০০০০ ব্যক্তির যে পরিমাণ সম্পদ ভোগ করার কথা ছিল, তার সঙ্গে ২৫০০ ব্যক্তির ভোগ করা সম্পদের পরিমাণের পার্থক্য কোথায় গেল?'

কারণ একটিই, মজুরিটা পেয়েছে শ্রমিক মূলধন হিসেবে, যা সর্বদা খাটে থাকে।

যন্ত্রের ভূমিকার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া সত্ত্বেও আওয়েনের সৃষ্টি শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতার ওপর উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

'যন্ত্র যদি এই নতুন সম্পদ সৃষ্টি না করত, তাহলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপের যুদ্ধ এবং সমাজের অভিজাত শ্রেণীগুলির প্রতি সমর্থন করার রাস্তা সম্ভব হত না। তবুও এই নতুন ক্ষমতার সৃষ্টি করেছিল শ্রমিক শ্রেণী।'

পূর্বেই বলা হয়েছে যে তিনি নিউ লানার্কে যে সমস্ত শ্রমিক হিতকর কাজ করেছিলেন। তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এছাড়া তাঁর অংশীদারদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য লেগেই ছিল এবং অংশীদারিত্বও কলহও ঘটে। তিনি নিজেও ধীরে ধীরে নিউ লানার্ক সম্পর্কে ঘোর কটিয়ে ওঠেন।

কিন্তু নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে তিনি বিভোর তিনি কখনও স্থির থাকতে পারেন না। তাই তিনি জনমত গড়তে লাগলেন। প্রথমেই তার লক্ষ্য ছিল শিশু ও নারী শ্রমিকদের কাজের সময় সীমিত করা। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় নারী ও শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় সীমিত করা সংক্রান্ত প্রথম আইন পাস হয় ১৮১৯ সালে।

নিউ লানার্কের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মনমত না হওয়ায় রবার্ট আওয়েন একদিকে যেমন ইংল্যান্ডে খুচরা ব্যবসা ও উৎপাদনের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করার উৎসাহ দিচ্ছিলেন, অপরদিকে তিনি যে সমবায় প্রথার মাধ্যমে এক নয়া বিশ্ব সমবায় সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়িত করার জন্য এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত থেকে অনেকেরই আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল। তাঁদের ধারণা ছিল আমেরিকার লোকেরা সরল ও সাদাসিধে, ইংল্যান্ডের লোকজনের মত আত্মী ধূর্তবুদ্ধী নয়। তাই সেখানে যে কোন মহান কাজ রূপায়িত করা যাবে। তাই তিনি পাড়ি দিলেন আমেরিকায়। কিনলেন ইন্ডিয়ানার মিল হ্যাজার একর জমি তাঁর নিজের সমস্ত সঞ্চিত ধন দিয়ে। সেটা ১৮২৪ সাল। ১৮২৫ সালের ১লা মে তারা হ'ল এর পত্তনকরা ৮০০ সভ্য নিয়ে। প্রথম দিকে এর অগ্রগতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। ১৮২৬ সালে নিউ হ্যারমনির জন্য নতুন সংবিধান তৈরী করা হ'ল সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে। কিন্তু নিজেদের ভিতর মতানৈক্য ও অন্তর্কলহে ১৮২৭ সালের মধ্যে নিউ হ্যারমনির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে পুরোটাই ছড়া এর আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। আবার এই ব্যর্থতাও অনুভূতির মধ্য দিয়া গেল।

কিন্তু রবার্ট আওয়েন দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে। প্রথম কংগ্রেসে ইংল্যান্ডে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন একটি অ্যাসোসিয়েশনে ঐক্যবদ্ধ হয়। তিনি ছিলেন তার সভাপতি। শ্রম-নোটের মাধ্যমে শ্রমজাত দ্রব্যের বিনিময়ের উদ্দেশ্যে তিনি শ্রমের বাজার চালু করেন (লেবার ইকুইটেবল এক্সচেঞ্জ) যে শ্রম-নোটের একক হিসেবে এক ঘণ্টার কাজকে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

আওয়েনের কাছে ট্রেড ইউনিয়ন কখনো নিছক ট্রেড ইউনিয়নবাদ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন যে ইউনিয়নগুলি উৎপাদক সমবায় পরিণত হয়ে কারখানার উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করবে এবং পরিশেষে রাষ্ট্রের বদলে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হবে, উৎপাদক সমবায়গুলি রাজত্ব করবে। এছাড়া হ্যাম্পশায়ারে কুইনউড আবার নতুন করে স্থাপন করলেন হোম কলোনাইজেশন সমিতি। কয়েক বছর আওয়েন তার স্বপ্নের বাস্তব প্রয়োগ করেছিলেন। যথেষ্ট সাফল্যও তিনি পেয়েছিলেন। তবুও তা শেষ পর্যন্ত টেকেনি।

ধর্ম ও বিবাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে আওয়েন তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। ১৮১৭ সালের ২১শে আগস্ট একটি সভায় তিনি বলেন যে সমস্ত ধর্মই ভুলে ভরা এবং সমস্ত রকম বিভেদ অনৈক্য এবং অসংযতির মূলে। ধর্মীয় আচার আচরণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি ছিল তা জানা যায় তাঁর মৃত্যুর পূর্বের ঘোষণায় (১৭ই নভেম্বর ১৮৫৮)।

'তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে স্থানীয় পাদ্রী ধর্মীয় বার্তা শোনাতে এসেছিল। আওয়েন অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর পাদ্রী তাঁকে বলেন যে তিনি জীবন যে নিষ্ফলা কাজের পেছনে ব্যয় করেছিলেন তার জন্য অনুতপ্ত কি'না।' আওয়েন গর্বের সঙ্গে বলেন, 'আমার জীবন বৃথা যায়নি। আমি পৃথিবীর সামনে গুরুত্বপূর্ণ সত্যের মুখের খুলে দিয়েছি। কিন্তু যেহেতু অভাবে কেউ তা গ্রহণ করতে পারেনি। বস্তুত আমি আমার সময় থেকে অনেক এগিয়ে ছিলাম।'

বিবাহ সম্পর্কে আওয়েনের বক্তব্য হ'ল 'একে জনগণের প্রতি অনুরক্ত হলে জনসাধারণ তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তা জানাতে হবে, অতঃপর তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে। এরপর নিজেদের মতামত না বদলে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।'

স্বামী-স্ত্রী হাড়াহাড়ির ক্ষেত্রেও তিনি তাদের প্রথম ঘোষণার পরও প্রায় আরো এক বছরের কাল অপেক্ষা করতে বলেন। আনুষ্ঠানিক হাড়াহাড়ির জন্য ইতিমধ্যে তাদের অভিভাবক রাজী না মেটে, তাহলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হবে।

ভারত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল যে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে, ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে, যদিও এ ব্যাপারে তাঁর মত অনেকটা জন স্টুয়ার্ট মিলের মত। যদিও ব্রিটিশ শাসকদের করণীয় অনেক কাজের কথা তিনি বলেছিলেন যাতে ভারতীয়দের উন্নতি ঘটে।

কী চেয়েছিলেন রবার্ট আওয়েন? চেয়েছিলেন এমন একটি সমাজ তৈরি করতে যেখানে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে, প্রতিযোগিতা করবে না। গ্রাম্য সমবায় সমূহের সমবয় এভাবে সারা দেশ এবং পরে সারা পৃথিবী চলে আসবে এক সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে। সেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা হবে সর্বজনীন। গতানুগতিক শিক্ষার সঙ্গে এ শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক তফাৎ থাকবে। উৎপাদনক্ষম শ্রম এই শিক্ষার অঙ্গ হয়ে উঠবে। মানুষের থাকবার ব্যবস্থা থাকবে। তাঁর নিজের কথায়, 'প্রতিটি মানব জাতির স্বার্থেই প্রচলন করতে হবে এক, ভাষা, এক রকম আইন, একই রকম শাসন ব্যবস্থা এবং প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ও স্বার্থ হবে এক, থাকবে না ধনী-নির্ধন, পরিবার-আমির, থাকবে না অন্যায় নিজস্ব অস্তিত্ব। সবাই হয়ে উঠবে স্বশিক্ষিত, স্বনির্ভর, স্বশাসিত। সর্বত্র বিরাজ করবে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনতা। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। কারণ 'এটাই চিরন্তন বিধান, সমগ্র মানব জাতির সবাই সুখে থাকবে, নাহলে কেউ নয়। সবাই না হলে কেউ নয়, এই হবে গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র এবং প্রতিটি দেশের প্রতিটি আবহাওয়ায় এই হবে সর্বজনীন লক্ষ্য'।

কিন্তু রবার্ট আওয়েন সফল হননি। তাঁর মন-মুখ-কথা-কাজে কোন ফারাক ছিল না। স্কটল্যান্ডে নিউলানার্ক কাপড়ের কলে শ্রমিকদের মধ্যে, আমেরিকার ইন্ডিয়ানায় নিউ হারমনিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে, ব্যাঙ্গালোরে মুইনস্টাইন, লেবার ইকুয়েটেবল্ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তিনি চেষ্টা করেছিলেন তাঁর চিন্তাধারার প্রয়োগ করতে। কিন্তু কিছু সাফল্য লাভ করলেও সার্বিক সফলতা পেলেন না।

কারণ রবার্ট আওয়েনের যে সময়ে ইংল্যান্ডের রূপান্তর ঘটে সে সময়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের অবস্থানের রূপ পুরোপুরি পরিস্ফুট হয়নি। নতুন উৎপাদন পদ্ধতি তখনও তার উত্থান পর্বের সূচনায়, তখনও শক্তি এটাই স্বাভাবিক উৎপাদন ধারা — তৎকালীন অবস্থায় একমাত্র সম্ভাব্য ধারা। তা সত্ত্বেও এই উৎপাদন পদ্ধতি তখনই সামাজিক বিকৃতিকে বিরাটাকারে সৃষ্টিয়ে তুলেছিল — গৃহহারা মানুষদের জন্যে। গড়ছিল বড় বড় শহরের নোংরা, ঘিঞ্জি এলাকায়, এদের চিরাচরিত নৈতিক বন্ধন, পিতৃতন্ত্রিক আনুগত্য পারিবারিক সম্পর্ক সবই শিথিল হয়ে পড়ছিল, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের হাড়ভাঙা খাঁটুনি একটা ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছিল। সমাজের সব কিছুকেই অন্যায় যুক্তিবিরোধী বলে মনে হয়েছিল ওয়েনের তাই এগুলিকে দূর করার দায়িত্ব বর্তেছিল যুক্তির উপর। এই জন্যে প্রয়োজন বোধ করেছিলেন একটা নতুন ও আরও নিখুঁত সামাজিক ব্যবস্থা অবিলম্বে করার এবং এটাকে সমাজের উপর প্রভাবের মাধ্যমে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ার, আর যেখানেই সম্ভব আদর্শ পরীক্ষা নিরীক্ষা দত্ত ফলাফলকে সমাজের উপর আরোপ করার। এগুলিকে যতই নিখুঁত করে তোলার জন্য যাবা জমানো হচ্ছিল ততই সেগুলির অনিবার্য পরিণতি ঘটছিল নিছক কাল্পনিকতায়।

প্রসঙ্গত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমবায়ের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল, সেইসব সমবায়কে বাদ দিলে পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশে যে সব সমবায় সমিতি রয়েছে, তাদের চরিত্র আওয়েন যে সমবায় ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে মোটেই মেলে না। আওয়েনের বিপরীতে যে সমবায় সমিতির নমুনা বা আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয় তাহল রচডেল ইকুয়েটেবল্ পাইওনিয়ার্স। আওয়েন চেয়েছিলেন সমবায় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে, প্রতিটি সমবায় সমিতি হবে আওয়েনের বৃহৎ সমবায় সমাজের অঙ্গ। স্থিতাবস্থা ভেঙে ফেলাই হবে তাঁর কাজ। শোষক শ্রেণী পরিকল্পিতভাবে রচডেল ইকুয়েটেবল্ পাইওনিয়ার্সকে সমবায়ের আদর্শ হিসাবে প্রচার করেছে এবং সারা পৃথিবীতে এই আদলেই সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। বস্তুত এই সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে সমাজ তথা অর্থাৎ শোষণ ব্যবস্থা পাল্টানোর কোন সম্পর্ক নেই। যতই ইউরোপীয় বলা হোক আওয়েনের সমবায় সম্পর্কিত চিন্তাধারাকে, তিনি মূল সামাজিক বক্তব্যগুলিকে অস্বীকার করেননি। এবং সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম চলিকাশক্তি হিসাবে তিনি সমবায়কে গ্রহণ করেছিলেন।

সমাজবাদের দিকে আওয়েনের পদক্ষেপ তাঁর জীবনে একটা পালাবদল। যতদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন শুধু সমাজ হিতৈষী, ততদিন তাঁর জীবনে সম্পদ, উচ্চ প্রশংসা, মর্যাদা ও খ্যাতির অভাব ছিল না। ইউরোপে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁর স্বশ্রেণীর লোকেরাই শুধু নয়, রাষ্ট্রবিদ ও রাজন্যবর্গও তাঁর কথা প্রসন্নচিত্তে শুনতেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁর সাম্যবাদী তত্ত্ব উপস্থিত করলেন, তখন ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধর্ম ও প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি এই তিনটি বিষয় সমাজ সংস্কারের পথে অচলায়তন সৃষ্টি করছে বলে তাঁর কাছে বিশেষভাবে মনে হয়েছিল। এগুলিকে আক্রমণ করলে তাঁর কী ঘটবে তা তিনি জানতেন — অভিজাত সমাজ তাঁকে সমাজচ্যুত করবে, সামাজিক মর্যাদার সবটুকুই তিনি হারাবেন। কিন্তু পরিস্থিতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ঐ বিষয়গুলিকে তিনি আক্রমণ করলেন, আর তিনি যা ভেবেছিলেন ফলাফল সেরকমই হয়েছিল। অভিজাত সমাজের দ্বারা নির্বাসিত ও পত্রপত্রিকার নীরবতার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এবং তার সর্বস্ব নিয়োগ করে আমেরিকায় তিনি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন তাতে সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীর দিকে ঝোঁকেন এবং তিন বছর ধরে তাদের মধ্যে কাজ করে যান। ইংল্যান্ডের প্রতিটি সামাজিক আন্দোলন, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে প্রতিটি যথার্থ অগ্রগতির সঙ্গে রবার্ট আওয়েনের নাম জড়িত ছিল।

বাস্তবিকপক্ষে রবার্ট আওয়েনের ব্যর্থতা তার যুগের ব্যর্থতা, তিনি বুঝতে পারেননি শ্রেণী সংগ্রামের তাৎপর্য। ভরসা করেছিলেন মালিক শ্রেণীর বিবেকের উপর। কিন্তু বাঘ যে ঘাস খায় না সে সহজ সত্যটা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। নিজের আদলে ভেবেছিলেন অন্যসব মালিককে। কিন্তু শ্রেণী হিসেবে উৎপাদনের মাধ্যমেই একমাত্র মালিক শ্রেণীর অবসান ঘটানোর দায়। যতদিন না পৃথিবী থেকে শোষণ ব্যবস্থার অবসান হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত মানবতার প্রতীক রবার্ট আওয়েনের নাম সাধারণ মানুষের মনে মণিকোঠায় থাকবে।

▲▲▲

প্রাণ ও ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য অগ্নিপ্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন হোন

যা করবেন

- আপনি যদি বহুতল বাড়ির বাসিন্দা হন তবে সে বাড়িতে আগুন লাগলে নিষ্কৃতি পাবার সব পথ চিনে রাখুন ও আগুন লাগলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে সজাগ থাকুন।
- ঘনবসতি এলাকায় বেআইনীভাবে বিস্ফোরক দাহ্য পদার্থ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সজাগ হোন।
- আগুন লাগলেই দমকল বাহিনীকে কলকাতায় ১০১ বা ২৯-০১০১ নম্বরে ডায়াল করুন।
- সঠিক সংবাদ দিয়ে কর্তব্যরত দমকল বাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। জলের সন্ধান দিন। অযথা আতঙ্কের সৃষ্টি না করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সচেষ্ট হোন। দমকলের কাজে বাধা সৃষ্টি যাতে না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখুন বা অযথা ওদের উপর যাতে আক্রমণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

যা করবেন না

- বৈদ্যুতিক লাইন গ্যাসসহ বিভিন্ন সরঞ্জামে যে কোনরকমের ত্রুটি দেখলেই নিজ ঝুঁকি না নিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের পরামর্শ নিন। বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটার আগেই দমকলকে খবর দিন।
- কোন নির্দিষ্ট ইলেকট্রিক তার বা মিটারের পরিপন্থী ক্ষমতার চেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রে ঐ তার বা মিটার ব্যবহার করবেন না বা অস্থায়ী ইলেকট্রিক তার টানবেন না।
- উৎসব বা পূজার সময় অস্থায়ী মন্ডপের জন্য সরকারি নিয়ম মেনে চলুন — দমকলের পরামর্শ নিন।
- নিজের বাড়ি, কলকারখানা দোকান বা দপ্তর যে কোন স্থানেই দাহ্য বস্তু অসতর্কভাবে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রাখবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ/৩৬০২

প্রবন্ধ

পেড্ সেক্রেটারি বা চিফ এক্সিকিউটিভ চাই

অসীম রায়

ভারতবর্ষে নতুন অর্থনৈতিক নীতির সাবারণ পটভূমিকায় সমবায় আন্দোলনের অবস্থা কতকটা গোরুদির গতির গোয়ালে ফেরার পথ হারিয়ে ফেলার মতো। সেই দৃষ্টির অন্তে থাকে দিশাহারা হতাশার বোবা বেদনা। সমবায় আন্দোলনও আজ সকলিত এ ফেলনার বিদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে তাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে পেশাদারি ব্যবস্থাপনা। তারই প্রথম পদক্ষেপের একটি প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এই নিবন্ধ।

সমবায় সংস্থার বেতনভুক সম্পাদক বা মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ যাকে আমরা ব্যবস্থা নিতে হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার সাথে সঙ্গতি রেখে বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত রূপায়ণের দায়িত্ব থাকবে এই বৈতনিক সম্পাদকের ওপর। তাকে চিফ এক্সিকিউটিভ বা মুখ্য কর্মাধ্যক্ষও বলা যেতে পারে। আর গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশাসনিক কাজটি করার জন্য সমবায় সমিতির বই, খাতাপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সবকিছুর আইনসঙ্গত তত্ত্বাবধানের দায়িত্বেও থাকবেন তিনি। সমবায় ব্যবস্থার পুরানো ধ্যান ধারণা অনুসারে এই কাজটির দায়িত্ব সাধারণত সমস্ত প্রাথমিক সমিতিতে নির্বাচিত ও অবৈতনিক সম্পাদক পালন করেন। ফলতঃই তাকে পেশাদারভাবে অন্যান্য কাজ করতে হয়। কেউ শিক্ষক, কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ অল্প স্বল্পশিক্ষিত উপজীবিকা আর না হয় অন্যত্র চাকরিতে ব্যস্ত থাকেন। প্রতিযোগিতার বিদ্যুৎ প্রান্তরে জীবনের তাগিদে অর্থ সংগ্রহেই তাদের শ্রম ও সময় চলে যায়। মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের সার্বিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমবায় সমিতিকে সদা সতর্ক ও জাগ্রত নেতৃত্ব দিয়ে সার্থক করে তোলার অবকাশ তাদের প্রায়শই থাকে না। আবার দিনের অধিকাংশ সময় যাদের অন্যত্র ব্যয় করতে হয় তাদের পক্ষে সমিতির সব কিছুর আইনসঙ্গত তত্ত্বাবধায়ক বা কাস্টোডিয়ান থাকাও কেন বিড়ম্বনার ব্যাপার। তাছাড়া এই অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদকের দৈনন্দিন জীবন ধারণের সাথে সমিতির লাভ-লোকসানের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। চিফ এক্সিকিউটিভের যে বহুমুখি দায়িত্ব তা সর্বাগ্রে অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদকের কাছ থেকে আশা করাও উচিত নয়। এই দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হ'ল তাকে সমিতির কর্মকর্তা-পরিচালক-সদস্য-আমানতকারী-দেনাদেনকারী-কর্মচারী প্রভৃতিদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে ব্যবসায়িক অবস্থা দেখতে হয় ও সংস্থাকে লাভজনক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে হয়। অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদকের পক্ষে ব্যবসায়িক সমস্যা অপেক্ষা নিজস্ব ভাবমূর্তি গড়ে তোলা ও জনপ্রিয়তার মোহে কিছু পরিমাণ দেওয়ার মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তে সমিতির ব্যবসায়িক সাফল্য বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীতে সম্পাদকের আইনগত অবস্থান কোথায় অর্থাৎ আমাদের সমবায় আইনে সম্পাদক সম্পর্কে কি বলা আছে ও এই পদে পেড্ সেক্রেটারি বা চিফ এক্সিকিউটিভ হিসাবে কাউকে নিয়োগ করা যায় কি না তা একটু বিশ্লেষণ করা যাক। সমবায় আইনের ২ ধারার ৩১ প্রকরণে (ক্লজ) অধিকারিকের সংজ্ঞায় অন্যান্যদের সাথে সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার, অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার প্রভৃতিদেরও ধরা হয়েছে। একই আইনের ২৭ ধারার ৯ অনুবিধির নীচে প্রদত্ত ভাষ্যের কর্মকর্তা (অফিস বেয়ারার) হিসাবে উল্লিখিতদের মধ্যে সম্পাদক, সহকারী সম্পাদকের পদনামও (ডেজিগনেশন) আছে। ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীর ২ নিয়মের (কে) প্রকরণে সম্পাদকের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তার মূল অর্থ হ'ল সম্পাদকের পরিচয় নামে নয় — পরিচয় তার সম্পাদিত কাজে। বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে যিনি সমবায় সমিতির রোজকর্ম সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সম্পাদকের কর্তব্যগুলি সম্পাদন করবেন তাকেই বলা হবে সম্পাদক। তিনি এই কাজটি করবেন অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন তার পদটির নাম যে সম্পাদকই হবে সে কথা আইনে কোথাও বলা নেই। সম্পাদক পদের অর্থ হ'ল যিনি সম্পাদন করেন। এখানে সম্পাদন বলতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার নীতি-নিয়ম অনুসারে বোর্ড বা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে যিনি আন্তরিক ও ভাবগতভাবে এক্সিকিউট বা কার্যকর করেন। সেই অর্থে তাকে চিফ এক্সিকিউটিভ বা মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ বলা যেতে পারে। বিভিন্ন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যারা থাকেন তাদের কোথাও বলা হয় চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, কোথাও চিফ এক্সিকিউটিভ, কোথাও পেড্ সেক্রেটারি, কোথাও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, কোথাও জেনারেল ম্যানেজার, আবার কোথাও ম্যানেজার এই সম্পাদনার কাজটি করার সুবাদে সম্পাদক।

কেউ কেউ এমন ধারণা পোষণ করেন যে সমবায় আইনে 'চিফ এক্সিকিউটিভ' এই পদনামটি (ডেজিগনেশন) ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। উৎসাহভরে দু'এক জন এমন কথাও বলে ফেলেন যে, আসলে সমবায় আইনের ২৮ ধারা মতে 'চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার'কেই এখানে বোঝানো হয়েছে। ছাপার ভুলের জন্য 'অফিসার' কথাটি বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু সমবায় আইনের বিভিন্ন ধারায় সুস্পষ্টভাবে 'চিফ এক্সিকিউটিভ' এই পদনামটি উল্লেখ করা হয়েছে। কেন কিছু সমিতিতে বিশেষ করে শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কে মুখ্য কর্মাধ্যক্ষই (চিফ এক্সিকিউটিভ) সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 'কে ভাবরমণ কমিটি' (১৯৭৭-৭৮) যে সমীক্ষা ওজরাট,

কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে করেছিল তাতে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের প্রত্যেকটি শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কে বিভিন্ন পদনামে (যেমন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, জেনারেল ম্যানেজার, সেক্রেটারি, ম্যানেজার) ছিলেন বৈতনিক চিফ এক্সিকিউটিভ। এই কমিটি সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের যে ছয়টি ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করেছিল তার মধ্যে চারটি ব্যাঙ্কে 'চিফ এক্সিকিউটিভ' পদে ছিলেন অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদক। সারা ভারতে যে ৩৮টি সমবায় ব্যাঙ্ক এই কমিটি পরিদর্শন করেছিল সেখানে 'চিফ এক্সিকিউটিভ' পদনামের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। ব্যাঙ্কের নিজস্ব অফিসার তার মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই চারটিতে অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদক।	২৯
২। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে এসেছিলেন	৩
৩। সরকারি অফিসার ছিলেন	৬
মোট	৩৮

মাধবদাস কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেছিল প্রতিটি শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কে সব সময়ের জন্য ব্যাঙ্কের নিজস্ব বেতনভোগী চিফ এক্সিকিউটিভ থাকবেন। কোন সময়ে তিনি কোন অবৈতনিক ও নির্বাচিত কর্মকর্তা না হন। ব্যাঙ্কের নিজস্ব অর্থে তিনি কখনই প্রতিনিধের (ডেপুটেশন) ভিত্তিতে কোন ব্যাঙ্ক বা সরকারের পাঠানো ফলস্থায়ী কোন অফিসার হবেন না। বেতনভুক এই চিফ এক্সিকিউটিভ পদাধিকার বলে বোর্ডের ডাইরেক্টরও থাকবেন। এ বিষয়ে একই মত পোষণ করেছেন এস এস মারাঠের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিও (১৯৯১-৯২)। যে সমস্ত শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এখনও মাধবদাস কমিটির সুপারিশমত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমিতি ক্ষেত্রের প্রতিটি পরিদর্শন (ইনস্পেকশন) প্রতিবেদনে তা প্রবর্তন করার সুপারিশ রেখে যাচ্ছে। বর্তমানে (মার্চ ১৯৯৫) পশ্চিমবঙ্গের ৩৭টি শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে ১৩টিতে পেশাদার সেক্রেটারি বা চিফ এক্সিকিউটিভ আছেন। বাকি ২৪টির মধ্যে অবশ্য দুটিতে কোন বেতনভোগী কর্মাধ্যক্ষ নেই। সমবায় আইনের ৩০ ধারা অনুসারে সে দুটি প্রশাসক দ্বারা পরিচালিত।

পেশাদার সেক্রেটারি বা চিফ এক্সিকিউটিভ পদনামের আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আইন ও নিয়মাবলী যে যথেষ্ট অনুকূল সে মর্মে এখানে কয়েকটি বিধানের উল্লেখ করা হ'ল। ২৫ (১) ধারার তৃতীয় অনুবিধিতে বলা আছে যে, কোন আদালতের নির্দেশ বা অন্য কোন কারণে গঠিত পরিচালন পর্ষদ কার্য সম্পাদনে অপারগ হলে সমিতির মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ (তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন) ব্যবস্থাপনার কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন। কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অবৈতনিক ও নির্বাচিত কর্মকর্তা হিসাবে সম্পাদকের ওপর থাকলে মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ বা চিফ এক্সিকিউটিভের দায়িত্ব এক্ষেত্রে কে পালন করবে সে প্রশ্ন থেকে যায়।

আইনের ২৭(৪) ধারায় বলা আছে, যেখানে সমবায় সমিতিতে একজন মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ আছেন ও তার কাজ সমিতির তহবিল থেকে নির্বাহিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ সমিতির বোর্ডে পদাধিকার বলে পরিচালক থাকবেন। যে সমিতির ক্ষেত্রে অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থেকে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের ভূমিকায় সংশ্লিষ্ট কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন সেক্ষেত্রে এই উপধারা অনুসারে বেতনভুক কোন কর্মাধ্যক্ষ উক্ত সমিতির বোর্ডে আসতে পারছেন না। এক্ষেত্রে সমিতির সর্বোচ্চ বেতনক্রম যিনিই পান তিনি আছেন তাকেই মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের পদে রাখা দরকার। এর প্রয়োজন অন্য আর এক দিক থেকে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ২৭ (৩) ধারা মতে কমপক্ষে ৪ (পাঁচ) জন কর্মচারী কাজ করে এমন সমবায় সমিতির বোর্ডে কর্মীরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করতে পারে। সেই সুবাদে পূর্বোক্ত সর্বোচ্চ বেতনভুক পদের অফিসারকে নির্বাচন না করে যদি তার অধস্তন কোন কর্মচারীকে প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালক পদে নির্বাচন করা তাহলে প্রশাসনিক শৃঙ্খলারক্ষার দিক থেকে তা বাঞ্ছনীয় হয় না। কর্মচারী স্বার্থ ও চাকরির সর্তাদি সংক্রান্ত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্যে বোর্ডে কর্মচারিদের পছন্দমত নির্বাচিত কর্মীর প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হচ্ছে না। তার সাথে পেশাদারী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে সমিতির ব্যবসায়িক ভিত্তিকে মজবুত করার জন্যে সমিতির সর্বোচ্চ বেতনক্রমের আওতাভুক্ত ও সমিতির তহবিল থেকে নির্বাহিত সর্বোচ্চ বেতনভোগী কর্মাধ্যক্ষকে সমবায় আইনের ২৭ (৪) ধারা মতে সব সময়ে পরিচালক হিসাবে পর্ষদে রাখতে হবে। বোর্ডের মধ্যে মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের স্থায়ী অবস্থানের গুরুত্ব বিবেচনায় ২৭ (৮) ধারার প্রথম অনুবিধিতে বলা হয়েছে ২৭ (৩) ধারা অনুসারে কর্মচারী প্রতিনিধি ও ২৭ (৫) ধারা অনুসারে পদাধিকার প্রতিনিধি হিসাবে একই ব্যক্তি একটি মেয়াদের পর দ্বিতীয় মেয়াদে পরিচালক পদে পুনর্নির্বাচিত বা পুনর্মনোনীত হতে পারবেন না। অথচ ২৭ (৪) ধারা অনুসারে চিফ এক্সিকিউটিভ বা মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের পরিচালক পদে অবস্থানের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা নেই। শুধু তাই নয়, কর্মকর্তা নির্বাচন ও সহযোজন (কো-অপশন) ছাড়া বোর্ডের অন্যান্য যে কোন বিষয়ে আলোচনা ও ভোটাধিকারও তাকে দেওয়া হয়েছে।

আইনের ৩১ ধারার (সি) প্রকরণের (ক্লজ) প্রথম অনুবিধিতে বলা আছে প্রাধিকারিকের (স্পেশাল অফিসার) নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সমিতির সর্বোচ্চ বেতনভোগী কর্মাধ্যক্ষ (হায়েস্ট পেড্ এক্সিকিউটিভ), তার পদের নাম যাই হোক না কেন, বোর্ডের পরিবর্ত হিসাবে সমিতির যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করবেন। এখানে সর্বোচ্চ বেতনভোগী কর্মাধ্যক্ষের পরিবর্তে সর্বোচ্চ বেতনক্রমের আওতাভুক্ত সর্বোচ্চ বেতনভোগী মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ হলে আইনগত সংশোধন অনেকটা নিষ্প্রয়োজন হত। এই প্রয়োজনটি অবশ্য কেবলমাত্র পঞ্চম তফসিলভুক্ত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রেই দেখা দেবে। অন্যত্র নয়। কিন্তু পঞ্চম তফসিলভুক্ত যে সমস্ত সমিতিতে এখনও অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদকের ওপর সমিতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আছে সে ক্ষেত্রে ৩১ ধারার এই প্রয়োজনটি নির্বাহের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

সমবায় আইনের ৩২ (১) ধারায় বলা আছে নিবন্ধক বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে বোর্ডের সভাপতি বা সমবায় সমিতির মুখ্য কর্মাধ্যক্ষকে (চিফ এক্সিকিউটিভ) নির্দেশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে বোর্ডের সভা আহ্বানের জন্য নির্দেশ

দিতে পারেন। এখানেও বোঝা যাচ্ছে, ঠিক এক্সিকিউটিভ অফিসার যিনি সমবায় আইনের ২৮ ধারা অনুসারে সরকার বা নিবন্ধকের নির্দেশে আসেন তার যেমন একটি পৃথক আইনগত স্বীকৃতি ও সত্তা আছে তেমনি ঠিক এক্সিকিউটিভেরও একটি পৃথক আইনগত স্বীকৃতি ও সত্তা আছে। তবে যে সমিতিতে সরকার বা নিবন্ধকের পাঠানো সরকারি অফিসার ২৮ ধারা অনুসারে আসেন সেখানে সমিতির মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের অবর্তীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বর্তায় উক্ত সরকারি অফিসারের ওপর। আসলে সব মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকই (২৮ ধারা) পদাধিকারবলে আইন মোতাবেক সমিতি সমিতির মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ হয়ে যান। তাই বলা যায় সব ঠিক এক্সিকিউটিভ অফিসারই ঠিক এক্সিকিউটিভ কিন্তু সব ঠিক এক্সি-কিউটিভ সব সময় ঠিক এক্সিকিউটিভ অফিসার নয়। এমন কি সরকার বা নিবন্ধকের পাঠানো ঠিক এক্সিকিউটিভও ঠিক এক্সি-কিউটিভ অফিসার হবেন না যদি না তাকে সমবায় আইনের ২৮ ধারা অনুসারে পাঠানো হয়। এতক্ষণ আলোচনা করে দেখা গেল সমবায় আইনের বর্তমান প্রেক্ষিতে কোন সমিতিতে ঠিক এক্সিকিউটিভ পদ সৃষ্টি করতে চাইলে তা পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী অনুসারে বেআইনী হবে না।

এবারে দেখা যাক সমবায় আইনের কোনরূপ সংশোধন না হলেও সমস্ত সমবায় সমিতি স্বৈচ্ছিক ও নির্বাচিত সম্পাদকের পদ তুলে দিতে পারে কি না? আর সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর যে সমস্ত জায়গায় সম্পাদকের উল্লেখ আছে তার তার ও ধার কতটা? সম্পাদকের সংজ্ঞায় প্রথমেই বলা হয়েছে, যিনি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে অবৈতনিক ভিত্তিতে পরিচালনা করেন তাকে যে কোন সময়েই ডাকা যায়। কাজেই তাকে যদি ঠিক এক্সিকিউটিভ বা মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ বা পেড্ সেক্রেটারি হিসাবে ডাকা হয় তাতে আইনগত দিক থেকে প্রকৃতপক্ষে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয় না।

সমবায় নিয়মাবলীর ১১ নিয়মে বলা আছে কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে উপবিধিতে অবশ্যই বিধান রাখতে হবে। ১১ (১) (ঝি) নিয়মে বলা আছে সমিতির পরিচালক ও অধিকারিকদের নিয়োগ ও বরখাস্তের পদ্ধতি এবং বোর্ডের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সমূহ থাকবে। ১১ (১) (এস) নিয়মে বলা হয়েছে সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদকের (সম্পাদক মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক না হলে) এবং মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের পদটি যে নামেই পরিচিত হোক না কেন ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ উপবিধিতে উল্লেখ থাকবে। এখানে 'সম্পাদক' এই পদনামে কোন পদ রাখার বাধ্যতামূলক কিন্তু বাধ্যবাধকতা নেই। যেমনটি আছে সভাপতি ও সহ-সভাপতির ক্ষেত্রে। সমবায় নিয়মাবলীর ৩২ নিয়মে কর্মকর্তা (অফিস বেয়ারার) নির্বাচন সম্পর্কে বলা হয়েছে । ৩০ নিয়ম অনুসারে পরিচালকমণ্ডলীর বোর্ড গঠিত হলে সাধারণ সভার পর অধিক ৩০ দিনের মধ্যে নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভা পরিচালনার জন্য অধিক তিন জন তালিকাভুক্ত সভাপতি (প্যানেল চেয়ারম্যান) এবং অন্যান্য প্রয়ো-জনীয় কর্মকর্তা নির্বাচন করবেন। এখানে উল্লিখিত প্যানেল চেয়ারম্যানদের কর্মকর্তা (অফিস বেয়ারার) যে বলা যাবে না তার প্রমাণ ২৭ (১) ধারার কর্মকর্তা সম্পর্কিত সংযোজিত ব্যাখ্যা। সে ব্যাখ্যায় প্যানেল চেয়ারম্যানদের কোন উল্লেখ নেই। যা হোক, কর্মকর্তা হিসাবে সম্পাদককে নির্বাচনের কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা ৩২ নিয়মে যেমন নেই তেমনি সমবায় নিয়মাবলীর ৩৬ নিয়মেও নেই। ৩৬ নিয়মের মূল বক্তব্য হল, প্রত্যেকটি শীর্ষ ও কেন্দ্রীয় সমিতি এবং যে সমস্ত প্রাথমিক সমিতির কার্যকর মূলধন বা ঋণদান যেমনের দশ লক্ষ টাকা বা তার বেশি সে সমস্ত ক্ষেত্রে কিভাবে পরিচালক ও কর্মকর্তাদের নির্বাচন হবে। ৩৬ (২৫) (এক) নিয়মে বোর্ডের সভাপতি, সহসভাপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নির্বাচনের কথা বলা আছে কিন্তু সম্পাদকের কথা বলা নেই।

সমবায় নিয়মাবলীর ৪৮ নিয়মে বোর্ডের ক্ষমতা সম্পর্কে বলা আছে। এই নিয়মের বিভিন্ন প্রকরণে সমিতি বিষয়ে বোর্ডকে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তা নিম্নরূপ । (ঝি) প্রকরণে বলা হয়েছে, বোর্ড কর্মচারিদের কর্তব্য নির্ধারণ ও মাহিনা ভাতা ঠিক করে দেবে। (এক) প্রকরণে বলা আছে, সমিতির কর্মচারিদের নিয়োগ, পদচ্যুত বা বিতাড়িত করবে বোর্ড। (জি) প্রকরণে বলা আছে, অধিকারিকদের (অফিসার) কর্তব্য ও মাহিনা স্থির করে দেবে বোর্ড। নিয়মাবলীর ৬১ (১) নিয়মে বলা আছে, প্রত্যেক সমবায় সমিতি তার কারবার পরিচালনার জন্য কমপক্ষে কতজন বেতনভোগী কর্মচারি আবশ্যক তা সময়ে সময়ে বোর্ডের বৈঠকে স্থির করবে। ৭৩ নিয়মে বলা আছে, বোর্ড নির্দিষ্ট করে দেবে সমিতির কোন কোন আধিকারিক ও কর্মচারী কি কি কাজ করবে। তবে যে কর্মচারিকে হিসাব রাখার ভার দেওয়া হবে তাকে যেন নগদ টাকা পয়সা রাখার ভার দেওয়া না হয়। উপরোক্ত বিধানগুলি খুঁটি প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, সমিতির কর্মচারি নিয়োগ — তাদের মাহিনা অর্পণ প্রভৃতি ক্ষমতা বোর্ডের। এ ক্ষমতা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের হাতে নেই। দ্বিতীয়ত, সম্পাদক আজীবন অধিকারিক হিসাবে ঐগুলি কার্যকর করবেন যায়। তার অতিরিক্ত কোন উচ্চতর প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্পাদকের নেই। সভাপতি ও সহ-সভাপতির পদ যেমন মৌলিক আইন-গত অস্তিত্ব ও উপবেদনিক নিয়ে বিস্তারিত সেভাবে সম্পাদকের পদটিকে বিধায়করা দেখেন নাই।

সমিতির আগ্রহে উপবিধির সংশোধন সম্পর্কিত ১৩ (২) নিয়মে বলা আছে, উপবিধি নিবন্ধনের আবেদনপত্রে সই করবেন সম্পাদক ও দুইজন পরিচালক। নিবন্ধকের আগ্রহে উপবিধি সংশোধন সংক্রান্ত ১৪ (১) নিয়মে বলা আছে, উপবিধি সংশোধনের জন্য বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের উদ্দেশ্যে নিবন্ধক সমবায় সমিতির সভাপতি বা সম্পাদক বা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের কাছে নোটিস পাঠাবেন। যে সমিতিতে সম্পাদক বা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক নেই সেখানে উপরোক্ত উত্তর ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হবে সম্পাদকের কাজ যিনি করছেন অর্থাৎ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা জেনারেল ম্যানেজার বা ঠিক এক্সিকিউটিভ বা ম্যানেজারকেই বোঝানো হয়েছে। সমবায় নিয়মাবলীর ২ (১) (যে) নিয়ম অনুসারে উক্ত অধিকারিকদের সম্পাদক হিসাবে বিবেচনা করতে কোন আইনগত অসুবিধা নেই।

সাধারণ সভা আহ্বান সংক্রান্ত ১৮ (১) নিয়মে বলা আছে, বাৎসরিক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা বোর্ডের নির্দেশক্রমে সম্পাদক বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন

অধিকারিক আহ্বান করবেন। অবশ্য সমিতিতে যদি ২৮ ধারা মতে মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক অবস্থানরত থাকেন তাহলে কি হবে সে সম্পর্কে ৫৩ (৬) নিয়মে বলা আছে, সম্পাদকের কোন পদ না থাকলে সমিতির সাধারণ সভা ও পর্ষদের বৈঠক মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক আহ্বান করবেন। এখানে মূল বক্তব্য বিষয় হ'ল, সাধারণ সভার নোটিশ দেওয়ার কাজটি সম্পাদক না থাকলেও বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন অধিকারিক (অফিসার) করতে পারেন। তবে সম্পাদকের পদ থাকলে সাধারণ সভার নোটিশ দেওয়ার দায়িত্ব বোর্ড অন্য কোন আধিকারিককে দেবেন না। ৫৩ (৬) নিয়মের যে গতি ও তার অর্থাৎ মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক থাকা সত্ত্বেও যখন সম্পাদককে সভা ডাকার দায়িত্ব দেওয়া আছে তখন অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদকের পদনামটি সমিতিতে ব্যবহৃত হলে বোর্ড অন্য কোন অধিকারিককে সাধারণ সভা ডাকার ক্ষমতা দেবে না।

সমবায় নিয়মাবলীর ৪২ নিয়মে বোর্ডের বৈঠক ডাকার বিষয়ে বলা আছে। এ বৈঠকের নোটিশ দেবেন সম্পাদক বা সম্পাদকের কর্তৃত্ব সম্পাদনকারী অধিকারিক। এখানেও সম্পাদক পদনামটি ব্যবহারের অনুকূলে আইনগত বাধ্যতা নেই। ঠিক একই বিধান রাখা হয়েছে ৪৭ (৩) নিয়মে যেখানে বোর্ডের তলবী বৈঠক আহ্বান সম্পর্কে বলা আছে। তলব বা অধিবাচনপত্র (রিকুইজিশন) পাওয়ার তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে সমিতির সম্পাদক বা সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকারী কোন ব্যক্তি এই বৈঠক ডাকবেন। এখানেও সম্পাদক নামীয় পদের আবশ্যকীয় আইনগত স্থিতির কথা বলা হয় নি।

সমবায় নিয়মাবলীর৫৭ (১) নিয়ম অনুসারে প্রতিটি শীর্ষ সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (বর্তমানে সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক) প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদকের পদসৃষ্টির কোন আইনগত সুযোগ রাখা হয় নি। বলা হয়েছে, শীর্ষ সমিতির বোর্ড সমিতির পরিচালন অধিকর্তা (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) বা সম্পাদককে (বৈতনিক) তার মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক (চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার) হিসাবে নিয়োগ করবে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (বর্তমানে সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক) ম্যানেজারকে তার মুখ্য প্রশাসনিক অধিকারিক (চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার) হিসাবে নিয়োগ করবে। আরো বলা হয়েছে, যে সমস্ত শীর্ষ সমিতি কৃষি ঋণ বা কৃষি বিপণনের কাজ করবে তাদের মুখ্য প্রশাসনিক অধিকারিককে সব ক্ষেত্রেই পরিচালন অধিকর্তা (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) বলা হবে। এক্ষেত্রে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে অবস্থানরত থাকবে অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদকের পদনাম ব্যবহারের আইনগত কোন ভাবনা নেই।

প্রতিটি সমবায় সমিতির খাতাপত্র, হিসাবপত্র ও অন্যান্য বিভিন্ন নথিপত্র কার জিম্মা ও তত্ত্বাবধানে থাকবে সে সম্পর্কে সমবায় নিয়মাবলীর ৭৫ (১) নিয়মে বলা হয়েছে, যে সম্পাদকের বা সম্পাদকের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনকারী অন্য কোন ব্যক্তির জিম্মায় থাকবে। কোন সমিতির বোর্ড সম্পাদক নামীয় কোন পদ সৃষ্টি না করে যদি তার ম্যানেজারকে মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ বা চিফ এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ করে তার জিম্মায় সমিতির সমস্ত খাতাপত্র ইত্যাদি রাখে ও তাকেই যদি বোর্ডের নির্দেশ কার্যকর করার দায়িত্ব দেয় তাহলে তা নিশ্চয়ই সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর বিধান লঙ্ঘন করবে না।

বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে কর্মচারী নিয়োগের জন্য নির্বাচক কমিটি গঠন সম্পর্কে সমবায় নিয়মাবলীর ১০৭ নিয়মে বলা হয়েছে। অবশ্য গত ১৯৯৪ সালের ২১ অক্টোবরের সরকারি নির্দেশ অনুসারে পঞ্চম তফসিলভুক্ত সমবায় সমিতিতে কর্মী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সমবায় কৃত্য নিয়োগাধিকার (কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশন) সম্পর্কিত সমবায় আইনের ৩৮ ধারা কার্যকর হওয়ার পর এই নিয়মের কাজের পরিধি খুবই সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। তবু পঞ্চম তফসিল বহির্ভূত অন্যান্য সমবায় সমিতির সমস্ত পদে আর পঞ্চম তফসিলভুক্ত সমবায় সমিতিতে 'ডি' শ্রেণীভুক্ত যে কোন পদে ও যে সমস্ত পদে মূল বেতন দু'শো টাকার কম ১০৭ নিয়ম অনুসারে সেই সমস্ত কর্মীদের নির্বাচনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা কর্মী নির্বাচক কমিটির থাকবে। (এ) প্রকরণে বর্ণিত শীর্ষ সমিতির ক্ষেত্রে এই কমিটিতে সম্পাদককে রাখার কোন আইনগত সংস্থান নেই। পরিবর্তে সংস্থান রাখা হয়েছে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের (চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার)। সবচেয়ে জরু একটা দেখা যাচ্ছে, যে শীর্ষ সমিতিতে ২৮ ধারা মতে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক নেই সেখানে নির্বাচক কমিটিতে কে থাকবেন। আমার এই কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে রয়েছেন মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক বা ম্যানেজার। অথচ ম্যানেজারকে এই কমিটির সদস্য হিসাবে রাখা হয়নি। কাই যেটা লক্ষণীয় তা হ'ল শীর্ষ সমিতিতে এক্ষেত্রেও সম্পাদক পদের আবশ্যকতা স্বীকৃত হয়নি।

(বি প্রকরণে) বর্ণিত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, পাইকারি সমবায় সমিতি, চালকল সমিতি, হিমঘর সমিতি ও অন্যান্য প্রকরণ সমিতির ক্ষেত্রে গঠিত নির্বাচক কমিটিতেও সম্পাদকের ভাবনা নেই। বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির ম্যানেজার বা মুখ্য নির্বাহী অধিকারিকের মতো থাকে সমিতির বোর্ড স্থির করবে তিনিই থাকবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, এই প্রকরণটি ত্রুটিপূর্ণ। কারণ এখানে অন্যান্য কেন্দ্রীয় সমিতির কথা কিছু বলা নেই। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, পাইকারি সমিতির কথা না বলে সমস্ত কেন্দ্রীয় সমিতির জন্য আনুষঙ্গিক বিধান রাখার প্রয়োজন ছিল।

(সি) প্রকরণে বলা হয়েছে সমস্ত ধরণের প্রাথমিক সমিতির নির্বাচক কমিটি গঠনের কথা। চালকল সমিতি, হিমঘর সমিতি ও অন্যান্য প্রকরণ সমিতি প্রাথমিক সমিতি হলেও তাদের ক্ষেত্রে (বি) প্রকরণে বর্ণিত ব্যবস্থা প্রযুক্ত হবে। প্রাথমিক সমিতির নির্বাচক কমিটিতে সম্পাদক বা তার অনুপস্থিতিতে অন্য পরিচালককে রাখার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি ম্যানেজার বা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, যাকে বোর্ড স্থির করে দেবে তাকেও রাখার কথা বলা হয়েছে। আবার এই নির্বাচক কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে সম্পাদক বা তার অনুপস্থিতিতে হয় মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক আর না হয় ম্যানেজারের কথাও বলা হয়েছে। সম্পাদকের আইনগত অবস্থিতি ও আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালনকে অপরিহার্য করা হয়নি। এই প্রকরণেও কিছু আইনগত অসঙ্গতি আছে যা দূর করা দরকার।

সমবায় সমিতির কাজকর্মের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ পালনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক হিসাবে একান্তভাবে সম্পাদককেই যে ভাবা হয়নি তা সমবায় আইনের ১০১ ধারা ও ২২৬ নিয়ম থেকে বোঝা যায়।

সমিতির সম্পাদক যা যে মনেই ভাল হোক না কেন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিককে নিয়ন্ত্রক তার নির্দেশ পালনের জন্য দায়ী বলে বিবেচনা করবেন। অবশ্য উপবিধি বা সমবায় সভা বা বোর্ডের সভায় গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন দিনের কর্তৃত্বের ভার সম্পাদক বা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক দ্বারা অন্য কোন আধিকারিকের ওপর ন্যস্ত হলে নিবন্ধক তাকেও দায়ী করবেন। এক্ষেত্রে 'যে মনেই ভাল হোক না কেন' — এই শব্দগুলির মাধ্যমে সম্পাদক বা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক কারও ওপর অনন্য অবস্থানের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনীয়তা রাখা হয়নি।

পূর্বোক্ত পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে অবশ্যই আসতে পারি যে ১৯৮০ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলী সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদকের জন্য আনুষ্ঠানিক আয়োজন করে রাখে নি। পূর্বের সমবায় আইন দুটির (১৯৪০ ও ১৯৭৩) তুলনায় সভাপতিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে বৈতনিক পেশাদারি ব্যবস্থাপনার সাথে অবৈতনিক পরিচালকবর্গ ও কর্মকর্তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র রাখার দায়িত্ব ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীর ৪০ নিয়মে একমাত্র সভাপতি ও তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিকেই দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সমিতির ব্যবসা ও প্রশাসনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে সমিতির সভাপতি বা তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতির, যিনি পর্ষদের পক্ষে সমিতির কাজকর্ম তদারক করবেন। আবার সমিতির কাজকর্ম সঠিকভাবে বোর্ডের সিদ্ধান্তমত চলছে কিনা সেই মর্মে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সভাপতি বা তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সমিতির যে কোন নথিপত্র বা প্রতিবেদন সমিতির মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বা সম্পাদকের কাছ থেকে চেয়ে পাঠাতে পারেন। সমবায় নিয়মাবলীর ৪০ নিয়ম অনুসারে সম্পাদকের উল্লেখ রয়েছে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের পরে। এক্ষেত্রে সম্পাদক কাজে অবৈতনিক অপেক্ষা বৈতনিক সম্পাদকেরই অধিকতর ইঙ্গিত প্রদান হয়েছে। অবৈতনিক ও নির্বাচিত কর্মকর্তার ভূমিকায় সম্পাদকের অবস্থান হলে বোর্ডের পক্ষে সভাপতি বা সহ-সভাপতি কর্তৃক সমিতির কাজকর্ম দেখার ব্যাপারটা ঠিক ঐভাবে উল্লিখিত হত না। সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় পেশাদারি উপাদান আনার ইঙ্গিত আমরা ১৯৮৩ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের ২৭ (১) ধারাতেই পেয়েছি। আগের আইন দুটির (১৯৪০ ও ১৯৭৩) ২৩ ধারায় যাকে 'ম্যানেজিং কমিটি' বলা হয়েছে বর্তমান আইনের ২৭ (১) ধারায় তাকেই 'বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্' বলা হয়েছে। বোর্ডের পরিচালকগণ এখন আর নিজেরা 'ম্যানেজ' করবেন না — তারা 'ডাইরেক্ট' করবেন। যে সম্পাদক স্থানের অক্ষরে কৈফিয়ত তার কাছ থেকে কত স্বাভাবিকভাবে চাওয়া সম্ভব হয় যিনি ডাইরেক্ট করেন তার কাছে সেভাবে চাওয়া তবুও শোভন হয় না। ১৯৭৩ সালের সমবায় আইনের পরিবর্তে ১৯৭৪ সালের নিয়মাবলীর ৪৫ নিয়মে বলা ছিল, সভাপতি বা তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি নির্বাহী আধিকারিকের (বর্তমানে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক) কাছে সমিতির যে কোন নথিপত্র বা প্রতিবেদন চাইতে পারেন। সম্পাদকের আদৌ কোন উল্লেখ ছিল না। সমিতির কাজকর্ম ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তমত চলছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অনুরূপ কোন কর্তৃত্ব ১৯৪০ সালের সমবায় আইনের পরিবর্তে ১৯৪২ সালের নিয়মাবলীর ৪৫ নিয়মে সভাপতি বা তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিকে দেওয়া হয়নি।

বিধায়কদের মাধ্যমে জনগণের যে ইচ্ছা সমবায় আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাকে রূপ দিতে হলে বহু প্রচারিত ও বহু আকাঙ্ক্ষিত পেশাদারি ব্যবস্থাপনাকে সমবায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নতুন অর্থনৈতিক নীতির চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে হলে পেশাদারি ব্যবস্থাপনাকে বাস্তবে সুষ্ঠুভাবে কার্যান্বিত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রতিটি সমবায় সমিতিতে পেড্ সেক্রেটারি বা চিফ এক্সিকিউটিভের পদ অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে। তবে কিছু কিছু সমবায় সমিতি যেমন, ছোটখাটো কর্মচারী সমিতি ও যে সমস্ত সমিতি ব্যবসায়িক কারবার না করে শুধুমাত্র পরামর্শ বা নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে বৈতনিক সম্পাদক বা মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের প্রয়োজন হয়তো ঠিক এখনই হবে না। তবে ঠিক এখনই এ প্রয়োজন বিশেষভাবে মেটাতে হবে সমবায় কৃষি কমপ্লেক্স সমিতিতে। এই সমিতিগুলি এখন আর প্রান্তবর্তীতা মুছে ফেলাই প্রশাসনের নিবন্ধক সি এস ব্যাবেল বর্ণিত অবস্থায় নেই। ব্যাবেলের বর্ণনায় 'অনুন্নত সমিতির ভ্রমবিমুখ সম্পাদক আসার না করে খাতাপত্রে আসার করে আসার আসার পালন দেখাবে ___'। এই পদ্ধতির যেটা সব থেকে খারাপ দিক সম্ভবতঃ সেটা হ'ল একদিন ঐ ফোক টাকা পালন দেখানো হয় আর একদিন ঐ টাকা আদায় দেখানো হয়। অন্তবর্তী সময়ে যদি সদস্যের মৃত্যুতে অতিরিক্ত আসে, গরু মারা যায়, কেন নবজাতক আসে ও সদস্যের ছেলের মৃত্যুর মাইনে বন্ধ পড়ে তাহলে সমিতি ঐ আপৎকালীন সময়ে সদস্যের কোন চাহিদাই মেটাতে পারে না। কিন্তু একজন মহাজন তা পারে, আর অনেক।" এ ছবিটা বদলে গেছে। কৃষি ভিত্তিক সমবায় সমিতিগুলি মোটামুটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাল (১৯৫৬-৬১) থেকেই গ্রামীণ অর্থনীতির চেহারাটা পাল্টে দিতে লেগে পড়েছে। সাম্প্রতিক কালে ঋণদান কমিটির (১৯৮৬-৮৯) সুপারিশের সার্বিক রূপায়ণের পথে ঋণদান ছাড়াও ব্যবস্থার মাধ্যমে বহুমুখী কাজের একটা চল নেমেছে। সামগ্রিক প্রত্যাশার অনুকূল সমবায় কৃষি ভিত্তিক সমিতি সমূহের সদস্য-পরিচালক-কর্মকর্তাদের মধ্যে এসেছে। আবার নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের পথে কর্মচারিদের মধ্যেও এসেছে কর্তৃত্ব লাভের কিছু বাসনা। আর সেই দায়িত্ব-কর্তৃত্বের আনুপাতিক হারে পারিশ্রমিকের প্রত্যাশাও এসেছে। উন্নয়নের স্বার্থে সমিতি সমিতি যে শ্রম, সময়, পেশাদারি বহুমুখী দক্ষতা দাবি করে তা সমস্ত ক্ষেত্রে অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদকের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সব সময়ে আশা করাও উচিত নয়। অথচ তিনিই এখন চিফ এক্সিকিউটিভ। সমিতির খাতাপত্র ইত্যাদি সব কিছুর আইনসম্মত তত্ত্বাবধায়ক তিনিই। অনেক অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদককে পদ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতেও শুনেছি। তাদের বক্তব্য হ'ল সাধারণ সভা ও বোর্ডের বৈঠক ছাড়া সমিতির অন্যান্য কাজকর্মে বিশেষ সময়-শ্রম-নেতৃত্ব ও নজর তারা দিতে পারছেন না। অথচ আইনত প্রশাসনিক দায়িত্ব — ক্যাশবুক ও অন্যান্য হিসাবপত্রে সই করার কারণেই হিসাবরক্ষণমূলক দায়িত্ব তাদের ওপরেই থাকছে। এটা ঠিক নয়। এ দায়িত্ব তারা আর

করতে পারছেন না বলে শোনা যাচ্ছে। তাহলেই সমিতির প্রাথমিক মূলধন জমানোর সমবায় সমিতিসমূহে অবিলম্বে অবৈতনিক ও নির্বাচিত সম্পাদকের পরিবর্তে পেড্ সেক্রেটারি বা চিফ এক্সিকিউটিভের পদ সৃষ্টি করতে হবে। আরোপিত দায়িত্বের আনুপাতিক হারে কর্তৃত্ব ও আনুষঙ্গিক পারিশ্রমিকের আয়োজন অবশ্যই রাখতে হবে।

'চিফ এক্সিকিউটিভ' শব্দ দুটির মধ্যে বেশ গাম্ভীর্য আছে। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাও মিশে থাকে। এমন অফিসারের জন্য বাইরে সূত্র খুঁজে বেড়ার দরকার নেই। নিজের ঘরের মধ্যেই অর্থাৎ নিজের কর্মচারিদের মধ্যেই সে রকম কর্মী আছেন। প্রয়োজনমাফিক তাকে আরও প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করে নেওয়াও যেতে পারে। এতে কর্মচারিদের কাছ থেকে আসা আপত্তিযোগের ভিত্তিতে সমিতির সাফল্যেরও দ্রুত উত্তরণ ঘটবে। তাছাড়া সমবায় নিয়মাবলীর ৬৯ (২) (এ) নিয়মে বলা আছে, বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত সমবায় সমিতির উচ্চতরের পদগুলি প্রথমত প্রাতিষ্ঠানিক প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা হবে।

এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গেলে যা করা দরকার তা নিয়ে এখন একটু ভাবা যেতে পারে। বর্তমানে যিনি স্থানেজার আছেন তার পদটি যেমন আছে তেমনই রেখে দিয়ে বেতনক্রমের বৃদ্ধি ঘটিয়ে পেড্ সেক্রেটারি বা চিফ এক্সিকিউটিভের পদ নতুন সৃষ্টি করলে প্রচলিত সমবায় আইনের ৪২ (১) ধারা মতে সমবায় নিবন্ধকের অনুমতি নিতে হবে। কমন ক্যাডার কর্তৃপক্ষের সাথেও আইনত এ স্থাপারে মতামত গ্রহণের স্থাপারটা এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না। 'নিয়োগ' এই শব্দের স্থাপক্ষর পরিধির মধ্যে পদোন্নতি বা সরাসরি নিয়োগ উভয় প্রকার নিয়োগকেই বোঝায়। তাই ৪২ (১) ধারা মতে সহ-নিবন্ধকের অনুমোদন চাইতেই হবে। সমবায় নিয়মাবলীর ৬১ (১) নিয়মে বলা আছে, যে সমস্ত সমিতি শেয়ার মূলধনে অংশগ্রহণ, ঋণ, সরকারি প্রত্যাভূতি প্রভৃতি আকারে সরকারি সাহায্য পেয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দুই হাজার বা তার বেশি বেতনক্রম বিশিষ্ট পদ রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন না নিয়ে সৃষ্টি করা যাবে না। অবশ্য বেতনক্রম দুই হাজার টাকার কম হলে রাজ্য সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। আমার বেতনের কোন হেরফের না করে বোর্ড তার বর্তমান স্থানেজারের বা অন্য যে কোন কর্মচারীর শুধু পদনাম (ডেজিগনেশন) পরিবর্তন করতে পারে। এক্ষেত্রে নতুন পদে পুরানো কর্মীর নিয়োগ বোধাগে 'নিয়োগ' শব্দের পরিধির মধ্যে নিবন্ধকের অনুমোদনের ব্যাপার আসতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ৪২ (১) ধারার প্রয়োগ না করাই ভালো। তবে বর্তমান স্থানেজারের পদনামের পরিবর্তন ঘটিয়ে যদি পেড্ সেক্রেটারি বা চিফ এক্সিকিউটিভ করা হয় তাহলে সমিতির উপবিধি সংশোধন করে নির্বাচিত ও অবৈতনিক সম্পাদকের পরিবর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত বৈতনিক সম্পাদক বা চিফ এক্সিকিউটিভের উল্লেখ সম্পাদক সংক্রান্ত উপবিধির সর্বত্র স্থানে সংস্থাপন ও সংযোজন করতে হবে। উপবিধির যে সমস্ত স্থানে সম্পাদকের উল্লেখ আছে তার সব জায়গায় বৈতনিক সম্পাদক বা চিফ এক্সিকিউটিভের পদনামটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপবিধি সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিবন্ধককে দিয়ে নিবন্ধন করাতে হ'বে। উপবিধিতে 'সম্পাদকের ক্ষমতা ও কর্তব্য' শীর্ষক স্থানেও আনুষঙ্গিক পরিবর্তন করে বৈতনিক সম্পাদক বা মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ সংস্থাপন করতে হবে।

পেড্ সেক্রেটারি বা চিফ এক্সিকিউটিভের পদটি চালু করার ক্ষেত্রে ভারত সরকার গঠিত 'সমবায় ব্যবস্থাপনার গণতন্ত্র ও পেশাদার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সমবায় আইন কমিটির' (অর্থনাড়ীশ্বরণ কমিটি — ১৯৮৫-৮৭) প্রাসঙ্গিক কয়েকটি সুপারিশ এখানে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

(১) কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের অনুমতি নেওয়ার বিধানটি বাতিল করতে হবে।

(২) প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে স্থানীয় এলাকা থেকে কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে।

(৩) কর্মচারিদের সবাই হবে নিজস্ব কর্মচারী। সরকার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিয়োগ (ডেপুটেশন) ভিত্তিতে কোন কর্মচারী আনা উচিত হবে না। কোন উপায় না থাকলে দুই-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটানো যেতে পারে।

(৪) কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে গঠিত কমিটির মধ্যে বোর্ডের সদস্য ও বিশেষজ্ঞ থাকবে সমিতির মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ বা চিফ এক্সিকিউটিভ।

(৫) সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হ'ল চিফ এক্সিকিউটিভ সব সময়েই হবেন সমিতির নিজস্ব একজন বেতনভুক কর্মচারী। কোন সময়েই তিনি অবৈতনিক আধিকারিক বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হবেন না।

এ সম্পর্কে আরো বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বেতনভুক সম্পাদক বা মুখ্য কর্মাধ্যক্ষের ওপর থাকলে বোর্ড নির্দেশনার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তথাকথিত অত্যন্তরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটা কমিয়ে রাখতে পারে। ফলে বোর্ডের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ ও কারোর স্বার্থ ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে নিবন্ধককে তখন হয়তো সমবায়ের স্বার্থিকারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করতে হবে না।

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মেনেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পিছনে যতটা পরিকল্পনা প্রণয়নের ত্রুটি থাকে তার থেকে অনেক বেশি দায়ী রূপায়ণের ত্রুটি। একই পরিকল্পনা অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম বিভিন্ন সমিতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ফল দিচ্ছে। প্রকৃতিক পরিবেশ ও আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো এক রকম হওয়া সত্ত্বেও কিছু সমবায় সমিতি খুব ভালো কাজ করছে আর অধিকাংশ সমিতির কাজ আশানুরূপ নয়। এর জন্য মূলত দায়ী ব্যবস্থাপনার ত্রুটি। তাই তা পেশাদারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দূর করতে হবে। হচ্ছে —হবে—বা হবার তাই হবে ইত্যাদি দায়সারা গোছের সবের সময় কাটানোর প্রয়াসের ওপর সমবায় আন্দোলনের ভবি-ভবিতব্যকে ভগবানের নামে সমর্পণ করে রাখলে আর চলবে না। সমস্যদের কাছে পরিচালকদের আর পরিচালকদের কাছে কর্মকর্তাদের ভাবগত ও নীতিগত দায়বদ্ধতা অপেক্ষা জীবনের জন্য জীবিকার কাছে — চাকরির জন্য আইনের কাছে পেড্ সেক্রেটারি বা চিফ এক্সিকিউটিভের দায়বদ্ধতার পরিবেশ অবশ্যই অনেক বেশি। পেশাদারি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ না করলে সমবায় আন্দোলন পরিশেষে কোন্ মহাপথে তার গতি হারিয়ে ফেলবে কে জানে। পথ হারানো গোরুদির গাড়ীর বোঝা যেমন যেন তাকে আক্রান্ত করে না রাখে তা দেখা সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই আবশ্যিক কর্তব্য। ▲▲▲

গল্প

সাদা-কালো

শেখর বসু

রিজার্ভেশন থাকলে এখন ট্রেনে ওঠা আগের তুলনায় অনেক সহজ ব্যাপার। টিকিটে কোচ ও বার্থ নাম্বার দেওয়া থাকে, সেটা দেখে আরামসে উঠে পড়ো। রিজার্ভেশন চার্ট দেখার জন্যে অযথা ছুটোছুটি করার দরকার নেই। একটা কাজই শুধু করণীয়, তা হল হাতে একটু সময় নিয়ে স্টেশনে পৌঁছে যাওয়া। এটা বললে 'ট্রেন ধরার তাড়া' বলে যে কথাটা চালু হয়েছে তার ধার এড়ানো যায়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ট্রেন ছাড়ার কেন কিছুক্ষণ আগে প্লাটফর্মে পৌঁছবার পরেও অলক দত্ত করে দেখেছে ভেতরে ভেতরে ওর কেমন যেন একটা তাড়া থেকে যায়, বিশেষ করে সে ট্রেন যদি দূরপাল্লার হয়। সঙ্গে ছেলে-মেয়ে-বউ থাকলে এবং মালপত্রের পরিমাণ একটু বেশি হলে তাড়ার সঙ্গে কিছুটা অস্থিরতাও থাকে।

আজ অবশ্য অস্থিরতা নেই, কারণ সঙ্গে আছে শুধু ছেলে আর মাঝারি মাপের একটিমাত্র সুটকেস। ছেলের নাম কিন্নর, বয়েস বারো। কৌতূহল আর উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে সবসময়। ছোটখাটো একটা জমন সেরে ওরা এখন বিশাখাপত্তনম থেকে কলকাতায় ফিরে আসছে।

ট্রেন এলো ঠিক সময়ে। ট্রেন দেখেই ট্রেন ধরার তাড়ায় মাথা বেড়ে গিয়েছিল অলকের। ট্রেন স্টেশনে দাঁড়াবার মিনিট-তিনেকের মধ্যে নির্দিষ্ট কোচের নির্দিষ্ট বার্থে পৌঁছে গিয়েছিল। যাক নিশ্চিন্ত এবার। ট্রেন এখানে দুড়ি মিনিট দাঁড়াবে। অত তাড়াহুড়ো করার কোনও দরকারই ছিল না, শুধু —। ঘড়ি দেখল অলক। এখনও মিনিট-পনেরো দাঁড়াবে। ওয়াটার বটল থেকে একঢোক জল খেয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও। বুকের ভেতরের সেই চাপা অস্থিরতা আর তাড়া উধাও।

ঘুপচা সহযাত্রীদের দিকে তাকাল অলক। এদের চেহারা, পোশাক-আশাক, বার্থে ফেলে-রাখা চাদর আর এরমধ্যেই দেখেই বোঝা যায় এই ট্রেনে একটা রাত কাটিয়ে দিয়েছে এরা। সহযাত্রীদের কেউ-কেউ বোতল ভর্তি করে খাবার জল নিয়ে এলো। কেউ খাবার কেউ চা কফি।

এদের চলাফেরার কোনওরকম ব্যস্ততা নেই। ট্রেনে একবার ওঠিয়ে বসার পরে বড় কোনও স্টেশন এলে সবাই বুঝি এইরকমই একটু ঢিলেঢালা হয়ে যায়। অলক নিশ্চিন্ত মনে সিগারেটে টান দিচ্ছিল। কিন্নরের ছটফটে চোখ ঘুরছিল চারদিকে। ও বোধহয় একই সঙ্গে অনেক কিছু দেখে এবং বুঝে নিতে চায়। হঠাৎই বছর ছুড়ি-বাইশের একটি ছেলে কাতুমাতু মুখ করে মিনমিনে গলায় কি যেন বলতে শুরু করে দিয়েছিল অলকের সামনে দাঁড়িয়ে। অলক একটু অন্যমনস্ক ছিল, কিন্নর ওকে খোঁচা মেরে বলল, 'বাবা তোমাকে কি বলছে শোনো।'

অন্ধ্রের মার্কামারা তেলুগু টানের ইংরেজি, তার ওপর ছেলেটার গলার স্বর একেবারে খাদে পড়ে আছে। একই কথা বারতিনেক না বললে বোঝার উপায় নেই। বোঝার জন্যই কিন্নর বোধহয়, উঠে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটার বক্তব্য ওদের দুজনের কাছে বুঝি একই-সঙ্গে পরিষ্কার হয়েছিল। মোদ্দা কথা হল ছেলেটা সাহায্য চায়। এখানকারই একটা গ্রামে থাকে। পড়াশুনো করে ঘড়গপুরে। ছুটিতে দেশে এসেছিল, কিন্তু ফেরার পথে এই স্টেশনে এসে ওর পকেটমার হয়ে যায়। টাকা-টিকিট দুই গেছে। ঘড়গপুরে ফেরার আর কোনও উপায় নেই, সুতরাং —।

মুহূর্তের মধ্যে অলমাত্র কথার বক্তিটুকু বুঝে নিয়েছিল অলক। এখান থেকে ঘড়গপুর পর্যন্ত ট্রেনের ভাড়া মনে তো অনেক টাকা। দয়া দেখাবার জন্যে অত টাকা অচেনা-অজানা একটা ছেলেকে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং, দুটিবিচ্ছি। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল অলক।

পাশের ঘুপচির দিকে ছেলেটা অদৃশ্য হতেই কিন্নর অবাক গলায় বলল, 'বাবা, তুমি ওকে কিছু দিলে না।'

পৃথিবীর সাদা-কালো দুটো দিক আছে। অল্প ভেজো বয়স থেকেই কালোর দিকটা দেখা করতে গেলে অসুবিধা। অলক সেটা জানে বলেই সহজ গলায় বলল। 'এখান থেকে ঘড়গপুরের ট্রেন ভাড়া অনেক। বেড়িয়ে-টেড়িয়ে বাড়ি ফিরছি, অত টাকা আমার কাছে নেই এখন।'

'পুরো না হোক, কিছুটা তো দিতে পারতে।'

'কিছু টাকার কথা ও তো বলেনি।'

'তুমি ওকে জানতেই দিলে না।'

কিন্নরের চোখমুখ দেখে অলক বুঝতে পারছিল ওই ছেলেটার জন্যে ওর বেশ মন খারাপ হয়ে গেছে।

সময়ের দিকে নজর না দিলে সময় বোঝার একটু তাড়াতাড়ি কেটে যায়। হঠাৎই ট্রেন ছাড়ার বাঁশির শব্দ শোনা গেল, তারপরেই হেলেদুলে চলতে শুরু করল ট্রেন। প্লাটফর্ম পেরোবার পরেই ট্রেনের গতি বাড়তে শুরু করেছিল ধীরে ধীরে। কিন্নর বলল, 'আচ্ছা বাবা, এমনও তো হতে পারে ওই ছেলেটা তোমার কাছে টাকাপয়সা চাইতে আসেনি।'

মজার গলায় অলক জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি চাইতে এসেছিল?'

'কিছুই না। হয়তো জানতে এসেছিল - এই অবস্থায় কী করা দরকার।'

অলক হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'এত লোক থাকতে আমাকে ও হঠাৎ ফ্রাস্ট্রেটিসন্স সেন্টার মনে নেবে কেন?'

বাবার হাসি আর কথা কোনওটাই ভাল লাগেনি কিন্নরের। ও জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

ট্রেনের স্পিড বেড়ে গেছে বেশ। দুদিকে অচেনা প্রকৃতি, একটু রুক্ষ ভাব আছে এর মধ্যে। কেমন যেন নেড়া-নেড়া গাছপালা, তার মধ্যে মাথায় টিকির মতো পাতা নিয়ে তালগাছ। দুপুরের গুমোট ভাব একটু কমেছে, জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকছিল ঝড়-ঝড় করে।

অলক বলল, 'ওহ্! তোকে বলা হয়নি।

গতকাল টিকিট কনফার্মেশনের ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার জন্যে স্টেশনে এসেছিলাম একবার। স্টেশনে ঢোকার মুখে একটা লোকের ধাক্কায় পড়েছিলাম। আমাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি হিন্দি জানেন? বলেছিলাম, জানি কিন্তু কেন?'

গল্পের গন্ধ পেয়ে বিমল মুখ ঘিরিয়েছিল এদিকে। অলক বলল, 'কথা নিয়া মানে কী জানিস?'

ভুরুতে ভাঁজ পড়ল বিমলের।

'কথা নিয়া মানে কী বলব — একেবারে কচিকাঁচা হয়ে যাওয়া। লোকটা বলল, ও হিন্দি ছাড়া কিছু জানে না। ইংরেজি একটু-আধটু বুঝতে পারলেও বলতে পারে না। চারপাশের লোকজন ওকে ঠকেছে বলে। তার ফলে নিজের অসুবিধের কথা কাউকে ও জানাতে পারছে না।'

'কী অসুবিধে?'

অলক হেসে বলল, 'অসুবিধে মোটামুটি একটাই বয়সের। তবে এর চরিত্র কম। লোকটা বলল, ও বিহারের লোক। কাজের খোঁজায় এখানে এসেছে। কন্ট্রাক্টরের ট্রাক স্টেশনের কাছে থাকার কথা ছিল, কিন্তু ট্রেন খুব লেট করে পৌঁছবার জন্যে সেই ট্রাক ও ধরতে পারেনি। এখন ওকে যদি করে কন্ট্রাক্টরের ডেরায় যেতে হবে, কিন্তু সে টাকা ওর কাছে নেই।'

'তোমার কাছে কি টাকা চাইল?'

'হ্যাঁ, হিন্দি না জানলে অবশ্য দিতে হত না।'

'কত চেয়েছিল?'

'কুড়ি টাকা। দিয়ে দিলাম।'

ঘটনাটা প্রায় সত্যি। লোকটা কুড়ি টাকা চেয়েছিল কিন্তু অলক দিয়েছিল পনেরো টাকা। মানের অত পাঁচ টাকা বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্যে ছেলের কাছে ওর ভাবমূর্তি বিশেষ উজ্জ্বল হয়েছে বলে মনে হল না। বিমল আবার জানলার দিকে মুখ ঘিরিয়ে নিয়েছিল।

প্রকৃতির চেহারায় এবার যোগের একটু বদল দেখা যাচ্ছিল। ওদিকে ভালবাসার ফলে ঝলমলে। এদিকে খুব ঝলমল করছে। কিন্তু বিমল কথা বলে বা দেখতে একেবারেই ভালবাসে না। ঝলমলের দিকে তাকিয়ে ও যোগের জন্য কথা ভাবছিল।

অলক বলল, 'সত্যিই যদি এইরকম টাকা হলে দেওয়া যায়, কিন্তু কেউ যদি আমার কাছে হাজার টাকা চেয়ে বসে আমি দেব তোকে?'

'ওই ছেলেটা তোমার কাছে মোটেও হাজার টাকা চায়নি।'

অলক হেসে উঠে ছেলের পিঠে চাপড়ে বলল, 'তুই দেখছি ওই ছেলেটার কথা একেবারেই ভুলতে পারছিস না। হাজার টাকা কথার কথা, ও আমার কাছে দু-একশো টাকা চাইলেও আমি দিতে পারতাম না।'

'কিন্তু তো পারতে।'

'আমার সেই কথা, কিন্তুটা তো ও চায়নি। ছেলেটা বলছিল, ওর কাছে একটা পয়সা নেই, কিন্তু যেতে হবে খড়গপুরে। আজ সারা দিন, সারা রাত ট্রেনে, খড়গপুর পৌঁছবে কাল সকালে। অনেকটা পথ, তাছাড়া সেইরকম, আমার কাছে তো এখন টাকাপয়সা বেশি নেই —।'

বিমল হঠাৎ বেসুরো কথা বলে বলল। 'তুমি আসলে ছেলেটাকে বিশ্বাস করোনি।'

অচেনা ছেলেটার ওপর অলক তখন বিরক্ত হয়নি, কিন্তু ওর হয়ে বিমলের এত ওকালতি দেখে চটে গেল এবার। গম্ভীর গলায় বলল, 'অবিশ্বাস তখন করিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অবিশ্বাস করার যথেষ্ট আছে যথেষ্ট।'

একটু বুঝি চ্যালেঞ্জ করার গলায় বিমল প্রশ্ন করল, 'কেন?'

'তুই ছেলেমানুষ, অতশত বুঝবি না, তবু বলছি। ও আমার কাছে যখন সাহায্য চেয়েছিল তার একটু আগেই যে ওর পকেটমার হয়েছে তা তো নয় — নিশ্চয়ই যেন নিখুঁতভাবে আগে হয়েছে। ওর প্রথম কাজ ছিল পুলিসে রিপোর্ট করা, তারপর সাহায্যের জন্যে ওখানকার স্থানীয় লোকজনের কাছে হাত পাতা।'

'হয়তো চেয়েছিল, কেউ দেয়নি।'

'কিন্তু ট্রেনের যাত্রীদের কাছে টাকা পেলেও ওর পক্ষে তো টিকিট কেটে এই ট্রেনে ওঠা অসম্ভব ছিল।'

'কেন?'

'টিকিটঘর তো প্ল্যাটফর্মের ভেতরদিকে থাকে। টিকিট কাটার জন্যে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরোতে গেলেই চেকার ধরবে। কারণে তুমি এই ট্রেনে করে এসেছ, টিকিট দাও।'

'ও হয়তো চেকারকে বলে এসেছে।'

'কী বলে এসেছে?'

'বলেছে, আমি একটু ভেতরে যাচ্ছি, কিরে আসব একটু বাদেই।'

'ধুর, তাই কখনও হয়।'

'কেন হবে না।'

শেষ কথাটা যুক্তি নয় তবে যুক্তি খোঁজার জন্যেই বুঝি বিমল বাইরের দিকে তাকিয়েছিল আর সেটা পেয়েও গেল চটপট। বলল, 'ছেলেটা হয়তো প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে ঢুকেছিল।'

মনে মনে ছেলের যুক্তিকে একটু তারিফ করল মেহতলা বাবা, কিন্তু মুখে বলল অন্য কথা। 'প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটবে কেনাকেটা। ও বলল না ওর টাকাপয়সা সব পকেটমার হয়ে গেছে।'

'প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটার টাকাটা হয়তো অন্য পকেটে ছিল।'

যদি কেউও থাকে সেটা ও বোঝার মতো প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে খরচা করতে যাবে কেন? কেউ করে। এটা তাদের কোনও করার নেই যে ট্রেনে চেপে যারা যাচ্ছে তারা খুব ভাল, আর ট্রেনের বাইরে যারা আছে তারা খুব খারাপ। আসলে —।'

'আসলে কী?'

আসলে বলে এই মুহূর্তে যে কথাটা মনে এসেছে সেটা বলতে চাইছিল না অলক, কিন্তু বিমলের চাপাচাপিতে মুখ খুলতেই হল ওকে। 'আসলে কথাটা হল ছেলেটা জানে, ওর কথা সত্যি কি মিথ্যে সেটা তো আর যাচাই করার সুযোগ নেই ট্রেনের যাত্রীদের। ট্রেন থেকে নেমে পড়ে কেউ তো আর খোঁজখবর করতে যাবে না। তার মানে কী? দিলে ভাল, না দিলেও ধরা পড়ার ভয় নেই। আমি দিইনি, অন্তত কয়জন হয়তো দেবে না, কিন্তু কোনও একজন দিয়ে ফেলবে।'

বিমল এবার যেন আঙুল তুলে অভিযোগ করার ভঙ্গিতে বলল, 'তার মানে তুমি ইচ্ছে করেই দাওনি —।'

'না-না। আমি মিথ্যে কথা বলছি না। ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে তো সব টাকা খরচা হয়ে গিয়েছে। তবে থাকলেও দেওয়া হয়তো ঠিক হত না। অন্যায় টাকা হলে অন্য ব্যাপার

এই বেলা কাল আমি ওই লোকটাকে এক কথায় খুড়ি টাকা দিয়ে বিদায় —।'

কিন্তু কিন্তু বাবার গতকালের অযাচিতভাবে নিয়ে একটুও মাথা ঘামাল না। একটু বাদে কেমন যেন ঢাল আর অভিমান-মেশানো গলায় বলল, 'তুমি আসলে লোকটাকে বিশ্বাসই করোনি।'

'বিশ্বাস যে করে সে কাউকেই করে না। আমি যদি অবিশ্বাসী হতাম তাহলে কালকের ওই লোকটাকে টাকা দিতাম না।'

অলকের এই জোরদার যুক্তি আর উদাহরণকে গোড়া থেকেই অগ্রাহ্য করে আসছিল কিন্নর। এবারও ওর কোনও জবাবের হল না।

ছেলের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে একটু বুঝি বিরক্ত হল অলক, তারপর বলল, আচ্ছা, তুই ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে ভেবে দেখ তো। ধর, ওই ছেলেটার জায়গায়, তুই আছিস। তুই কলকাতা থেকে ভাইজাগে আসছিস। ছেলেটার মতো তোর পকেটমার হয়ে গেছে। তুই যদি নিরুপায় হয়ে সাহায্য চাস, কার কাছে যাবি? নিশ্চয়ই কোনও বাঙালির কাছে। সেটাই তো স্বাভাবিক। ট্রেনের কামরায় বাঙালি গিজগিজ করছে। তুই তাদের কাছে না গিয়ে অন্য কারও কাছে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে তোর বিপদের কথা বলতে যাবি না নিশ্চয়ই। চারদিকে অচেনা লোক, ছেলেটা তাদের কাছে না গিয়ে আমার কাছে এলো কেন বল্।'

'তাদের কাছে হয়তো আগে গিয়েছিল, পায়নি। তারপর তোমার কাছে এসেছে।'

'হতে পারে? অসম্ভব নয়। তবে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে ছেলেটাকে বিশ্বাস করা কঠিন। এর চেয়ে বরং কালকের ওই লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। হিন্দিভাষী লোক, হিন্দি ছাড়া আর কোনও ভাষা জানে না। নিজের বিপদের কথা জানাবার মতো লোক পাচ্ছিল না। আমার চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছে আমি দক্ষিণ ভারতের লোক নই, তাই আমার কাছে এসেছিল। তাছাড়া ও যা বলেছিল সেটা বিশ্বাস করা যায়, এই ছেলেটার মতো না —।'

কিন্নর বাবার কথার উত্তরে পাল্টা কোনও যুক্তি খাড়া করতে পারল না, তবে ওর চোখমুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় — এই যে এত যুক্তি সেসব ওর মনে একেবারেই দাগ কাটতে পারেনি। ও বাইরের দিকে তাকিয়েছিল আবার। বাইরের মাঠে এখন ঘনান্ধকারের কালো আস্তরণ।

তর্কের বন্যা হল মিলিয়ে যাওয়া। তাছাড়া ফেলটুনের এই ঝাঁকুনির মধ্যে পুরনো তর্ক নতুন করে দানা বেঁধে ওঠা বেশ কঠিন কাজ। দুপুরের আকাশ পালা করে উত্তাল আর কাপসা হতে হতে একসময় অন্ধকার হয়ে গেল।

সন্ধে হতেই আলো জ্বলে উঠেছিল ট্রেনের মধ্যে। এ আলো বই-টই পড়ার পক্ষে মোটেই নয়, তবে বাকি কাজগুলো সারা যায়।

ট্রেনের বাইরে অন্ধকার চেপে বসার পরে একটা-দুটো করে অনেকগুলো তারা ফুটে উঠেছিল আকাশে। নিশ্চয়ই ঝিলু ঝিলু আলো, ওগুলো হয়তো সূর্যের কোনও গ্রহের।

সন্ধ্যের পরে ট্রেনে খাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ থাকে না বোধহয়। খাওয়া এবং শোওয়া। যারা ভাগ্যবান তারা ওরে পড়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়তে পারে। ট্রেনের দুলুনিতে ঘুম কারও কারও আবার বেশ গাঢ় হয়। অলকের কিন্তু ঘুম আসতে চায় না চট করে। তার ওপর এটা আবার সন্ধেরাত্তির। ওরে ওরে আকাশ-পাতাল ভাবা ছাড়া এই মুহূর্তে ওর আর কিছু করারও নেই।

খাওয়া-দাওয়া সারার পরে এই কূপের সবাই ওরে পড়েছিল। সিলিংয়ের অল্প পাওয়ারের হলুদ আলোর তলায় এখন নীল আলো জ্বলছে। তাপমাত্রা এক সহযাত্রীর নাক ডাকছিল। ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে ওই শব্দ কানে পৌঁছে দিতে পারা কম ক্ষমতার ব্যাপার। অনিদ্রার কষ্ট পেতে পেতে গভীর রাতে এই শব্দ সোনার অভিজ্ঞতা খুবই অলক। কিন্তু এখন, এই সন্ধেরাতে, শব্দটা ওরে কেন যন্ত্রণাই পাচ্ছিল অলক। ট্রেনের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গের কোথায় যেন একটা মিল আছে। মিলটা খুঁজে বার করার খেলায় কিছুটা সময় কেটে গেল ওর। নীচের বার্থে ওরে আছে ও, মাঝের বার্থে কিন্নর। রাত একটু-একটু করে বাড়ছিল।

চোখ বুজে থাকতে থাকতে কখন যেন ঘুমে চোখ লেগে গিয়েছিল অলকের। কিংবা এটা ঠিক ঘুম নয়, গাঢ় তন্দ্রা বা কিছুনি। ট্রেন আচমকা একটা জোর ঝাঁকুনি দিতেই চোখ আবার খুলে গিয়েছিল ওর। চোখ খুলতেই দেখে সামনে একটা লোক, অচেনা লোক। চোখে চোখ পড়তেই লোকটা একটু ঝুঁকে পড়ে ইংরেজি আর হিন্দি মিশিয়ে বলল। আমাকে মুটো বর্ষের অবস্থানের ক্ষেত্রে একটু ওরে যেতে?

কথাটা শুনে বিরক্ত হল অলক। রিজার্ভড্ কম্পার্টমেন্টে কেউ। এ লোকটা রাত্তিরবেলায় এখানে উঠল কীভাবে! নাকি আগেই উঠে পড়েছিল, এখন শোবার জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছে। কলকাতার গার্ডের ওপর রাগ হয়ে গেল অলকের। লোকটা পুরোপুরি দায়িত্বজ্ঞানহীন তো! এখানে এভাবে উটকো লোক উঠে পড়ার সঙ্গে সিকিউরিটির প্রশ্নও তো জড়িয়ে আছে।

আবছা নীল আলোয় প্রশ্ন করলে না শোনার ভান করে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেওয়া যায় বুঝি। অলক কোনও উত্তর দেয়নি, কিন্তু ওর মাথার মধ্যে হাজার একটা চিন্তা খেলে গিয়েছিল মুহূর্তের মধ্যে।

লোকটা এবার এক পা এগিয়ে এসে আবার চোখে চোখ রেখে গলার স্বর আর একটু উঁচুতে তুলে একই অন্যায় অনুরোধ আর একবার করল।

অলক আর একটু হলেই বলে ফেলেছিল মাপ করবেন, এখানে হবে না, অন্য কোথাও দেখুন। কিন্তু মুখের কথা বার করার আগেই মরুভানের বার্থ থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে কিন্নর বলল, 'ওকে না বাবা, রাত্তিরে তো আরামের আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।'

অন্য সময় হলে হয়তো ছেলের কথাটাকে পাত্তা দিত না অলক, কিন্তু আজ ওর সঙ্গে কেন কিছুটা ছেলেমানুষি তর্কাতর্কি হয়েছে বলে এখন আর আপত্তি করার মধ্যে গেল না। অচেনা লোকটার দিকে হাত তুলে ইঙ্গিতে জানাল ঠিক আছে, উঠে বলে ওরে পড়তে পারো।

কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা ওরে পড়েছিল। এত তাড়াতাড়ি আর কাউকে কখনও ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের মেঝের ওপর ওরে পড়তে দেখেনি অলক। পোশাক-আশাক তো বেশ ভদ্রলোকের মতোই। বিছানা বলতে ছিল কম্বলের মতো মোটা পুরু, ওটা

পাতা না-পাতা মুই সমান। আর ওরে পড়ার একটু বাদেই বেতাবে নিশাড় হয়ে গেল তাতে যে কারও মনে হবে ঘুমিয়ে পড়েছে লোকটা।

এও ভাগ্যবান। লোকটা বোধহয় এইভাবেই চলাফেরা করতে অভ্যস্ত। বার্থ রিজার্ভেশনের জন্যে আধা রাতা নেই, ট্রেনে উঠে পড়লেই হল। তারপরের ঝামেলাটা হয়তো ওপরওলার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। কিছু কিছু লোক এইভাবেই তো জীবন কাটিয়ে দিল দিব্যি। প্রেত কঙ্কাটি বাঙ্গালার মতো আছে, কিন্তু দেখলে মনে হয় নিজেদের যাবতীয় দুশ্চিন্তা অদৃশ্য কোনও শক্তির কাঁধে কিংবা পায়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

ঘুম না এলে কত রকমের চিন্তা-ভাবনা বুকের ভেতর গভীর থেকে উঠে আসে। রাত বেশি হয়নি, কিন্তু চারদিকের সবকিছুই কী এক আশ্চর্য উপায়ে লুকিয়ে পড়েছে। যা আছে তা হল শুধু ট্রেনের আওয়াজ আর নিচুতি ভদ্রলোকের নাকডাকানি। এইভাবে কতক্ষণ যে আসে! ঘুমে চোখের পাতা ভারি হওয়ার পরে অলকের মনে হয়েছিল, রাত এবার সত্যিই গভীর হয়েছে।

হঠাৎ একসময় ঝিকোর-ঝোঁচাঝোঁচিতে ঘুম ভেঙে গেল অলকের। সকাল হয়ে গেছে। চারদিকে উজ্জ্বল আলো। পদ্মের বর্ষে অমিল ধন্দপতি হৈ-চৈ ঝরিয়ে নিয়েছে। আশেপাশে গড়িয়ে আছে সহযাত্রীদের আরও কয়েকজন। কী ব্যাপার?

ব্যাপারটা জানা গেল একটু বাদেই। বর্থের নীচে রেক্সিনের একটা বড় ব্যাগ ছিল ওই ভদ্রলোকের। ধারালো ছুরির টানে সেটা দু-ফাঁক হয়ে গেছে, আর ভেতরের সব জিনিস-পত্র হাওয়া।

কথাটা কানে যেতেই লাফ দিয়ে উঠে পড়েছিল অলক, তারপর উঁকি মেরেছিল বর্থের নীচে। না, ওর স্যুটকেসটা অক্ষত আছে।

ওদিকের আপার বর্থে শুয়েছিলেন কলকাতার এক ব্যবসায়ী। তিনি বললেন, ভোর রাতের দিকে একটা লোককে দুটো বর্থের মাঝখানে শুয়ে থাকতে দেখেছিলেন। লোকটা কখন এসেছে তা অবশ্য জানেন না। জানলে কিছুতেই শুতে দিতেন না। ভদ্রলোকের কথায় সায় দিলেন এই দুপের দু'জনের চারজন, আর সম্মিলিত অর্থের দু'জন। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ছাড়া আর কেউই লোকটাকে দেখেনি। সবাই তখন ঘুমোচ্ছিল।

অলক বুঝতে পারল গোলমালটা ওই পাকিয়েছে। তবে কিছুক্ষণ ঢুকে না পড়লে চোরটাকে নির্ঘাত ও ধেদিয়ে দিত। এই অবস্থায় অলক কেউই আর ঝামেলায় নিজের অ্যাসানির কথা জানাতে যায় না। অলকও গেল না। কেউ যখন জানতেই পারেনি তখন সবাই যা হয় অত্র নিক আর পাঁচজনের মতো ও-ও ঘুমোচ্ছিল।

কিন্নরের ঘুম ভেঙে গেছে, ও সবকিছু অনেকটুনে মুখ চুন করে বসেছিল। মুখে কোনও কথা নেই, নিজেকে ও নির্ঘাত বড় নষ্টের গোড়া ভাবছে। অলক ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনের কথা পড়ে নিয়েছিল পরিষ্কার।

ট্রেন ঘণ্টা তিনেক লেট হল করেছে, এত লেট না করলে এতক্ষণ তো ওদের হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যাওয়ার কথা। মস্ত লম্বা জার্নিতে তিন ঘণ্টা লেটকে বোধহয় খুব একটা বড় করে ধরা হয় না। যাত্রীদের কেউ কেউ একটু ওপ্ত নিস্তুতি প্রকাশ করেছিল, ব্যস ওই পর্যন্তই।

এপাশ-ওপাশের অনেকেই বিছানাপত্তর, এয়ারপিলো ইত্যাদি গুটিয়ে নিচ্ছিল। আকাশে উজ্জ্বল রোদ। কিন্নর বাইরের দিকে মুখ করে বসেছিল। এই সময়ের বড় সকরে প্রকৃতির রূপবদলগুলো বেশ চোখে পড়ার মতো। অঞ্চের প্রকৃতি এখানকার তুলনায় রুক্ষ। এদিকে সবুজের পরিমাণ বেশ বেশি। ট্রেন লাইনের কাছাকাছি ছোটখাটো বাড়ি-ঘরগুলির ছেকে আছে সবুজ গাছপালায়। সবচেয়ে সবুজ রুপি পানাপুকুরগুলো। এমন পুকুর ভারতবর্ষের আর কোথাও বোধহয় নেই। এসব নিয়ে কিন্নরের সঙ্গে একটু গল্প জোড়ার চেষ্টা করেছিল অলক, কিন্তু ওর তরফ থেকে তেমন দু-চারটে তেমনো হুঁ-হাঁ আসায় জন্য গল্প জমেনি তেমন।

খড়গপুর আসতেই জানলার দিকে গাল প্রায় চেপে ধরেছিল কিন্নর। অলক বলল, 'স্টাইকটা লম্বা হল, এত বড় স্টাইকের ছুটি আর কোথাও পাবি না।'

'এখানে কতক্ষণ দাঁড়াবে ট্রেনটা?'

'অনেকক্ষণ, তা ধর ঘিনিট-চল্লিশ।'

'ঠিক আছে, ট্রেন ভালভাবে থামুক, তারপর। কম্পার্টমেন্টের সামনেই থাকবি, আর উঠে আসবি ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

ট্রেন থামতেই গরম চা আর গরমাগরম পুরি-তরকারির ঝিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিছু লোক নামল, কিছু লোক উঠল ; তবে ট্রেনটা মোটামুটি ফাঁকাই।

অলক একটা কলকাতার খবরের কাগজ কিনেছিল। চেনা চেহারার কাগজ, পড়তে তেমন চেনা-চেনা। ট্রেন থামতেই কিন্নর নেমে গিয়েছিল। অলক তাঁড়ের চায়ে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজে হেডিংয়ে চোখ বোলাচ্ছিল।

এ কদিন দক্ষিণ ভারত থেকে বার হওয়া ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ে পড়ে নিজেকে রীতিমত নিয়মিত প্রবাসী বলে মনে হয়েছিল অলকের। এখন কলকাতার বাংলা কাগজ হাতে পেয়ে পরীক্ষা-ফল, পুরনো অভ্যাস চাগা হয়ে উঠেছিল আবার। ভাল খবর বিশেষ নেই, কিন্তু এ রাজ্যের মন্দ খবরগুলোও কেমন যেন নিজেদের বলে মনে হয়। নিজের প্রদেশ বলে কথা। কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে উঁচু গলায় বাংলা কথা আসছে পড়ছিল কানের উপর। অকারণ হৈ-হট্টগোল অলকের ভাল লাগে না একদম, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে, সবকিছুই যেন একটা আবেদন ছিল ওর কাছে।

তাঁড়ের চা শেষ হওয়ার পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছিল অলক। সকালে এইভাবে নিরিবিলি হয়ে কাগজ পড়ার আনন্দই আলাদা। সময় তরতর করে গড়িয়ে যায়। এখানেও পড়ছিল ওই ভাবে। হঠাৎই একবার ঘোর কেটে যাওয়ায় ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল অলক। ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র মিনিট-তিনেক বাকি, কিন্তু কিন্নর — কিন্নর কোথায়?

জানলা দিয়ে চারদিকে তাকাল, চোখে পড়ল না। লম্বা পায়ে কম্পার্টমেন্টের দরজার কাছে চলে এসেছে অলক। কিন্তু কই, কোথাও তো নেই কিন্নর। আশ্চর্য! গেল কোথায়।

আরও কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়ে থাকার পরে ছেলের দেখা পেল অলক। ওই তো ওদিক থেকে আসছে। ট্রেন ছাড়তে আর এক-দেড় মিনিট বাকি, অথচ ওর কোনও হুঁশ নেই।

রাতে ভাল-মন্দ খাওয়া সেরে নিয়েছিল অলকেশ, কিন্তু ও ফেটে পড়ার আগেই তরুণো ঘুমে বিভোর হল, 'মা, কোথাও দেখতে পেলাম না তো ওকে।'

'কাকে?'

'ওই ছেলেটাকে।'

'কোন্ ছেলেটা?'

'ওই যে তোমাকে বলছিল না — খড়্গপুরে আসতে চায়, কিন্তু টাকাপয়সা নেই —।'

বিস্ময়ের তোড়ে অলকের সব রাগ ভেসে গিয়েছিল। 'ওই ছেলেটাকে খোঁজার জন্য তুই এখানে নেমেছিলি। তোর মাথা খারাপ।'

নিমেষে মুখ ভার হল তিয়ার, 'না, মানে আর কারও কাছ থেকে যদি টাকা জোগাড় করে —।'

ঠাট্টার গলায় অলক বলল, 'তোর কি ধারণা ও টাকা জোগাড় করতে পারলে সত্যি সত্যি এখানে আসবে। তুই সত্যিই আর বড় হবি না। লোক ঠকানোর কতরকম যে কিসিম আছে —। তুই সাতদিন পরে ওই স্টেশনে গিয়ে দেখ ছেলেটা ঠিক ওইভাবে একটা গল্প শুনিয়ে টাকা জোগাড় করছে —।'

কাল রাতে এই ব্যাপারে তিয়ার বেশ তেড়েফুঁড়ে তর্ক করেছিল, কিন্তু এখন ও আর একটা কথাও না বলে চুপের দিকে চলে গেল।

ট্রেন ছেড়ে দিল একটু বাদেই।

তিয়ার জানলার দিকে মুখ করে বসে আছে চুপ করে।

সকালের রোদ আরও কিছুটা ঝকঝকে হয়েছে। হাওয়া আসছে চমৎকার। এমন সকালে মন খারাপ করে থাকার কোনও মানে হয় না, তার উপর আবার মন খারাপের কারণটা যদি কোনও কারণই না হয়। তবে ছেলেটা বড্ড গোঁয়ার, একটা কিছু মাথায় ঢুকে গেলে বেরোতে চায় না চট করে। মাঝরাতে ওই চোরটাকে ভাল লোক ভেবে শোবার ব্যাপারে উৎসোরি না করলে ও নির্ঘাত ভাগিয়ে দিত ওকে। তাহলে আর ঝুরিটি হত না।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, ওই ঘটনা থেকে ছেলেটা কোনও শিক্ষা নিতে চাইছে না, উলটে ওই চিটিংবাজ ছোকরাটাকে খুঁজে এল খড়্গপুর স্টেশনে। ছাপাগুলা এভাবে মাথার মধ্যে ঘেলে যাওয়ার ছেলের ওপর আর একবার বিরক্ত হল অলক। তারপরেই ওর চিন্তা-ভাবনা বাঁক নিল অন্যদিকে।

ঠিক আছে, মানলি এই বয়েসটা বিশ্বাস করার বয়েস, ভালবাসার বয়েস। জান থেকে পাশ কাটানো — এটাও ঠিক। কিন্তু তাই বলে চিরকাল অজ্ঞান হয়ে থাকার কোন মানে হয় না। পুরনো দিনে ছেটেদের নীতিশিক্ষা দিত বিষ্ণু শর্মার মতো পণ্ডিতরা। নীতিশিক্ষা মানে শুধু ভাল জিনিসের শিক্ষা নয়, খারাপ জিনিস চিনিয়ে নেওয়ার শিক্ষাও ছিল তার মধ্যে। ওই যে কী যেন শব্দটা — 'অজ্ঞাতকুলশীল' — হ্যাঁ-হ্যাঁ, পাশ্চাত্যে তো বলেছে অজ্ঞাতকুলশীল লোককে বিশ্বাস করবে না। তার মানে অজানা-অচেনা, উটকো লোককে চট করে বিশ্বাস করে নিলে বিপদ হতে পারে।

এই তো অল্প সময়ের মধ্যে তিনটে উটকো মানুষ এসেছিল ওর কাছে। বিহ্বির সেই লোকটা কন্ট্রাক্টরের ছেলের জন্য বাস ভাড়া বাবদ ওর কাছ থেকে পনেরো টাকা নিয়েছে। অবশ্য, ওটা অল্প টাকার ব্যাপার। খড়্গপুরের ছয়-সাতটা ছেলেরা সেটা একটা দাঁও মারতে চেয়েছিল, ভাগিয়ে নিয়েছে ও। কাল ট্রাভিয়েস চোরটা কাজ হাসিল করার জন্য প্রেমে পড়তে চেয়েছিল, ওকেও ভালবাসিয়েছিল, কিন্তু পারেনি এই ছেলেটার জন্য। কথায় বলে, পথেঘাটে না ঘুরলে চোখ কান ফোটে না, সেই চোখকান ফোটানোর শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ছেলের পাল্লে একটা টোকা মারল অলক।

তিয়ার ঘুরে তাকাল। তরুণো, ধারধারে মুখ। নিশ্চয়ই ওই ব্যাপারটা ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে এখনও। ছেলেকে সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য গলা উঁচাল অলক। 'তোকে বলা হয়নি, আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে মিনুপুরে চারটে পাখা চালানি হয়ে গেল। হ্যাঁ, এও এক ধরনের চালানি। একটা লোক মেকানিক সেজে এসে বলল — আমাকে অতিরিক্ত পরিশ্রমে, পাখাগুলো সার্ভিসিং করতে হবে। অতিরিক্ত আমাদের অফিসে কাজ করেন। সেদিন তখন উনি অফিসেই। ওঁর কর্তা ওই চোরটাকে সরল মনে বিশ্বাস করেছিল। সত্যি-মিথ্যে যাচাইয়ের মধ্যে যায়নি। ব্যস, চোখের নিমেষে চার-চারটে পাখা খুলে নিয়ে হাওয়া। তারপর অবশ্য পুলিশে জানানো হয়েছিল, কিন্তু কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি পরপর। তবে ওই ভদ্রমহিলা একটু সতর্ক হলে ওঁকে ওভাবে বোকা বানিয়ে যেত না। অন্যমনে বলতে পারতেন, উনি তো আমাকে কিছু বলে যাননি, আপনি কাল সকালে আসুন। তুই হলে কী করতিস?'

উত্তর না দিয়ে তিয়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল জানলার দিকে। অলক পরিষ্কার বুঝতে পারল, গল্পটা ওর মনে সতর্ক হওয়ার কিসুমাত্র ফারদা জানাতে পারেনি।

অলক হাল ছাড়ল না। উটকো লোককে এক কথায় বিশ্বাস করে ঠকে যাওয়ার আরও কয়েকটা গল্প শোনাল। সব গল্প পুরো সত্যি নয়, শেষেরটা তো আগাগোড়া বানানো। কিন্তু কোনও গল্পই ছেলের মনে কোনওরকম ছাপ ফেলতে পেরেছে বলে মনে হল না। অলক অবশ্য হতাশ হল না। এটা তো প্রথম দফার সুশিক্ষা, পরে আবার দেখা যাবে।

বাইরের রোদ আরও উজ্জ্বল। ট্রেন কলকাতার দিকে আরও অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ট্রেনের দু'পাশের জনবসতি ঘন হতে শুরু করেছে। এসব দেখলেই বোঝা যায়, আর কিছুক্ষণ বাদে বড় এক ঘিঞ্জি শহরের দেখা পাওয়া যাবে। হোক ঘিঞ্জি, তবু এ শহরের টান আলাদা। এখানে যারা ছোট থেকে বড় হয়েছে, তারা বোম্বের জন্য কোথাও গিয়ে শান্তি পাবে না। হাজার অসুবিধে, হাজার বেয়াড়া-কিসুটে ব্যাপার, তবু কলকাতা শেষ পর্যন্ত কলকাতাই। কলকাতার মোহ ঢাকার জন্যই বোম্বের আচমকা আর একটা মিথ্যে গল্প বানিয়ে ফেলল অলক। কিংবা ও এখন বানায়নি, ওর অবচেতন মনে একটু একটু করে অনেক আগেই গল্পটা তৈরি হয়েছিল।

অলক একটানে তিয়ারকে নিজের দিকে ফিরিয়ে বলল, 'তন্ময়। তোকে বলা হয়নি। কাল রাতে, বোম্বের তোর রাতের দিকে, আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার। দেখি মিনকালো একটা লোক ঝুঁকে পড়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। মেঝেতে শুয়ে থাকা লোকটা তখন ছিল না। লোকটা মনে হয় কী যেন খুঁজছিল, আমার চোখে চোখ পড়তেই সরে গেল। তখন মনে হয়েছিল বাথরুম থেকে বেরোনোর পরে আমাদের ভুল করে হয়তো

আসলের ঘুপচেতে ঢুকে পড়েছে। এখন মনে হচ্ছে আমি ঘুমোবার পরে ওই লোকটা আবার ফিরে এসেছিল। ছুরি দিয়ে ব্যাগ কেটে জিনিসপত্রগুলো ওই হয়তো হাতিয়ে নিয়েছে —।'

মিন্তু গল্পটা শুনে বলতে বলতে রাগে লাল হয়ে উঠেছিল বিজয়ের মুখ। জোর দিয়ে ও বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই লোকটাই চোর। কাল রাত্তিরে যে এখানে ওয়েছিল সে কিছুতেই চুরি করতে পারে না।'

গভীর এক বিশ্বাসবোধ থেকে বলা কথা-গুলো শুনে অলক কিছুটা চমকে উঠেছিল। গল্পটা আগাগোড়া বানানো, ও-ই বানিয়েছে, কিন্তু এখন বিজয়ের কথা শুনে মনে হচ্ছে — কোথাও একটা সত্যি থাকলেও থাকতে পারে।

জানলা দিয়ে হাওড়া ব্রিজের মাথা দেখা যাচ্ছে। একটু বাদেই ট্রাফিক হবে মলিন অথচ মোহময়ী কলকাতা। অলক ছেলের কথায় সায় দেওয়ার গলায় বলল, 'তখন ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরে আবার যদি না ঘুমোতাম, তাহলে বোধহয় এই চুরিটা আর হত না —।'

▲▲▲

We Best Compliments From

KONNAGAR SAMABAYA BANK LIMITED

66, G T Road (West)
Konnagar, Hooghly
Phone : 663-0669

Please Avail Our Holiday Home at
Puri

'সমবায়'ই শক্তি
সমবায়ই মুক্তি।।

ট্রান্সপোর্টেশন ডাইরেক্টরেট (ফুড) এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

১১ এ, নির্মা গালিব স্ট্রিট
কলিকাতা - ৭০০ ০০৮৭

With Best Compliments From

E. & N. F. Rly. Junior Co-operative Credit Society Ltd.

Eastern Railway Divisional Office Buildings,
Sealdah, Calcutta - 700 014

"Our Co-operative Marches Ahead"

Some Highlights

1. No. of Members as on 31.3.93 :
   General - 26, 124 (approx.)
   Nominal - 2,029 (approx.)

Paid up Share Capital as on 31. 3. 93 :
Rs. 1,67,19,310/- (approx.)

Loan to members disbursed during the year
ended on 31.3.93 Rs. 9,00,00,000/- (approx.)

2. Raising ceiling limit of loan to Rs. 15,000/- or 10 times of pay whichever is less ;
3. Registration of the amended Bye-laws as per provision of M.S.C.S. Act, 1986 and the rules framed thereunder ;
4. Disposal of loans within 7 (seven) working days from the date of receipt ;
5. Up-to-date payment of interest on P.G.F. and dividend upto 1988-89 ;
6. Auditing of he Final Accounts upto 1991-92 nearing completion ;
7. Facilities of opening Fixed A/Cs and Recurring Deposit A/C bearing interest at the rate of 10% p.a. ;
8. General improvement in the working of the Society ;
9. Arranging loan payments to members working at Katihar region and Kanchrapara Workshop through Nationalised Banks at their working places ;
10. Extension of loans to directly recruited class III staff of the Railway ;
11. The rate of interest in loan is lower than most of the Railway Co-operative Credit Societies and it is 12% per annum ;
12. Started in 1934 with a working capital of Rs. 20,000/- (Twenty thousand) only and present working capital of the Society is Rs. 10 Crores. (approx.)
13. A Railway employee who becomes a member after completion of 2 years service in the Railway or confirmed earlier is entitled to get loan from the Society.

S. Bhattacherjee
Chairman

R. Prasad
Secretary

দি ঘাটাল পিপ্‌ল্‌স কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ঘাটাল, মেদিনীপুর

স্থাপিত ঃ ১৯১১

ফোন নং ঘাটাল - ৫৫-১৫৫

দীর্ঘ ৮৪ বৎসর ধরে ঘাটালবাসীর বহুমুখী সেবায় নিয়োজিত
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন সমবায় ব্যাঙ্ক
(সমবায় রেজিঃ নং ৮১৭ তাং ২০-৫-১৯১১ এবং
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লাইসেন্স নং - ইউ বি বি ডব্লিউ বি ৮২৮ সি)

যা আপনাকে দিতে পারে ঃ

- ☐ সব রকমের আমানতকে বিমা প্রকল্প দ্বারা সুরক্ষিত রাখা
- ☐ আমানতের উপর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায় ১/২% সুদ বেশি প্রদান করা
- ☐ বিল কালেকশন ও ড্রাফ্‌ট্‌ ইস্যু করা
- ☐ দুর্বলতর শ্রেণীকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্জ দাদন করা
- ☐ সেফ ডিপোজিট লকার-এর সুযোগ প্রদান করা
- ☐ স্বর্ণালঙ্কার জামিনে কর্জ দাদন করা

☐ দুই, তিন বা চার চাকার মোটরযান কিনতে সহজ শর্তে কর্জ দাদন করা

এই ব্যাঙ্ক আপনার ব্যাঙ্ক। আপনার সহযোগিতাই আমাদের মূলধন।
আপনার মূল্যবান পরিদর্শনের অপেক্ষায় রইলাম। সমবায় দীর্ঘজীবী হউক।

রণজিৎকুমার বেরা
সভাপতি

তপন ভট্টাচার্য
সম্পাদক

প্রবন্ধ

প্রসঙ্গ ঃ প্রেম প্রয়োজন

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

বহুকাল বহু আগের কথা। নৈমিষারণ্যে শৌনক মুনি একটি সভা ডেকেছেন। তিনি সে সময়কার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। প্রায় ৬০ হাজার জ্ঞানী-গুণী-মনীষী সভায় সমবেত হয়েছেন। সভা শুরু হয়েছে। সূতমুনি রোমহর্ষণ মুনির পুত্র। সভায় তিনি সভাপতিত্ব করছেন। তিনি কেবল সভাপতিই নন, নিষ্পাপ ও বেদজ্ঞ। সভার আলোচ্য বিষয় কি? দুটি আলোচ্য বিষয়। বেদির তলাই গতানুগতিক, অপ্রয়োজনীয়। কল্যাণ বা মঙ্গল কাকে বলে — এটি সর্বশ্রেষ্ঠ আলোচ্য বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পেলো। কল্যাণের রূপকল্পের আগে। যেমন প্রতিটি রাজনৈতিক দল প্রত্যহ আমাদের জন্য কতই না কল্যাণ করে চলেছেন। একজন বললেন — শুধু খাদ্যই কল্যাণ নয়। যারা মিথ্যা বলে, চুরি করে, ঘুষ খায়, অপরের ক্ষতি করে - এতে কল্যাণ কোথায়? একজন বললেন মানুষ ঈশ্বরমুখী না হলে কল্যাণ নেই। অপর দল বললেন যা বলেছেন — ভগবান বা ঈশ্বর কিংবা আল্লা অথবা গড্-কে পাবার জন্য মানুষ যদি আকুল না হয় তাহলে কল্যাণ কোথায়? অতএব দেখা যাচ্ছে এক কল্যাণ সম্বন্ধে মতান্তর রয়েছে। বিস্তর আলোচনা শেষে স্থির হ'ল সর্বাধিক মঙ্গল বা কল্যাণ কি? সূতমুনি সারাদিন এক নাগাড়ে বলে গেলেন, থামেননি। অথচ একটি শ্রোতাও কিন্তু আসন ছেড়ে ওঠেননি। কেননো শ্রোতা সময়ের দিকে দৃষ্টি দেননি।

সূতমুনি ভাগবতী কথা আরম্ভ করেছেন। ভাগবতকে তিনি 'পুরাণার্ক' বলেছেন। অর্থাৎ পুরাণ রূপ অর্ক বা সূর্য, আলো। শ্রীকৃষ্ণ তখন অন্তর্ধান করেছেন। জীবকুল অন্ধকারে নিমজ্জিত। ভাগবত পুরাণ রূপ সূর্যই জগতকে পথের সন্ধান দেবে, বাঁচাবে। আলো দেখাবে। এতেই কিন্তু জগতি বেঁচেছিল।

এতক্ষণ যে কথাগুলো ওপরে বলা হ'ল তার সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক কি? নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য আছে। সাহিত্য পাঠ বা আলোচনাই শেষ কথা নয়। জগতের যে নিত্যই সৃষ্টি দিই, সর্বত্র অজ্ঞান, অন্ধকার। এমন সব সাহিত্য 'সাহিত্য পদবাচ্যের যোগ্যকে' সুপারসেটেন্স হয়ে আমাদের কাছে আসছে এবং আমরা নির্বিবাদে গলাধঃকরণ করছি তা কিন্তু তমসাচ্ছন্নের লক্ষণ। তা কল্যাণকর তো নয়ই, বরং বলা যেতে পারে বিষ বা গরল — যা মানব সমাজকে ধীরেধীরে পুড়িয়ে মারছে। একটা বিরাট কিছুর অভাব আমরা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করছি। কিন্তু প্রকাশ করতে পারছি না। আমরা একথা বলিনা করি আর না করি — অন্তর কিন্তু জাতীয় মূর্তিম। বিদ্যের কেন একটা অভাব আমাদের প্রতি নিয়ত খুঁচে খুঁচে খাচ্ছে। শুধু মনুষ্যের কেন, গোটা জগতির ব্যথা ও বেদনার কথা অতি সুন্দরভাবে বলেছেন মিথিলার কবিকুল বিদ্যাপতি —

'কত বিদগ্ধজন রস অনুমনই
অনুভব কাহুক না পেখ-'

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এটা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন 'কত বিদগ্ধ লোকই দেখা যাচ্ছে — যাঁরা অনুমান নিজেই বলেন, কিন্তু সত্যের অনুভূতি কোথাও নেই।' বিদ্যাপতি এর পরই বলেছেন "প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক।" প্রাণ জুড়াবার লোক নেই। অর্থাৎ ব্যাখ্যা করলে দেখা যাচ্ছে যে, সহানুভূতি যেমন নেই তেমনি নেই প্রাণ যা তাদের জুড়াবার কোন ছলে।

ডঃ ব্রহ্মচারী তাঁর ভাষণটিতে একথা বলেছেন যে, প্রাণ জুড়াতে দরকার প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা। ডঃ ব্রহ্মচারীর মতে 'প্রেমহীন মানবসভ্যতা প্রহসন বিশেষ।' আজকের সাহিত্যে এই প্রেম বস্তুটির বড়ই অভাব। সাহিত্যে প্রেম প্রয়োজন। এই প্রেমই হ'ল সাহিত্যের আলো, জীবনের আলো, সংক্ষেপে সাহিত্যের উপজীব্য। মানবজীবনের মন্ত্র রূপই হ'ল সাহিত্য। আজকের এক-শ্রেণীর সাহিত্যকীর্তি কিংবা কাম বা কবিতা জাতির কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। আমরা পশ্চাৎ।

সাহিত্যের মূল লক্ষ্য মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণ এবং প্রেম এই কল্যাণ বোধের জনক। কিন্তু সেরকমটী তো দেখা যাচ্ছে না। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, গতির যুগ। গতির মূলে আমরা speed-কে সফল করেছি অবশ্য আমাদের লক্ষ্য বা direction ঠিক নেই। কারণ জীবনে Morality বা নৈতিকতা নেই। সে কারণে প্রতি পদে দুর্ঘটনা। কল্যাণবোধ নেই অথচ গতি আছে, লক্ষ্য ঠিক নেই অথচ শক্তি আছে — সেটা হ'ল আসুরিক সভ্যতা। ইহাটা যদি কল্যাণমুখী হয় তাহলেই মঙ্গল, নচেৎ নয়। অর্থাৎ সত্য-শিব-সুন্দরের সাথে সম্পর্ক রাখাটাই বড় কথা।

সাহিত্যে কল্যাণ বা আলো কোথায়? সকলের শুভ বা মঙ্গল কিংবা কল্যাণ কামনাই আমাদের কাম্য। কারণ এই বোধটাই আমাদের মধ্যে প্রেম জাগাবে, জাগাবে মনুষ্যত্ব। প্রত্যেক জীবেরই একটা ধর্ম আছে। পশুর আছে পশুত্ব। পশু পশুত্ব নিয়েই জন্মায়। পাখির ধর্ম গান গাওয়া, জলের ধর্ম নিম্নদিকে প্রবাহিত হওয়া, আগুনের ধর্ম দহন করা।

মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। মনুষ্যত্বের অভাবে জীবন মূল্যহীন। মনে রাখা দরকার, যার যে স্বভাব সেটিই তার ধর্ম। ধর্ম বাদ দিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মনুষ্যত্ব অর্জন করাই মনুষ্যের ধর্ম। কারণ "ধর্মেণ হীনা ঃ পশুভি সমানাঃ।"

এখন আসল কথায় আসি। আমাদের সাহিত্যে মনুষ্যত্ববোধের অভাব লক্ষ্য করা যায়। যে সাহিত্য মনুষ্যত্ব বোধের কথা বলে না সে সাহিত্য কেবল বোধহীন নয়, মূল্যহীনও বটে। সাহিত্য জীবন গঠনের মাধ্যম। আজকের সাহিত্যকর্মী তথা সাহিত্য সৃষ্টি কর্তাদের সাহিত্যকর্মে আমরা এর অভাব

দেখছি। একটা বড় মঙ্গলের সঙ্গে, কল্যাণের সঙ্গে যদি সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপিত না হয় তা হলে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সুন্দর পরাহত। সত্য-শিব-সুন্দরের আরাধনাই সাহিত্যে অনিবার্য। কল্যাণ সৎ, চিৎ ও আনন্দই সাহিত্য ও জীবনে আকাঙ্ক্ষিত। সেজন্য দরকার খাদ্য। আমার খাদ্য নেই। আমার জন্য উপযুক্ত খাদ্য দরকার। সৎ ও সুন্দর সাহিত্যই হ'ল আমার খাদ্য। সাহিত্য-রূপ সুন্দর খাদ্য দেবে আনন্দ ও মনুষ্যত্ববোধ এবং মানুষের জন্য ভালবাসা। যে প্রেমহীনতা প্রকট হয়ে উঠেছে তার অবসান দরকার। সাহিত্যকে সর্বজনীন করে তুলতে দরকার আপন মনের রঙ ও রসের সংযোগ ঘটিয়ে সকলের আস্বাদন ও আনন্দের বস্তু করে তোলা। প্রেম নেই, তাই সাহিত্য হয়ে উঠছে গতানুগতিক, বাস্তবতার নামে দেহ-সর্বস্ব। প্রেমের বিকৃত রূপই এখন-সাহিত্যে দেখা যায়। জনজীবনের নৈতিক ও আত্মিক উৎকর্ষসাধনই হওয়া উচিত সাহিত্যের প্রকৃত সংজ্ঞা।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ইটের পর ইট সাজালেই কোনো সৌধ গড়া যায় না। প্রত্যেকটি ইটের সঙ্গে প্রত্যেকটির সুদৃঢ় একত্ব স্থাপনের জন্য যেমন সিমেন্ট বা সংযোজক মশলার প্রয়োজন ঠিক তেমনি মানব হৃদয়ের সঙ্গে মানব হৃদয়ের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সেরকম প্রয়োজন প্রেমের। যা মহানামব্রত ব্রহ্মচারী একটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রজীবন এক কথায় গোটা জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে একটি বৃহৎ সত্য স্বরূপ, সুন্দর স্বরূপের সঙ্গে যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজন এবং এজন্যই প্রয়োজন প্রেম।" প্রয়োজন মানবতাবোধ। সাহিত্যে যদি এই প্রয়োজনটুকুই না থাকে তবে সে সাহিত্য কি মহান উদ্দেশ্য সফল করবে।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য "পতিব্রতা যুথসিতা হলেও আদৃতা। কিন্তু বারাঙ্গনার রূপ-লাবণ্য ঘৃণ্যহে।" কুরুচিপূর্ণ শব্দ বা চিত্র কিংবা বাক্য সাহিত্যকে মলিন করে। আলোচনার ক্যান-ভাসকে আর বিস্তৃততর না করেও একথা বলা যায় যে, কর্মই জীবন। কর্মই ধর্ম। প্রতিটি মানুষের জীবন কর্মময়, বস্তুময়। কর্মকে বাদ দিয়ে জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে না। সাহিত্য সে কারণে মানবজীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। পিতা-মাতার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কী সেটা জানার কোনো অধিকার সন্তানের নেই। আধুনিক সাহিত্যে কিন্তু এই সম্পর্কটি অনৈতিক বস্তুতন্ত্র তুলে ধরা হচ্ছে। এটা আত্মহত্যার পথ, অপসংস্কৃতি তথা ঘৃণ্য ও নীতিবিগর্হিত। মিথ্যা মিথ্যাই। প্রেমই জগতে শাশ্বত। এই প্রেম অর্থাৎ মানুষকে ভালবাসার মধ্য সাহিত্যই স-নিষ্ঠায় তুলে ধরতে পারে।

সাহিত্যকে মানুষের জীবনে উজ্জীবিত হতে হবে। আমাদের সাহিত্য মানুষের জীবনযুদ্ধে মুখর হোক্, সৎসাহিত্যের পবিত্র স্পর্শে আমাদের জীবনে মনুষ্যত্ব লাভ হোক। জাতির নবজন্ম মুর্হিনে প্রেমই কাম্যবস্তু।

(সূত্র - মহানামব্রত ব্রহ্মচারী লিখিত প্রবন্ধ।)

▲▲▲

With Best Compliments From

For long term loan finance in
a) Agriculture
b) Rural housing
c) Non-farm activities etc. &
d) Facilities in Savings deposit.

Please Contract :

Arambagh Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

P.O. : Arambagh
Dist. : Hooghly
Phone : Aram-55-126

With Best Compliments From

United Bank of India Employees' Co-operative Credit Society Limited

4, N.C. Dutta Sarani
Calcutta - 700 001
Phone : 220-0841

Authorised Share Captial Rs. 5,00,00,000/-.
Working Capital Rs. 12,00,00,000/-

Enjoy your Holidays at our
Holiday Home
at
Puri, Varanasi, Rajgir, Ghatshila, Digha, Darjeeling
New Delhi, Hardwar, Calcutta, Deoghar, Gangtok

Sri Asoke Kumar Ghosh
Chairman

Bani Kumar Chattapadhyay
Managing Director

ক্ষুদ্র চাষিদের সেবায় জেলার বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস
কৃষ্ণনগর ● নদীয়া

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা আছে

কৃষিতে লগ্নি	ঃ	১৭৬৮.০০ লক্ষ টাকা
আমানত	ঃ	৪১৭০.২৭ লক্ষ টাকা
সেচের	ঃ	২৫৯.৫০ লক্ষ টাকা
গ্রামীণ শিল্পে লগ্নি	ঃ	৫৮৭.২২ লক্ষ টাকা

নূতন হারে আকর্ষণীয় সুদ, অন্যান্য ব্যাঙ্ক-এর তুলনায় ১/২ শতাংশ বেশি।
সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা আছে।

এন এস সি ও কে ভি পি বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া হয়।

আপনার টাকা ভারত সরকারের আমানত বিমা প্রকল্পের অধীন

With
Best
Compliments
From

The Stewarts Lioyds Indian Tube Employees Co-operative Credit Society Limited

41, Chowringhee Road
Calcutta - 700 071

আপনিও উদ্যোগ নিন
ক্ষুদ্র শিল্প গড়তে এগিয়ে আসুন
নিজেকে ও দেশকে স্বনির্ভর করে তুলুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র শিল্পদপ্তর

আপনার এই প্রচেষ্টায়
সহযোগিতার হাত বাড়াতে প্রস্তুত

বিশদ বিবরণ ও পরামর্শের জন্য
নিজ জেলার শিল্পকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩৬০২/ আই সি এ

গল্প

সাধুচরণের জননী

প্রদীপ ভাদুড়ি

স্বপ্নের পরিষ্কার এখন জল কাপ্তান। তার কাপ্তান আর অধিনস্ত ভালা কাপ্তান। তারা ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্র আকাশে। সাধুচরণ জানে না স্বপ্নের আকাশ কেন এমন সমুদ্র হয়। তারা কাপ্তানির বলে সৃষ্টি যে তারা, সেই তারারা ঝিক্ ঝিক্ করে কাঁপলে সমুদ্র আকাশ আর বিস্ময়বিষ্ট হয় সমুদ্র আকাশ - উদ্ভাস ঢেউ, বজরা। আর তার পরে সূর্যের মত আলোকিত প্রেমাপটে ভেসে থাকে জননীর মুখ।

শহরের পথ বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্নের কথা মনে পড়াতে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে সাধুচরণের মুখে। ইস্কুলের থার্ড পিরিয়ডে পণ্ডিত মশাই বাংলা ব্যাকরণ পড়ান। মাঝে মাঝেই বলেন, বুঝলে সাধুচরণ, এই জগৎ সংসারে জননীর চেয়ে বড় কেউ আর নাই। বল, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী___। শহরের পথ বেয়ে হেঁটে চলে সাধুচরণ। একলা হাঁটে সে। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। তার মধ্যে সযত্নে রাখা খাতা বই পেন। ছোট টিকিন কৌটোর রুটি আর গুড়। হর চর এ পাকা বাড়িগুলো পার হয় সে। কী সুন্দর সব ঘর। জোরে এমন সব ঘরেই সন্ধ্যা খেলা করে। রোজই হাঁটতে হাঁটতে সে থেমে যায়। যা করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ঘরগুলো। কি হর এর বাহার। জানলা দরজার হর বেয়ারের পর্দা। চীনের কি সুন্দর নকশা। মাঝখানে বাগানে নানা রঙ ফুটেছে। বাড়িগুলো সে পার হয়ে যায়। শহর পার হয়ে সে পৌঁছোয় জলাটোরা পথ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জলাটোরা কুথনিং বাড়িগুলোর পাশে। কোথাও খড়, কোথাও টিনের ছাউনি, বেড়ারাজে খুঁটের দাস। রাস্তার পাশে খুঁটিতে বাঁধা গরু, আবর্জনা। অর্ধউলঙ্গ ছেলেমেয়েরা খেলা করে আবর্জনায়। তুলোরের কাটার মতোই, পৃথিবী সোনাকার বটে তবে দুঃখক জলাবতল। শহরতলী পার হয়ে ধান খেতের আলে আলে সে হাঁটে। আল বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে জলাবোনা এসে সে থামে। একটা জলাশয়ের সোজার ঢেউ নিয়ে খেলে সে পানিক, চুপ চাপ বসে থাকে। তাকায় নিথর জলের দিকে। পুকুরে। মাঝে মাঝে দেশ জলপোকা নিথর জলে উর্মিমালা সৃষ্টি করে। আলটপকা যেন ঢেউ মাছ ঘাই দেয়। ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউ দুলতে দুলতে বড় হয়। ঢেউ আরো বড় হয় তারপর পাড়ে গিয়ে ধাক্কা মারে। তারপর আবার এক সময় নিথর হয় জল। ঢেউ দেখতে মজা পায় সাধুচরণ। একটা ঢিল তুলে নিয়ে পুকুরের ঠিক মাঝখানে ছোঁড়ে। জল চমকে ওঠে, ঢেউ সৃষ্টি হয়। কাঁপতে কাঁপতে ঢেউ ছোটে পাড়ের দিকে। আবার একটা ঢিল ছোঁড়ে। আবার একটা। সমস্ত পুকুর জুড়ে সে ঢেউ সৃষ্টি করে। উদ্ভাস ঢেউয়েরা পরস্পরের দিকে ধাবিত হয়। উদ্ভাস হয়ে ওঠে জল। সাধুচরণ উদ্ভাস খেলায় মেতে থাকে যতক্ষণ ধরে, ততক্ষণ না সে ক্লান্ত হয়।

এরপর কাপড়ের ব্যাগ খুলে টিকিন কৌটো খুলে জননীর দেওয়া রুটি আর গুড় খায়।

তালবোনা পার হয়ে নীচু ধান খেত। সেই ধান খেত পার হয়ে ইস্টিশান বাজারের লাল ইটেরবন। ছাটকরম পার হয়ে সমতলাল চকচকে ইস্পাতের লাইন। লাইন পার হয়ে টেলিগ্রাফের তার, পার হয়ে সিমেন্ট। নতুন কাপড় পটিকলের দোকান পার হয়ে জগন্নাথ সাইকেল রিপেয়ারিং এর দোকান, তারপর সাধুচরণের বাবা-বাপ পালকা হীরুর চায়ের দোকান। তারপর পানিক ন্যাড়া সিমেন্ট পার হয়ে খোপড়ি। প্রথম খোপড়ি কুলুমহলির। সেটা পার হয়ে___।

বাবলার ডাটার বেঞ্চিতে বিজেন বসলে, কল দেবি, গুয়ের প্রতিনিধি?

দশ কলসে, আর

বেশ বেশ, আর কি প্রতিনিধি আছে যে বলতে পারবি?

ওঠে সাধুচরণ, বলব স্যার?

আ। তুই। বল দেখি।

আবাস, স্যার?

বাহ। বেশ। তা বাবা, তোর আবাসটি কোথায়?

ইস্টিশানের কাছে স্যার।

ওখানে আবার ঘর কোথা। রেলের লোকেদের কোয়ার্টার।

পেছন থেকে নিতাই বলে ওঠে, ওর আবার আছি কি স্যার। ওর মা তো বেশ্যা।

আই, চুপ চুপ।

রুটি আর গুড় খেয়ে পুকুরের জলে হাত মুখ আর টিফিন কৌটো ধুয়ে আলপথে হাঁটা শুরু করে। এ সময় জননী নিদ্রা যান আনে সাধুচরণ। টান দুই নিলে চোখের পাতা ভারী হয়। চোখের কালি দূর হয়, শরীরে পানিক টিকন ফিরে আসে। জননীর মুখে হাসি ফোটে। দোরগোড়ায় উবু হয়ে বসে থাকে গালে হাত দিয়ে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে। সাধুচরণ এলে বুকে নেয়, আবার হাত বোলায়, চুমু খায়। জামা খুলে হাত পা ধুয়ে দেয় গামছা দিয়ে। দেয় দোয়ালার ঘর থেকে টাটকা দোয়া দুধ নিয়ে আসে। থাল দিয়ে সেই দুধ আর মুড়ি সামনে বসিয়ে খাওয়ায়। খাবার হাত বোলায় গায়ে পিঠে, আদর করে, কি মিষ্টি করে চেয়ে থাকে তার দিকে জননী। তখনই মনে পড়ে পণ্ডিত মশাইয়ের কথা - জননী জন্মভূমিশ্চ ___। তাই এ সময়ে মাকে জাগাতে চায় না সে। ইস্টিশানের প্লাটফরমে সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে আঁক কষে সময় কাটায়। ইস্টিশান একদম একলায় তখনও।

সেই সাঝে পাঁটটার একটা আউটার পাসেঞ্জার। এক আধটা মালগাড়ি এ সময়ে কখনও যায়। গভীর কৌতূহলে মালগাড়ির ওয়াগন গোনে। আর গার্ডসাহেবের কামরার দিকে তাকিয়ে কতটা উদাস হয়ে যায়। কতদূর যায় ও গাড়ি। পাহাড় পর্বত নদী উপত্যকা, বড় বড় শহর আর জঙ্গল ছাড়িয়ে, সমতল অসমতল ভূখণ্ড পার হয়ে এ গাড়ি ছোটে। কখনও অন্ধকারে লাল সিগন্যালে দাঁড়িয়ে পড়ে পাথরের গায়ে বেসামাল ছোটনদী ঝিরঝির করে বয়ে চলে। অন্ধকারে জোনাকি জ্বলে আসপাশে। গার্ডসাহেব ট্রেনিং ধরে দাঁড়িয়ে, সাদা

জায় সাদা প্যান্ট মাথার টুপি হাতে সমুজ লাল। ঘড়ি চলেছে রীতের উপর দিয়ে কম্ কম্ কিলিং কিলিং, কম্ কম্ কিলিং কিলিং। গার্ডবাবু তার কামরায় একলা। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশ পানে। সমুচরণ ভাবে কেনদিন কি সে গার্ডবাবুর মত হতে পারবে।

সময় কাটিয়ে সে ওঠে। মা এখন বসে আছে সোয়েটোরার উন্ হচ্ছে। ছাটকরার পর হতে সে বিলপাড় ধরে হাঁটে। পাগলা হীরুর দোকানে মুজন রেল পুলিশ বসে আছে। একজনকে দেখে রাগে আর ক্ষোভে ছেলেটার শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। লোকটা প্রায়ই রাতের বেলা মদ খেয়ে ওর মায়ের ঘরে ঢোকে। লোকটা মাকে মারে। হীরু পাগলা, ওর বাবাকে কাচের গেলাসে চাপা দিয়ে নাচায়। এসবএকবাপ চা আর বিস্কুট বাবাকে ওকে দেয় বিনে পয়সায়। ওকে দেখে ডাকল, কিরে ছাটা আয়। চা খাবি না। রেল পুলিশকে দেখে ওর ছেলেটা ভেতো হয়ে গেছে। মাথা নেড়ে না বলে সোজা মুখে হাঁটতে শুরু করে। একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে পুলিশটা ওর দিকে তাকিয়ে। সে হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগে।

ঠিক মা বসে আছে সোয়েটোরার গলায় হাত দিয়ে। ওকে দেখে হাসি ফোটে চিকন মুখে। উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করে, টিফিনটা খেয়েছিলি বাপ, কাঁসের বাসনটা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে ঢোলা জলে হাত মুখ ধোয়। ঘরে ঢুকে হাত পা মুছে টৌকির ওপর বসতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। এই টৌকিতে তার কলতে ইচ্ছে করে না আরো ছোট যখন ছিল সে, রাত হত কাঁসত রাতের বেলা মায়ের কাছে শোবার জন্যে। চিৎকার করত বায়না ধরত। মায়ের অসুবিধা হত। মা তখন পিঠে কিল দিয়ে ছোট ঘরটিতে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিত। তারপর রাতের শেষ অন্ধের চলে গেলে তার কাছে এসে শুতো। চোখ দিয়ে জল গড়াতো মায়ের আর ওকে বুকে টেনে নিয়ে ঘেপে ধরত।

এখন সে বড় হয়েছে। কেলাস কাইতে পড়ে। বোঝা হেকে কি হয় তার অসাধ সে করতে পারে। মায়ের পেশা নিয়ে ওর মনে ঘৃণা আর ঘৃণা জাগে। রাগ হয়। বিরক্তিতে নিজেকে অসহায় মনে হয়, যখন ইস্কুলের ছেলেরা ওর পিছনে লাগে। ওরে কেপায় ছেলে কেবল ওরে কেন ইস্কুলে চাকরি হয়ে গিয়েছে। তোর বাপ কোনদিনের সাধুচরণ। প্রথম প্রথম মারামারি লেগে যেত। ছেলে মাস্টারের কাছে নালিশ জানাত। সেবতরা মত মানুষ ছেলে মাস্টার। মনে পড়ে মেদিন ওর মা ওকে সঙ্গে নিয়ে ছেলে মাস্টারের পায়ে গড় করল। ইন্টিসনের প্রাইমারী ইস্কুলে পাস হয়ে বড় স্কুলে ভর্তি হতে গেছিল। সেদিন কেপায় ছেলে বলে, ছেলে মাস্টারকে বলবে। সেবতরা মত মানুষ। ছেলে ভর্তি করে নেবে। সেই তখন মা সঙ্গে নিয়ে নিয়ে গড় করলে। কেঁদে মা বলল, পেটের দায়ে বাবাপ ছেলে মানুষ হয়েছে। আমার ছেলেকে মানুষ করে দিন, বাবা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন মায়ের দিকে। অস্ফুট বললেন, জ্বালা সন্তান। বেল, পরিয়ে দিও কলকে।

জননী কেঁদে বললে, কেপায় ছেলে বলে কেউ দেখা করবে না তো বাবা, আমার ছেলেকে?

গম্ভীরভাবে হেডমাস্টার বললেন, মানুষের মধ্যে ইশ্বর বিশেষ থাকে। ও নিয়ে ভেবো না। ওসব আমার দায়।

মা রেল্ গোয়ালার ঘর থেকে দুধ নে এসে ঘাল মেশ কাঠ জ্বালিয়ে। গরম দুধ আর মুড়ি খাবে এখন সাধুচরণ। দাওয়ায় উনুনে দুঁ দিতে দিতে জননী বললে, বাপ, এখানে আমরা আর থাকবো না।

চমকিত হয় সে মায়ের কথা শুনে। উঠে এসে মায়ের পাশে উবু হয়ে বসে বলে, কোথায় থাকবে তাহলে?

তোর ইস্কুলের কাছে একটা ঘর নে থাকবো। সস্তায় ঘর খুঁজতে হবে। এ পাপের কাজ আর করবো না। তুই বড় হয়িসে বাপ। লোক সমাজে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারনি না।

মায়ের পিঠের উপর উঠে জড়িয়ে ধরে গলা। খুব আনন্দ হচ্ছে তার। এমন একটা সুখের কথা, আনন্দের কথা। ওই গা ঘিনঘিনে নোংরা লোকগুলো, ওই রেল পুলিশটা, টাইনের ওতাদী মায়ের ঘরে বসে মদ গিলবে, নোংরা কথা বলবে, মায়ের শাড়ি ধরে টানবে - এর থেকে যে মুক্তি পাবে সমুচরণ, এই আনন্দে আত্মহারা সে। বলে, ইস্কুলের কাছে তো কোয়ার্টার্স। ওরা কি আমাদের থাকতে দেবে।

মা হাসি মুখে বলে, সে তুই ভাবিস না বাপ। ঘর একটা খুঁজে বার করব ঠিকই। তোর বাবাপ একটা কাজের সন্ধান করে দেবে। দিন টাকা রোজ। আটকটা ডিউটি। এ পাড়া না ছাড়লে অন্তওপক্ষে তো রাতভর ঘুমোবে, তাহলে দিনে কাজ করবো কেমনে? তোর বাবাপ বলেছে কাল সে' যাবে টাউনে। ঘর একটা খুঁজে বার করতে হবে। সেদিন ঘর একটা ঠিক পাবেই।

খুব খুড়ি খেয়ে বেরিয়ে পড়ে সাধুচরণ। হাঁটতে হাঁটতে নিলকাল কেদিন পার হয়ে বড় কালভার্টের ওপর গিয়ে বসে চুপ করে। তাকায় চারদিকে। দূরে রাস্তা দিয়ে ট্রাক যায়, সোঁ সোঁ শব্দ ওঠে। অনেক দূরে আকাশ যেখানে প্রান্তসীমায় মিশেছে, সেখানে গাছগাছালির ঘুসর অসমতল সীমারেখা। কালভার্টের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সে। দৃষ্টি নিবদ্ধ তার পরুর বেলার নীল আকাশের পানে। অনেক ওপরে পাখুন উড়ছে পাক খেয়ে খেয়ে, ছোট মাছির মত লাগে এখান থেকে দেখতে। নিস্তুপ আকাশ পায় বিধির জলের মত এখন। অনেক দূরে কোন গাঁয়ে মনসা পুজোয় ঢাক বাজছে। বাজনা অনুরনিত হয়ে আকাশ বেয়ে বেয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

২

শহরের উত্তর প্রান্তে বল বাজো ঘর মাটির ঘরের বস্তি। কোনটা খড় ছাওয়া, কোনটা টালি ছাওয়া। বাকি সমস্ত কোঠাঘর। মধ্যবিত্ত মানুষের বাস। পাগলা হীরু, সাধুচরণের বাবাবাপ একটা টুলি রিকসো করে সব পৌঁছিয়ে ওছিয়ে দিয়ে যায়। পই পই করে সমুচরণ জননীকে সাবধান করে, ভদ্দরলোকের পাড়া, কাউকে বোলনি কোথা ছিলে। জানলে থাকতে দেবে না ভদ্দরলোকেরা এখানে, বুঝলে বিনু?

এতদিন পরে এই প্রথম সাধুচরণ দেখলে তার জননী খুশি ছেলে দরজায় দোড়ায় দাঁড়ালে না আসবেরে দেখে। ঘরের টৌকিতে লম্বা হয়ে শুয়ে, তার বইগুলো একটু পড় দেখি, খানিক শুনি। কত কথা লেখা থাকে, জান কাড়ে। কত কি জানতে পারে মানুষে।

প্রতিবেশী এক আসবাস আসে দৌড় পরা

নিয়ে। সমুচরণের মনে হয় পড়ে গোলাপে হয় না। তাতলাল মনে প্রতিবেশীরা। সমুর বাপের কথা জিজ্ঞেস করে। নিজেকে স্বামী পরিত্যক্তা বলে পরিচয় দেয় সমুচরণের জননী।

পরদিন সকাল আটটায় রান্না শেষ করে, সমুর খাবার গুছিয়ে রেখে মুড়ুটো ভাত খেয়ে বেরোবার সময় জননী বলে, হ্যাঁ বাপ, তুই খেয়ে নিতে পারবি তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওসব নিয়ে তুমি ভেবোনিতো। কখন ফিরবে তুমি?

জননী বলে, আমার ফিরতে সেই চারটে পরে। এসে মুড়ি খেয়ে নিস বাপ। টিফিন কৌটো নিতে ভুলিসনে। ঘরে চাবি লাগাবে ঠিক করে। ভুলো না বাপ, চাবিটা বন্ধ করে রেখো। হারায় ফেলো না বাপ, কেমন?

জননী চলে যেতে ঠিক ঠাক সব সেরে চাবি পকেটে সমুচরণ ইস্কুলে যায়। বিকেলে ফিরে এসে মুড়ির বাটি নিয়ে মায়ের জন্যে অপেক্ষা করে। সারা দিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত হলেও মায়ের মন আনন্দে পরিপূর্ণ। কারখানার গল্প, তার কাজের গল্প করে।

বাটনি কি রকম? কতজনের সঙ্গে আনাগোনা হয়েছে। বালুরা কাজের তারিফ করলে তার। রান্না করতে করতে জননী গল্প বলে আর কোলের কাছে বসে শোনে সমুচরণ। পতিত্যাগীর জীবন যে কী ভয়াবহ, কী ভোগান্ত তা বুঝতেই শেখে। এই জীবনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে যাবার জন্যে অবিরত নতুন জীবনের স্বপ্নদের কাহিনী বল্ বল্ শোনায় জননী তার পুত্রকে।

সাতদিন পার হয়ে গেল নতুন ঘর পুর আর জননীর। উনুনের ধারে জননী মুড়ি ভেজে রান্না করে। সমুচরণ ঐ আলোতে বসে পাঠ্য ইতিহাস পড়ছে। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস। মিশর সভ্যতা। ব্যাবলনীয়, সুমেরীয় সভ্যতার ইতিহাস।

আদিম জীবন থেকে কেমন করে মানুষ সভ্য হল। সেই রূপান্তরের ইতিহাস জননী মন দিয়ে শোনে। উলঙ্গ মানুষ ছিল পশুর সমপর্যায়ের। মুড়ি হাত আর মুড়িকে কাজে লাগিয়ে ক্রমাগত সভ্যতার সোপান বেয়ে উঠে এসেছে সে। ছোকোশিভিলেশন। আজ সভ্যতার চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছেছে। পুর পড়ছে, মা শুনছে। বিস্ময়ে তার ভরে আসছিলছে মনের পথে পা বাড়িয়েছে মানুষ। এই পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য সে জেনেছে। মাকে এই সব কাহিনী শোনায়। আদিম প্রবৃত্তি আর শেষ। সে শোনে সভ্যতার উত্তরণের কাহিনী সন্তানের মুখে। জেনেও সব, কিন্তু খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার সাধু এতো জানে। পতিত্যাগী মুখপুড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে জননী তার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নের বীজ বোনে। সেই বীজ থেকে উৎপন্ন হয় চারা। তার মনের বাগান ভালপালা আর সবুজে পরিপূর্ণ হতে থাকে। মনের বাগান পূর্ণ হয়ে উপচে ওঠে সবুজ আর সবুজ। অরণ্যময় হয়ে ওঠে। পুষ্প শোভিত হয়ে ওঠে সে বাগান। ফলভারে নত হয় বৃক্ষ। পাখির কলকূজনে এক মুক সুখ ভেসে বেড়ায় তার মনের বাগানে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। জননী সমুকে বলে, শ্যাখ তো বাপ। কে এল। এখন সময়ে কখনো আবার কে এল? ভয় করে ওঠে মুকটা। ছেলেকে বলে, বল্ তুই। আমি দেখবি। মুড়ি হাতে নিয়ে দরজা খোলে। রেল পুলিশকে দেখে আঁতকে হৃৎপিণ্ড হয়ে যায়।

ফিরে যায়। আঁতকে উঠেছি দেখে। দরজায় টৌকাঠ হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। ভয় করে মনের গন্ধ এসে নাকে লাগে। মুড়ির কাঁপা কাঁপা আলো লোকটার চোখে মুখে পড়ে। একটা শয়তানের মত দেখায়। জননীর চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি হেসে বলে, কিরে খানকী। পালিয়ে এলি। ভদ্দরলোক করবি ছেলেকে।

কি বলবে ভেবে পায় না সে, পেছন ফিরে অন্ধকারে তাকিয়ে ঠাহর করে ছেলেকে। অস্ফুট বলে, তুমি যাও এখান থেকে।

ভ্যাক ভ্যাক করে হাসে ওর দিকে তাকিয়ে। হ্যাঁরে, সতীলক্ষ্মী হচ্ছিস। অ্যাঁ। ভদ্দরলোকের পাড়ায় বাস নিয়েছিস। জননী বলে, আমি ওসব কাজ ছেড়ে দিয়েছি। তুমি এসো।

হেসে রেল পুলিশ বলে, আদিনের জানাশোনা। মোর থেকে ভাড়াবি? সোটা কি তোর ভালো হবে। একটু কথা যে। দুটো কথা বলি। ভেতর ভদ্দরলোক ছেলে দেখা।

জননী রাগতস্বরে বলে, ছেলেকে তোমার কি দরকার? বলবার তো, আমি ওসব কাজটাজ করি না, তুমি এসো।

পাড়ার লোকেরা তোর পরিচয় জানেতো? বিয়ে করা? ইস্টিশানের দাসী বেশ্যা তুই, সে খবর জানেতো পাড়ার লোকে? নষ্টামি ঘুচিয়ে দোব?

চমকে ওঠে জননী। এদিক ওদিক তাকায়। পাশের ঘরের জানলার ঘুরঘুট সরে যেতে দেখে। বুকটা কেঁপে ওঠে ভয়ে। অভ্যাসবশে রান্না করে যায়। রেল পুলিশ ঘরে ঢোকে। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে জননী । ঘরের এক কোণে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে সমুচরণ। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে রেলপুলিশ, তোর বুপড়ির চেয়ে ঘরটা ভালো। কে জোগাড় করে দিলে? ইস্ পাগলা? শালা ধান্ধাবাজ। ওটাকে আর বেশ্যাবৃত্তি।

জননী আর্তস্বরে বলে, ওকে মারলে কেন? ওর কি দোষ।

দরিদ্র পালন করছে। ধান্ধাবাজের দরিদ্র। শালা। খানকীর বাচ্চার আমার কত জনের কথা। সকলেরই তো ভালোভাবে বাঁচার অধিকার আছে। অধিকার নিয়ে খুব। আমার কুড়ির কি হবে, অ্যাঁ। শোন খানকী। এসব গুছিয়ে পটিয়ে কালই বিদায় বুপড়িতে। কানে গেল কথা?

টৌকির ওপর বসে আয়েস করে রেল পুলিশ পকেট থেকে বার করে মদের বোতল। সমুচরণের দিকে তাকায়। বলে, তোর ভদ্দরলোক ছেলেকে বল ক'টা চপ নিয়ে আসুক মোড়ের দোকান থেকে। নেশাটা জমছে না। পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে এগিয়ে ধরে। সমুচরণ এই একটায় দাঁড়িয়ে দেখছে রেল পুলিশকে। তার চোখে প্রতারণা।

রেল পুলিশ বলে, কি হলো, ধর টাকা। কি মনে হতে পকেট থেকে মুড়ি টাকার নোট বার করে একটা। বলে, রাতে থাকবো। খাওয়ার ব্যবস্থা কর। কানে গেল কথা?

মরার মতো জননী বলে, এখানে তোমার খাবার হবে না।

কেনরে। এখানে তোর ভদ্দরলোক সোয়ামী যোগাড় হয়েছে মাগিরে? অ্যাঁ? ভোরবেলায় কবরি সাতো পেটের জোগাড় হবে কি করে শুনি? যে, টাকাটা ধর।

জননী ভয় করে বলে, তুমি ওর কথা শুনো না। ওর কথা শুনো না।

ও। তাই। উঠে দাঁড়ায় রেল পুলিশ। এগিয়ে যায় জননীর দিকে। দাঁড়ায় সামনে। বলে, তাহলে তুমি আমাকে থামতে দিবি না?

বললাম তো না। কেন জ্বালাও আমাকে?

ওরে হারামজাদী, একজন আসার কথা, আর এখন আসবেই —। সপাটে চড় মারায়। উঃ মাগো। ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে জননী। কথা বলে না।

তুলির ভাঁপা আলোয় নিথর দেখায় তাকে। কেঁদে উঠে মাদুরের ওপর পড়ে সাবু। ভাই ধরে ঝাঁকানি দেয়। মা মরে না। উঠে দাঁড়ায় সে। প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের ওপর। আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে তাকে।

পড়শীরা ছুটে আসে। দুজনকে ধরে আলাদা করে দেয়। জননীর মুখে জল ছিটিয়ে দিতে জ্ঞান ফিরে আসে, সে তাকিয়ে দেখে তার চারি দোকদার। ছেলে হাঁপাচ্ছে দরজার কাছে বসে। উঠে বসে জবা জননী। পড়শীরা কেউ বলে ,ডাক্তারের পড়ার এসব বেলেল্লাপনা শুরু হলো। ঝড়িওয়ালা আসুক। একটা বিহিত হোক আজকে। এ সব বেল্লা পনে নিয়ে ঘর করা আছে না।

একজন বলে, যাদু, মিয়ে কথা বলে আর নিলে? বেল্লাপাড়ার মেয়েমানুষকে আমরা থাকতে দিতে পারি না। এতে আমাদের ঘর নষ্ট হবে। ঝড়িওয়ালাকে আজই বিহিত করতে হবে। আধা নীচু করে বসে থাকে জননী। পড়শীদের একজন রেল পুলিশের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি কে বলাই? এর আগে আর কি?

রেল পুলিশ ভালো মানুষের মত বলে, আমরা বাঁধা মেয়েমানুষ বলাই। আমার টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। আমি পুলিশের লোক।

এঁা। পুলিশ। এতো সোনায় সোহাগা। এই মা হলে আমাদের দেশের আদর্শ পুলিশ। তা বলাই, আপনার বাঁধা মেয়েমানুষকে নিয়ে যা খুশি করুন। কিন্তু এই ঘর পাড়ার মধ্যে ফেলেছড়ি করবেন না। নোংরামি আমরা বরদাস্ত করবো না এখানে।

ঝড়িওয়ালা সবই বিবরণ শুনেছে। ঘরে ঢুকে ছেলেকে হাত ধরে বলে, এই ছেলেছেলে। কাল এখন ছেড়ে দেবে। এটা খেলা পাড়া নয়। ভদ্রলোকের পাড়া। কথাটা মনে থাকে যেন। ঝড়িওয়ালার পিছনে পিছনে পড়শীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় টিকলারী নিতে নিতে।

ঘর ঠাণ্ডা। তুলির ভাঁপা ভাঁপা আলোয় ঘুম আর জননী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। মায়ের মুখোশ খেয়ে জলের ধারা। ভাপসা হয়ে ওঠে পুরো মুখ।

রেল পুলিশের নেশা কেটে গিয়েছিল। সে উঠে দাঁড়ায়। মাথা বোতল পকেটে গোঁজে। দরজা দিয়ে বাইরে তাকায়।

ছেলে পড়শীরা বাইরে দাঁড়িয়ে। জননীর দিকে আঙুল তুলে বলে, আই জবী, কালকের মধ্যে আমার ভাড়ার টাকা মেটাও চাই। নয়তো কাল মুখপুড়িতে দিয়ে আসি। এই বলে দেখায়। বেড়িয়ে যায় ঘর থেকে।

এখন সব শান্ত। দুজনে চুপচাপ বসে থাকে। তুলির আলোর বিবর্ণতা সারা ঘরে খেলা করে। সাবুকলন জিজ্ঞেস করে, কি হবে মা?

জননী কোন জবাব দেয় না। ছেলে আবার জিজ্ঞেস করে, কি করবে মা? ইস্টিশানে আবার ফিরে যাবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জননী বলে, তাই যেতে হবে বাবা। কপালের লেখন কেউ খণ্ডাতে পারে বাবা।

" সারা রাত আবছুমে কাটিয়ে ভোরের দিকে ঘুম এসেছিল জননীর। ভোরের আলো জানলা দিয়ে ঢুকতে ধড়পড় করে উঠে বসে। বিছানায় সাবুকলন নেই। দরজা ভেজানো. খেলা গেল ছেলে? বাইরে এসে চারদিকে তাকায়। খেলা গেল সে? ও সাবু! বাপ। কোথা গেলি বাপ? কোথায় গেল ছেলে এতভোরে কিছু না বলে?

পাশের বাড়ির বৌটি জবাবা বাটি নিয়ে। তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। ছেলেকে খুঁজছো?

হাঁ গো, কোথা গেল ছেলে সকাল বেলা না বলে কয়ে। দেখেছো নাকি?

সে তো অনেকক্ষণ আগে, সেই ভোর রাতে ছুটে গেল কোথায়।

বলতে বলতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে চোখ পড়ে হীরু পাগলা ট্রলি রিকশো চালিয়ে আসছে। আর তাকে বসে সাবুকলন। কাছে এসে রিকশো থেকে লাফিয়ে পড়ে সাবুকলন। জননীর কাছে এগিয়ে আসে। বলে, সব তাড়িয়ে নাও, আমরা যাবো।

কোথা যাবি? ইস্টিশানে?

না মা। ইস্টিশানে আর ফিরবো না। হেডমাস্টারের কাছে গিয়েছিলাম ভোরে। সব বললাম। জিজ্ঞেস করলাম, ঐ মেয়েরা কার কথা কি মায়ের কপালের লেখন? হেডমাস্টার কি বললে জানো, মূর্খ বোকা, মানুষ কপাল নিয়ে জন্মায় না তাকে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এগিয়ে চলাই মানুষের ধর্ম আর এগিয়ে চলার জন্যে লড়াই করতে হয়। কপাল নয়। বুদ্ধি আর শক্তি। থামে সাবুকলন। কথাটা তাড়িয়ে বলার জন্যে ধর্মিত হয়।

জননী জিজ্ঞেস করে, তোর বন্ধুবাপকে সে এলি কেন?

সাবুকলন বলে, হেডমাস্টার বলেছে একটু করে সরকারী জমির ব্যবস্থা করে দেবো বলে করে। নিজে ঘর বানিয়ে থাকবি। জমিন না হয়, ইস্কুলের সুইপারের ঘরটা খালি আছে, ওখানে থাক। রাত ফিরতে কেউ জ্বালাতে এলে আমরা খবর দিবি। নাও, এখন গোছও দেখি সব। হীরুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, বন্ধুবাপ কি বলছে শোন।

পাগলা হীরু দিকে তাকায় জননী। ইতস্তত করে বলে, আমার তো কোন পিছুটান নাই। সাবুর বাপ হওয়ার দায়িত্বটা যদি আমাকে দাও? গোছপ ফুলে সে আসবো।

হীরুর দিকে তাকিয়ে জননী। সাবু বলে, মায়ের পান থেকে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে আসবে বন্ধুবাপ। আর কেউ তোমায় কোন্তি করতে পারবে না। তুমি রাজি হও মা।

মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখ বেয়ে নামে যে অশ্রু, তার মানেই আলাদা। ▲▲▲

" God did not create men with the badge of superiority or inferiority. It is a denial of God and Truth which is God. "

— *Mahatma Gandhi*

পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন শক্তির উৎস

● এবারে চৈত্র ও বৈশাখের দারুণ গরমে পশ্চিমবঙ্গ এক উত্তেজনার নির্দশন সৃষ্টি করেছে।

● বিদ্যুৎ সরবরাহে রেকর্ড করেছে। ছাই লোড ফ্যাক্টর (পি এল এফ) বেড়েছে। এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ যোগান সম্ভব হয়েছে।

● এই সাফল্যে পশ্চিমবঙ্গে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন প্রত্যাশিত হয়েছে নিম্নোক্তগুলি। নিয়মিত নির্গমনের ছাউনিগুলি পূর্ণ শক্তিতে উৎপাদন করছে এবং ক্ষমতাও বেড়েছে। কৃষির উন্নতির জন্য উন্নতমানের সেচও সম্ভব হয়েছে। এই সুযোগে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে নতুন ভবিষ্যতের রূপরেখা রচনা করছে।

● লোডশেডিং অতি কম সময়ের হওয়ায় জনসাধারণের কষ্ট লাঘব হয়েছে। গত ২৪শে মার্চ '৯৪ পর্যন্ত চাহিদা ছিল ২২৩১ মেগাওয়াট যা মেটাতে সক্ষম হওয়ার রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

● এই সার্বিক প্রচেষ্টা কোনও আন্তর্জাতিক ঋণের নয়।

● রাজ্যের সরকারের আমলাদের সকল বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিশ্চিত করেছে বিদ্যুতের সর্বাপেক্ষা অনুকূল উৎপাদন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান ছাউনিগুলির আধুনিকীকরণে ও রক্ষণাবেক্ষণে নতুন ছাউনিগুলির সর্বোচ্চ উৎপাদনে এবং নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহে এই সফলতা প্রাপ্ত হয়েছে। তাই তাই দূর মফস্বলের গ্রামেও বিদ্যুতের ছোঁয়ার অবকাশ দূর হয়েছে।

● রাজ্যের সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টায় আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন শক্তির উৎস হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ/৩৬০২

With Best Compliments From

A Pioneer in River Transport

Hooghly Nadi Jalapath Paribahan Samabay Samity Ltd.

4/5, Rishi Bankim Chandra Road
Howrah Station
Howrah - 711 101

A successful Co-operative venture in river transport catering to the need of 1 lakh commuters a day

A successful alternative to road transport in Calcutta Metropolitan District and suburb introduced in 1980

Achievement :
Viability & Employment opportunity in public utility service.

Ferry Station :

● Kutighat ● Howrah Station ● Botanical Garden ● Gadiara
● Ratanbabu Ghat ● Armenian ● Metiabruz ● Geokhali
● Cossipur ● Fairlie ● Nazirgunj ● Nurpoor ● Bagbazar
● Chandpal ● Bouria ● Sovabazar ● Garden Reach ● Budge Budge

Special Service During Sagar Mela in January
From Howrah to Sagar Island

Holiday Homes on Moderate Charges
at **Darjeeling & Puri**

গল্প

নদী বয়ে যায়

জীবন সরকার

বাড়ির নামার বিশাল চক। পাটকাটা ঘরে ঢেলে সমুদ্রের মত ঢেউ। পাল উড়িয়ে দিলেই হয়। তরতর করে পুবাল বাতাসে উড়ে যাবে নাও। আর কেলিকটা একটু টান দেখানে বানক্ষেত। বানক্ষেতেও বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দ। একটু দূরে ইছামতি খাল। কেন যে ইছামতি নাম রাখা হয়েছে, পরান তা জানে না। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে। ইছামতি খাল বলেশ্বরী গাঙ থেকে নেমে পরান পড়েছে। গাঙের মোহনায় কেলাল পেতেছে পরান। গাঙ থেকে মাছ ধরার এই সময়।

বাঁশ দিয়ে বাঁধ করানোর মিস্ত্রিদের মতো বিরাট জাল। একটা বাঁশের সঙ্গে মাছ ধরার বাঁচা অন্যদিকে নাও বাঁধা। নাও এর মধ্যে ছোট্ট ছই। ছই এর মধ্যে দুই সেরহালী, কাঁথা-তেল চিটচিটে বালিশ, আতলের পাতিল। হুকা, কল্কি, তোলা উনুন। চাল ডাল তেল মরিচ লবণ সব কিছুই রাখা হয়েছে।

কেলেরা রাতদিন এইখানেই থাকতে হয়। ঘর ছেড়ে ছেলেপেলে ছেড়ে মাছ ধরার নেশায় চলে এসেছে। নৌকার পাটাতনের নীচে রান্নাবান্না, শয়নও রাখা আছে। কখন যে কি হয়, কে জানে। সাবধানের মার নেই।

তিন কোনায় তিনটি বাঁশ সেখানটায় লোহার পেরেক আটার মত লাগানো হয়েছে। আটা দিয়ে আটকানোর ফলে জালের সুতা জলের নীচে চলে যায়। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পরান মাথার আটা খুলে তিনকোনা মাথায় পা রেখে নীচের দিকে নেমে যায় আর জালের সুতা উপর দিকে উঠতে থাকে। জল ঘষতে থাকে মাছ ছট্ ছট্ করে লাফিয়ে ওঠে। দুই একটা মাছ লাফিয়ে পড়ে। জাল ছেড়ে মাছগুলি নৌকার মধ্যে ফেলে, হরিপদ সেগুলি ঝুড়ির মধ্যে বাঁচায় রাখে।

হরিপদ হচ্ছে পরানের সহকারী। ওরা যেখানেই যায় একসাথে যায়।

বাতাস একটু কম। মাছ যেন লাফাচ্ছে না। পরান জালের সুতাটা আটকাতে আটকাতে বলল : এক ছিলুম তামাক ভর। পা-টা পরম হইয়া গেল।

হরিপদ নাও-এর মধ্যে এল। আতলের পাতিলটা নিয়ে হুকা দুটো টেনে কল্কিটা নিয়ে তামুক ভরল। তারপর নিজেই হুকাতে টান দিল। সরসর করে টানছে হরিপদ, সেখানে মাছের বাঁচা ভরতে অনেক দেরী। নিতাই তো একটু পরে আসবেই। ওরাই তো মহাজন। ওরা সব মাল শহরে নিয়ে যায়। এত ছোটও পেটে ভাত দিতে পারে না। কোনরকমে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়।

পরান আবার হাঁক দিল। মিয়ে কতক্ষণ লাগে। শরীলটা তো ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

হরিপদ উঠে জালের মাথায় উঠল। পরান নেমে এল। হুকাটা নিয়ে টানতে লাগল। শরীরটা আর বইছে না। কেমন যেন লাগছে। জ্বর আসবে নাকি। এই সময় জ্বর হলে আর রক্ষা নেই। যড়িঘর মোর সব ভেসে যাবে। গোলাপানের মুখে ভাত দেবে কি করে। কানুর মা গালমন্দ করে কিন্তু রাখবে না। এমনিতেই কানুর মা দেখতে পারে না। সব সময় গালি গালাজ করছে। টাকা উপার করতে পারে না বলে রাতদিন ঝগড়া করছে। একদিনও ভালভাবে কথা বলে না। পরান হরিপদকে বলল। টান দে। আমি ভাইলাম। একটু পরে তুলিস।

— কি কইলি।

— শরীলডা ভাল না। মিরিয়া লই, তুলসি দি।

নাও এর মধ্যে জল লাফাচ্ছে ছলাৎ ছলাৎ। তেল চিটচিটে বালিশটায় মাথাটা রেখে একটু কাৎ হল। ছইয়ের বাইরে সোনা রোদ্দুর। আকাশে সাদা মেঘের পাহাড় সোনার মেঘ হচ্ছে। দূরে ধানক্ষেতের জমি আকাশে যেন মিশিয়ে গেছে। পাটাতনের নীচে মাছগুলি ছট্ফট্ করছে। পরানের চোখ দুটোতেও ঘুম আসছে না। কোথাও চিল উড়ছে। পরানের শরীলডার ঘুরপাক খাচ্ছে। চোখে উপরল জল। এই জল যৌবনে একবার ঘরে যায়।

মেঘের আনাগোনা ছলেও বৃষ্টি হয় না। কানুর মার তাড়ার জ্বালায় চাউনির মধ্যে কিসের সোনার আভা খুঁজতে পারলো না পরান। ওর শরীরে চাকচিক্য পরানের জিহ্বায় লোল গড়ায়।

— পরাইলারে ঘর-বর মাই।

হরিপদ তেলালের জাল ঘরে টেনেছে। তেলালের মাথা আকাশের দিকে। আর হরিপদ জলের কাছে। পরান লাফ দিয়ে উঠল। একটু যে জিরাবে তার জো নেই। জালের কাছে আসলেই যেখন সত্তি বড় মাছ। একবার এদিক একবার ওদিক। বিশাল মাছ, পরান যেই মাছটা ধরতে যাবে তখনি লাফ দিয়ে জলের মধ্যে পড়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে সেই ব্যথাটা আরম্ভ হল। কিসের যে দুঃখ ওমরে ওমরে ওঠে পরান তা নিজেই জানে না। অনেকদিন চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনদিন পারেনি। হরিপদ কিন্তু কখনো বিমল হয় না। বড় বড় মাছ ধরে। আসলে ওর কপাল ভাল। কানুর মা যেন হরিপদকেই পছন্দ করে বেশি। তা অনেকবার লক্ষ করেছে। সেই জন্য পরানের মনে শান্তি নেই। দুঃখে বুক ফেটে যায়।

সেই কথা ভেবেই মাছটা ধরার জন্য সঙ্গে সঙ্গে পরানও ঝাঁপ দিল। জলের মধ্যে জলে পানিয়ে গেল। পরান মাছটিকে ধরতে পারল না। খামকা এই বিকাল বেলা কাপড়টা ভেজাল। অন্য কাপড় নেই। কানুর মাকে একটা পাছাপেড়ে কাপড় কিনে দিতে পারেনি। সেই জন্য পরানের দুঃখ কম নয়। হরিপদ কাদে। জেলার মতন লাফ দিলা কান।

— পরানে বড় মাই আছিল।

— যা যায়, বড়ই যায়। হেইডার লইগা তুমি এই অবেলায় ভিজলা। তুমি যা কইলা শরীলডা ভাল লাই। তোমার কি জীমরতি হইছে। জ্বর হইলে কি করবা। সব তো না খাইয়া থাকলা।

পরান বুঝতে পারল কাজটা ভাল করল না। শরীরটা মনিন থেকেই ভাল যাচ্ছে না। আজ জলে নামা উচিৎ হয়নি। মাছের নেশা বড় নেশা। তখন কি খেয়াল থাকে। উনার মত।

হেঁড়া গামছাটা দিয়ে গা মুছল। শুদ্ধিটা বেশ করে পড়ল। হরিপদ আবার বলল :

মাথাটা ভাল করে মুছো। ঠাণ্ডা লাগবে দুরবারে ঢেলা। গায়ে মাখার একটু তেল মাখত।

পরান তাই করল। আতনের পাশ্চিলে হাত পা ছেড়ল। একটু আরাম করে নিজের মনেই টানতে লাগল।

মাছটা দেখে খুব লোভ হয়েছিল। বড়তে পারলে দেখাতে। পরান অনেকবার দেখেছে যে সময় ভাল লাগে কানুর মাকে সে সময় ধরতে পারে না, পিছলিয়ে যায়। এই মাছটার সময়ও তাই হল। হাত নিয়েছিল কিন্তু রাখতে পারল না। পিছলিয়ে গেল। দুঃখের মধ্যে সেই শুধুটা আরও হল। কিসের যে দুঃখ ওমরে ওমরে ওঠে পরান তা নিজেই জানে না। অনেকদিন জানবার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোন দিন পারেনি।

কানুর মাকে দেখেই বিয়ে করেছিল পরান। তখন পরান জোয়ান মরদ। গায়ে পড়ছে সুঠাম দেহ। মাথায় এক ঝাঁকড়া চুল। নৌকা বাইতে যেতো। বাইতে গিতে ফেরার সময় টিকরা বাজাতো আর গান গাইতো টিকন সুরে — রসিলা মাঝি যইন গাঙে যাও। সেরামের যুবতীরা চুপিচুপি গাছের আড়ালে সেই গান শুনত। পরানের অবস্থা এরকম ছিল না। কিন্তু জমি ছিল। জমিতে যা ফলন হতো তা কোন রকমে বছর চলে যেত, কোন অসুবিধা হত না।

কানুর মা তখন কানুর মা হয়নি। সেরামের সুন্দরী। এই সুন্দরীকে বিয়ে করতে অনেকেই চেয়েছিল — পরানের সাকরেদ হরিপদও চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ মেষ পরানের ভিত হয়েছিল অর্থাৎ সুন্দরীর বাবা পরানকেই পছন্দ করল। সকলেই সুন্দরীকে ভুলে গেলেও হরিপদ ভুলল না। পরানের বাড়ি যেন ওর বাড়ি হয়। পরানের বাড়ি ছাড়ে না। হরিপদ বিয়েও করল না কোনদিন। পরানের সঙ্গেই মিলেমিশে থাকে। পরান যা বলে তাই শোনে। যেখানে মাছ ধরতে যায় হরিপদকেও নিয়ে যায়। কারণ হরিপদর মায়ের অসিখ আছে। তাছাড়া হরিপদ নিজের ভালটা বোঝে না। সুন্দরীর মন পাবার জন্য পরান জমি বিক্রি করতে আরম্ভ করল, কিন্তু তাতেও যেন মন ভরল না। ওর মনে আবার পরানের বদলা হয়ে আরো গভীর করে নিল। এরকম ভালোও মানুষ পড়েনি যেমন। সবেমাত্র নতুন বিয়ে করেছে। একটু যৌতুক না দেখালে বৌ কদরে কি। এত করেও পরান সুন্দরীর মন পায় না। যেন কথা বললেই ঝগড়া করে। ভালবাসার কথা বলে না। নিশ্বাসে ঝালঝালনি ঝগড়া লেগেই থাকে।

এই অশান্তি থেকে জলের মধ্যে থাকা অনেক ভাল। চারপাশে নীলাভ জল। উপরে আকাশ। সাদা মেঘের নাও ভাসছে। কেমন দেখে যাচ্ছে যেন নিমন্ত্রণ খেতে। আর মাছেদের সঙ্গে খেলা। মাছ ধরায় নেশার মত হয়ে থাকে পরান। কি করে মাছ ধরবে, নৌকা ভর্তি মাছ চালান দেবে সহরে, সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে সব সময়। অনেক মাছ পেলে অনেক টাকা। অনেক টাকা হলে নিজে যেতে পারলেই কানুর মা খুশি হবে এই কথা মনে এলেই পরান আর মানুষের মধ্যে থাকে না। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে রাতদিন শুধু মাছ ধরতে চায়। ধরতেও পারে না, তাতেও কোন কষ্ট হয় না। এই জন্য হরিপদকে সঙ্গে নিয়ে আসে। ওর কপাল ভালো। তাছাড়া হলদুতোর এই বাড়িতেই থাকতে চায়। পরানের কাজ করতে পারলেই তো কানুর মার সঙ্গে থাকতে পারবে। পরানও সন্দেহ করবে না, ভাল চোখে দেখবে। পরান কিন্তু বুঝতে পেরেছে তবে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কানুর মার ভালবাসা পায় না। ফলে মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে অথচ হরিপদর সঙ্গে ভালভাবেই কথা বলে। রসরসের কথা বলে, হাসে। হাসতে হাসতে লুটোপুটি খায়।

হরিপদর তো কোন চিন্তা নেই। সংসারে কেউ নেই। একা মানুষ। নিশ্চিন্তেরা বলে কানুর মার জন্যই বিয়ে করেনি। সেই জন্যই কানুর মার বাড়িতে সব সময় পড়ে থাকে, কাই ফরমাস খাটে। টাকা পয়সা যা পায় তা কানুর মার সংসারেই খরচ করে। এই বিয়ে না করার জন্য লোকে কম কথা বলে না। পরান এসব কথায় কান দেয় না। হরিপদকে বিশ্বাস করে। শুধু সাকরেদ বলে নয়, সমবয়সী বলে নয়, আপদে-বিপদে সুখে দুঃখে হরিপদর সঙ্গে মিলেমিশে বড় হয়েছে পরান। সেই সম্পর্ক নষ্ট করতে চায় না। তাছাড়া ওদের বাড়ি সহরেই। ঘরের সঙ্গে যায়। আসলে ওদের এই ঘনিষ্ঠতা অনেকেই পছন্দ করে না, হিংসে করে। অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পরান ইদানিং কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে সুন্দরীর ব্যবহারে। নিজের সঙ্গে অনেক চলাচলি কিসের। পাঁচজনের মানুষ নাকি। ঘৃণা ছড়াতে ছড়াতে হরিপদর দিকে তাকাল পরান। একমনে হরিপদ জলের দিকে তাকিয়ে আছে যেন মনে হচ্ছে সুন্দরীকে দেখছে। সুন্দরীকে এইভাবে তাকিয়ে দেখে। ওর যেন দেখেই সুখ। পরানের কলজায় আগুন খেলে খেলে বেড়ায়। পরান ছড়া আরো জোরে টানতে লাগল। মনে মনে ভাবল দেবে নাকি জলের মধ্যে ফেলে তাহলেই তো লাঠা চুকে যায়। মাছটা কেমন করে চলে গেল — তাহলে তো আর কোন কথাই থাকে না।

হরিপদ তাকাল। উনুন ধরাও। রাইতে খাইতে হইবো না।

পরান কোন কথা না বলে একমনে তাকাক টানতে লাগল। হরিপদ আবার বলল — ধরাটা দাও তো টান দিই।

— ধাড়া। কথা কইলে মাছ আইবো না। ভেসালের দিকে চোখ রাখ। বকর বকর করলে কি মাছ আসে।

জলে মৃদু ঢেউ। টলটলে জল। দুই একটা কচুরি পানা ভেসে যাচ্ছে। জলের নীচে শেওলার ঝোপ। মাছেরা সেই ঝোপের ফাঁক দিয়ে দল বেঁধে চলাচল করে উজান তাঁটা লক্ষ্য রেখে। আসলে বড় নদীতে জল নামছে।

হরিপদ আর কোন কথা বলল না। ভেসালের মাথায় পা রাখল। ভেসাল আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকে আর জালের মাছ ঝরঝর করে লাফায়। দুই একটা মাছ জলে পড়ে যায়। এক ঝাঁক এসেছে। খই কোটার মত মাছগুলি লাফালাফি করে। হরিপদর চোখেমুখে হাসি। পরানকে উদ্দেশ্য করে বলল দেহ দেহ জাল ভইরা গেছে।

— চেঁচাইছ না। তাল বইরা টান দে। মাথাটা তুল।

প্যাটাতনের খোপের মধ্যে পড়তেই মাছগুলি লাফাচ্ছে। এত মাছ দেখে পরানের চোখে মুখে হাসি। আসলে হরিপদর মায়ের অসিখ আছে। মায়েতো হরিপদকে পছন্দ করে। কানুর মা করবে তাতে দোষটা কি। দেখতে তো পেঁচার মতো আসলে গুণে ভরা। পরান আবার হাঁক দিল ঃ ভেসালে তুই থাক। এইবার মাছ আইবে। তামাক টান নিয়া ল।

হরিপদ পরানের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে, কি বলবে। শুধু বলল ঃ নিজরীর পোয়া আজ আইবো না। পরানের মাথা কি চইলা গেল।

আসলে ওরা মাছ নিয়ে যায় সহরে আসার

আসার সময় থাকে। আসার পরনের নৌকা দুধ নিয়ে যায়। একটু আগে পরে। দুধ যে নৌকা নেয় তাকে পরানরা নাও বলে। ওরা দুধ নেয়ে চলে। দিল নৌকা তো নেয়েই চলে।

পরান ঘরোয়ারী গঞ্জের দিকে তাকাল। বিরাট বিরাট নাও-না নেয়ে এর পাল তুলে যাচ্ছে— আসছে। এখন এই পাল নিয়ে মোটর লঞ্চ যায়। সাদা পাল। ঘরোয়ারী তুলিয়া নেওয়ার পালে। পরান হরিপদকে কালও একবার সহরে গেলে কেমন হয় রে। যদি নদি।

— আমগো নাগান মাইনষের গিয়া কি হইবো। এত বড় শহরে কিতা টিনে। টাকা হইলে একখান টালাইল শাড়ি কিনুম কদুর জন্য লাইগা।

হরিপদ আর কোন কথা বলল না। ঢেলাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। পরান একটা ডিঙি নাওর দিকে তাকিয়ে বলল ঃ হাইটের লাইগা ভাত রান্ধছ নাই। কইটা নলম মাছ আই, কি কস।

— না, না, খিচুড়ি কমু।

— তাইলে খিচুড়ি কমইয়া দে।

পরান ডোলা উনুনে পাটাপোলা দিয়ে আগুন ধরিয়ে চালডাল মিশিয়ে বসিয়ে দিল। হাত পা ধুয়ে ইয়েসের মধ্যে বিছানাটা পেতে বালিশটা নিয়ে পাটা ছেড়ে দিল। হরিপদর দিকে তাকিয়ে বলল ঃ এখন আর ডেলাল টানিস না। নইলে আগু, জিয়াইয়া ল। আমি উঠি। তামুক পাইয়া নই।

পরান আর এক চুলুম তামাক টেনে দুই এক টান দিয়ে হরিপদর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। হরিপদ নেমে আসে।

পরান ডেলাতে ওঠে তাকল। অনেকক্ষণ ডেলাতে আছে হরিপদ। হরিপদ পারেও। ক্লান্তি নেই। পরান যা বলে তাই করে। হরিপদর সবকিছুই ভাল। শুধু কদুর মার সঙ্গে কটি মাটি ভাল লাগে না। মেয়ে কদুরের সঙ্গে অত চলাচলি কিসের। পাড়া প্রতিবেশীরা কি বলবো। ভালচোখে নিবে না। পরান কিছু বলতে পারে না। আগের বিগদে সব সময় হরিপদ। সেবারে ঝড়ে যার পড়ে গিয়েছিল হরিপদই যার তৈরি করে দিয়েছিল সেক জল নিয়ে। হরিপদ না থাকলে পোলাপান নিয়ে ভেসে যেতে হতো ঘরোয়ারী গঞ্জে। হরিপদকে নিয়ে অনেক ভেবেছে। এই ভাবনার কোন শেষ নেই। এই ভাবনা থেকে মুক্তি নিচ্ছে। ঘরোয়ারীর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। মেঘ যেন পাথর হয়ে। মেঘের স্বভাব বদলে। মন ভালভাবে চেনা যাচ্ছে না। এই স্বভাবে আচ্ছা চলাচল করে না। একদম যে করে না তা নয় তবে কম।

এই অবিশে পানি দিল যে কমবে। মনে হয় পরীর গঞ্জ। এই পরীর গঞ্জের জল খুঁজে পাওয়া ভার। কদুর মার মন পেল না বেমন। কেমন যেন অতলের মধ্যে পানকৌড়ির মতো দুব সাঁতার খেলে বেড়ায়। ধোঁয়া লাগলেও ধরা যায় না। পিছলিয়ে যায়। সেইখানেই তো সন্দেহ। তবে কি হরিপদ পারে! কে জানে।

পূজা পার্বণে ভালমন্দ কিছু হলেই হরিপদকে নিমন্ত্রণ করবে কদুর মা। কি যত্ন করে খাওয়াবে। হিসেব হয়। ওকে বাদ দিয়ে কদুর মা কিছু করে না। পোলাপানগুলিও তার মায়ের মতো। বাপের কাছে আদর না পেলেও কোন ক্ষতি নেই। হরিপদ আছে। যা চাইবে তাই পাবে। একবার কাউকল চেয়েছিল। হরিপদ পাশের গ্রাম থেকে তাই এনে দিয়েছিল। হরিপদ বলতে অজ্ঞান। একবেলা না দেখলে ওদের মুখে ভাত জোটে না। আর মেয়েমের লোক তো দুদিন বা নয় তাই বলছে। ওনতে ওনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। একবার ইচ্ছে করে ঘাড়ি থেকে পলিয়ে যায় অন্য কোনখানে, যেখানে হরিপদ নেই, কদুর মা নেই। মেয়েমেয়ে যে হরিপদকে কিছু বলবে তাও বলতে পারে না কদুর মার জন্য। কদুর মা তাহলে বাড়ি মাথায়ে তোলপাড় করে ছাড়বে। যাও আছে তাও থাকবে না হরিপদকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। পরান যে বুঝে না তা নয়। কিন্তু পরানের মনে না। কেমনি বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করে। মনে হয় নাও নিয়ে ঘরোয়ারী গঞ্জে নিশিনের মতো ভেসে যায়। কি হবে এই সংসারে থেকে। এই ঘর সোয়ামি, এ যেন নিজের সংসার নয়। পরের ঘরে কাজ করছে নিজের বলতে কিছু নেই। অন্যে সেই রকম ভাবেই পরবাস বেমন।

কদুর মা একবার এক শিশি রাঙাআলতা আলতা কিনে দিতে বলেছিল — পরেনি। সেইজন্য কদুর মা পেটিয়ে উঠল ঃ তোমার মত মায়ের মরা ভাল। পরান মেয়েদের মুখ নেই। বিয়া করনের সময় মনে ছিল না। পরান এই পরিস্থিতিতে সহ্য করতে পারে না। মনে আগুন নিয়ে বেরিয়ে আসে। পরান জানে আসবার সিদি এসে গেছে। এই কথা মনে হতেই শরীর কেঁপে ওঠে। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। মাথাটা যেন ঘুরছে। পরান নিজেকে সামলাতে পারল না। পা পিছলিয়ে পড়ে গেল জল ছলে। ঝপাস করে শব্দ হতেই হরিপদ চিৎকার করে উঠল ঃ পরান ডেঙ্গলের কাছে মাছের খাঁচায় কাদায় পড়ে গিয়ে গোঙাচ্ছে। পিঠের ক্ষতির আগাটা লেগে রক্ত পড়ছে। রক্ত জলের মধ্যে মিশে একাকার। সর্বনাশ। হরিপদ কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। ডেঙ্গল ছেড়ে দিয়ে নিচে নেমে পরানকে চিৎ করে শুইয়ে দিল। একটা গামছা দিয়ে কাটা জায়গায় বাঁধবার চেষ্টা করল। মাছগুলি ছাড়া পেয়ে যে যার মত জলের দিকে চলে গেল। হরিপদ চেঁচাল ঃ বাঁচাও, বাঁচাও।

আর কি করবে। পরানকে নিয়ে এখন বাড়িতে যেতে পারলে হয়। ডাক শুনে যদি কেউ আসে। কিন্তু এলো না। আশেপাশে তো কেউ নেই। পরানকে নিয়ে যেতে পারলে হয়। কিভাবে নাও তুলবে। কদুর মাকে কি বলবে। বলবেই বা কি? হরিপদ গা ভরে গেল। তাজাতাজা রক্ত হরিপদর গায়। পরানের মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

হরিপদ চুকরে কেঁদে উঠলো।

— কি সর্বনাশ হইল গো।

হরিপদর কান্না পাশের ঢেউ-এর মত দিয়ে ঘেরাবের পৌঁছে যাচ্ছে। পরানের মাথাটা বালিশটার রেখে যেখানে লগিটা সেখানে গামছা দিয়ে ভাল করে বেঁধে ওইয়ে দিল। হরিপদ ইতিমধ্যে ঘামছে। দুরের বাড়ি আরো যেন দূরে মনে হল। দেব বিকেলের আলো জলের মধ্যে চিকচিক করছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। তাড়াতাড়ি না করলে নৌকা নিয়ে যেতে পারবে না। নৌকোর বাঁধন খুলে বৈঠা ধরল। নাও বাড়ির দিকে ঘোরাল।

পরান পাটাতনের উপর কাতরাচ্ছে। যন্ত্রণার পাঁচা কাঁদল। ডোলাল উল্টে পড়ে আছে। কি করে পড়ল পরান। নিশ্চয়ই পা পিছলে গেছে। তাদের জন্য পরানকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে হয়। হরিপদর চোখে জল এসে গেল। সংকটজনক অবস্থায় পড়ে আছে পরান। নিজের জীবন নিয়েও ওকে বাঁচাতেই

হবে। এই কথা মনে আসতেই সত্য মুটের বৌকে বলল হরিপদ।

ভোর না হতেই হরিপদ বিছানা ছেড়ে উঠল। বিছানা গায়ের সঙ্গে ভালোভাবে পরিপাটি করে নিয়ে দাঁড়াল। হরিপদর চিৎকার শুনে কানুর মা এবং আশপাশের লোকজন ছুটে এল। কানুর মা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। হায় হায় আমার কি হইল গো। আমার কি সর্বনাশ হইল।

হরিপদ পারুলকে কাঁধে করে ঘর থেকে বাইরে নামাল। কানুর মা তাড়াতাড়ি একটা খুন্তি নিয়ে এল। কারণ সন্ধ্যা নেমেছে। চারপাশের ঝোপেঝাড়ে জোনাকিরা জ্বলছে আর নিভছে। অন্ধকারে কারোর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কানুর মা আর হরিপদ দুজনে মিলে পারুলকে ঘরে শোয়াল।

পাশের বাড়ির লতু চলে গেল ডাক্তার আনতে। বাড়িতে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। কানু টগরিরা চুপ। পারুলের শরীর ভাল করে পরিষ্কার করে দিল কানুর মা। খুন্তিটা পরিষ্কার করে দিল। হরিপদ কারোকেই কিছু বলছে না। সবকিছু মুখেই এক কথা — কি করে হল? কেমন করে হল? হরিপদ যতই বলছে ভোলা থেকে পড়ে গেছে, কানুর মা ততই চিৎকার করে কাঁদছে আর বলছে এই সর্বোনাশ করলো কেন নিমলোটা, কেন হারামজাদা।

হরিপদ তো ভয়ে কাঁপছে।

কানুর মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, হঠাৎই পা পিছলিয়ে পড়ে গেছে। এর মধ্যে হরিপদর কোন হাত নেই। ও তো বাধাদানও চেষ্টা করেছে রক্ষা করবার জন্য। কানুর মা বড় বড় চোখ করে হরিপদর দিকে তাকিয়ে বলল, দুই কই দেখিনি।

হরিপদ এই কথার উত্তর দেয় না। ততক্ষণে ডাক্তার কবল এসে গেছেন। লতুর সঙ্গে আরো দুই একজন । ডাক্তার কাকা কাপড় দিয়ে বেঁধে নিয়ে ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবে। বিশ্রাম করবে, মাথা নড়তে যাবে না।

ডাক্তারের পায়ে পড়ে গেল হরিপদ। চোখের জল মুছতে মুছতে বলল : পায়ানরে বাঁচান ডাক্তারবাবু, চিরকাল আপনার গোলাম হইয়া থামুম।

— ঘাইবার মা তার নাই,

হরিপদ ডাক্তারের ব্যাগটা নিয়ে পিছনে পিছনে ছুটল। অন্ধকার বেশ আরো গভীর। এখন নিশ্চয়ই অমাবস্যা। লতুর হাতে হারিকেন। কোথাও একটা ঝুমুর পাখি ডেকে উঠল। হরিপদ কানুর মার দিকে তাকাতে পারছে না। নিজেকে অপরাধী মনে মনে হচ্ছে। অথচ নিজে দোষী নয়। কানুর মা এখনো পর্যন্ত কথা বলেনি। কেমন যেন গুম হয়ে গেছে। সারা আকাশের মেঘ জল মুছে। কথার সময় কোথায়। তবু সাহস করে বলল : আমি থাকতে বোন চিন্তা নাই।

কানুর মা ওনেও শুনল না। মুখটা থমথমে। কেমন যেন ঘোলা হয়ে গেছে। হরিপদ পায়ানের পাশেই শুয়ে পড়ল।

কখন যে ঘুম ভেঙেছে হরিপদ জানে না। চোখ মেলে দেখলো পায়ান ঘুমিয়ে আছে। কানুর মা উঠোন ঝাট দিচ্ছে। হরিপদ আস্তে আস্তে বাইরে এল। কানুর মার কাছে গিয়ে বলল : চা আছে গো? কিছু দাবেন? হাটে যাবে? কানুর মা যেন কোন জবাবই দেয় না। হরিপদ ফিরে গেল।

পায়ান চোখ মেলে তাকাল কানুর মাকে দেখতে পেল কাজ করছে। কানু, টগরিকে দেখছে না, বোধহয় ফুল তুলতে গেছে। কানুর মা ফিরতেই পায়ান হাত ইশারা করে কাছে ডাকল। কানুর মা কাটা ফেলে দিয়ে কাছে গেল। কপালে হাত দিয়ে দেখলো জ্বর এসেছে কিনা। আঁচলটা হাতে নিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বলল : চুপ কইরা চোখ বুইজা থাক। ভাল হইয়া যাইবা। সংসারের চিন্তা করতে হইবো না।

পায়ান খপ করে হাতটা ধরল। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল। খুন্তির মুখটা জল পড়িয়ে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। কানুর মা হাতটা সরিয়ে নিজের কাজে চলে গেল।

বেশ কয়েকদিন হয়ে গেছে পায়ান শুয়ে আছে বিছানায়। এখন উঠতে পারে, ভাল করে হাঁটতে পারে না। এই কদিন কিভাবে গেল যে নিজেই জানে না। কিভাবে খাওয়া খাওয়া আছে মনে করতে চেষ্টা করল। পরিষ্কার ভাল লাগছে না। ঘর ছাড় ভাব। হরিপদ ভাবছিল অন্ধকারে ভোরালে পা পিছলিয়ে নিয়ে এই কাণ্ড। হরিপদর কোন দোষ নেই। কানুর মা যদি সন্দেহ করে তাহলে ভুল।

এই কদিনি হরিপদই সব করছে যার এখন। হাট, বাড়ির কাজ সব ও এখন একা করে। যেন নিজের সংসার চালাবার ভার পেয়েছে। যে কারো আপন সংসার। হরিপদ এতেই আনন্দ। হাসিমুখে সবকিছু করছে। পারেও, জগতে মানুষ এইভাবে কি করে ভালবাসা পাচ্ছে। না ভেবেও উপায় নেই। এই জনম সময়টা কি করে কাটাবে। কানুর মা তো সংসারের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত। ঘরের তো কম কাজ নয়। উঠোন ঝাড় দেওয়া, বাসন-কোসন ধোয়া, তার ওপর একটা রুগির দেখভাল করা, তারপর তো আছেই পোলা-পানের ঝুটঝামি। এক একটা এক এক রকম, সবসময় খুনসুটি লেগেই রয়েছে। পায়ান দেহটা কোনরকমে বাইরে এনে গাছতলায় বসে। হরিপদই বন্দোবস্ত করেছে। কাহাতক আর ঘরে বসে থাকা যায়। বাইরে এসে সামনের নদীর দিকে তাকায়, গাছপালা, পাখি দেখে কিন্তু সুখ নামে পাখিটা আসে না। কখনো কখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে ওপরদিয়ে কত গয় — দিন তো লেল সন্ধ্যা হইল— নিজের মনেই। পায়ান গান গাইতে জানে না। অন্ধ পায়ান নীলনয়নের সময় কি সুন্দর গান গায়। পায়ান তো অন্ধকার দেখি। কিছুই পড়ে না। কাউকে ভালবাসতেও পড়ে না, এই জীবন রেখে লাভ কি। নিজের বৌও অন্যকে ভালবাসে। এক এক সময় বুক ফেটে যায়। কান্নায় ভেঙে পড়ে। কানুর মাকে দূর থেকে দেখে। হরিপদ এলেই কানুর মা অন্যরকম হয়ে যায়। তখন যেন পায়ানকে চিনতে পারে না। পোলাপানকেও চিনতে পারে না। কেন। এই প্রশ্নের উত্তর পায়ান কোনদিনই পায়নি। চেষ্টাও করেনি। কানুর মা আগে নিজেই ভাত মুড়ি দিত। এখন আর নিজে আসে না। টগরির হাত দিয়ে পাঠায় হরিপদর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। এখন তো আগের চেয়ে অনেকটা ভাল। পিঠের ক্ষতটা শুকিয়ে আসছে। আর দুই একটা দিন গেলেই সোজা হয়ে হাঁটতে পারবে, ডাক্তারবাবুই বলেছে।

পায়ানের চোখ জলে ভেসে যায়। নিজের বাড়িতে কেউ নেই। বাইরের লোক যেন মনে হচ্ছে। অনেক সময়ের সাহসে হরিপদ বলল :

— আর কটা দিন, তারপরই মাথা নাড়তে

ছেড়ে পালাব।

— ভাল হইয়া কি হইবে। এর চেয়ে মরা ভাল ছিল। পরান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দেয়।

— ঐকথা কও ক্যান। অলুক্ষণে কথা কবতে নাই।

— ঘরে বইয়া থাইকলা খাওন মিলো।

— ঐসব চিন্তা কইর না তো। আমি আছি কি করতে। সংসারের কথা ভাইবো না।

পরান হরিপদর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কোন কথা বলে না। বুকের মধ্যে কে যেন উনুন ধরিয়ে দেয়। মনে হয় ঘলেশ্বরীর সব জল ঢেলে নিজেও নিভবে না। একবার মনে হয় গলা টিপে মেরে ফেলে কিন্তু পারে না। গেরামের লোকেরা আসে দু-চারটা কথা বলার পর হরিপদর কথা বলে, কানুর মার কথা বলে। সব কথাই খারাপ ধরনের। পরানের সে সব কথা শুনলে মনের মধ্যে আগুন ধরে যায়। ঐসব কথা শুনে যা যেন আরও বেড়ে যায় পরানের চোখেও পড়েছে। বাড়িতে একটা অসুখ লোক পড়ে আছে সেদিকে খেয়াল নেই। কেন আনলে রান্না করছে। হরিপদর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করছে। অথচ পরানের সঙ্গে কোন কথা বলছে না কানুর মা। এই অবহেলা সহ্য করতে না পেরে প্রথম প্রথম পরান চেঁচামেচি করতো এখন আর তাকে না। জানে ছেকে কোন লাভ নেই। বরং অশান্তি আরো বাড়বে। যে দু'মুঠো ভাত পাচ্ছে তাও পাবে না। ভাল মানুষ হরিপদকে দেয়। ঘরিবেলা বাটি ভর্তি দুধ। দূর থেকে সবই দেখতে পায়। এই যে অন্যায়।

হরিপদ কিন্তু একটু অন্যরকম। সামনে এসে অনেক কিছু করতে চায়। খোঁজখবর নেয়। একেবারে মৌখিক নয়। কি খেতে ভাল লাগে জিজ্ঞেস করে। এসবের মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। বন্ধু হয়ে এই কাজ করলে কি করে হরিপদই জানে। ঘরিবেলা কানুর মা জল খেতে যায়, বারান্দায় হরিপদ থাকে। ওখানে একটা চৌকি রয়েছে। হঠাৎ কবে কেউ এসে দেবার অপেক্ষায় ছিল। পরান কিন্তু হরিপদকে ওখানেই থাকতে বলেছিল, কখন কি দরকার পরানে কে জানে। রাত জিজ্ঞেস করতে যাবে। হরিপদ আসতে আসতে করে না করেছিল। কিন্তু পরিষ্কার করে না করেনি। অসুবিধা হলেই বলেছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন অসুবিধা হয়নি। কানুর মা জল খেতে যায়, বারান্দায় হরিপদ থাকে। ওখানে একটা চৌকি রয়েছে। হঠাৎ কবে কেউ এসে দেবার অপেক্ষায় ছিল। পরান কিন্তু হরিপদকে ওখানেই থাকতে বলেছিল, কখন কি দরকার পরানে কে জানে। রাত জিজ্ঞেস করতে যাবে। হরিপদ আসতে আসতে করে না করেছিল। কিন্তু পরিষ্কার করে না করেনি। অসুবিধা হলেই বলেছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন অসুবিধা হয়নি। কানুর মা কি একটা কাজ অজুহাত, উত্তর দিতে ইচ্ছে ছিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, যাই, ভাল কাজের সময় তাইকতায়ে বলেই একগাদা বিরক্তি নিয়ে সামনে এল। পরান অনেক ভেবে নিয়ে বলল : আজ রাইতে আমার কাছে শুবি?

— যামু।

মুখ ঝামটা দিয়ে কানুর মা চলে গেল। যেন অনেক একটা ঝামেলার কথা বলেছে। পরান কথাটা শুনে একদম ভেঙে পড়ল। তবে কি সব লোকেরা যা বলে সত্যি। হরিপদর সঙ্গে থাকে। আজ রাতে দেখতে হবে ব্যাপারটা। মনে মনে ঠিক করেই নিল। আজ একটা ফয়সালা করবেই। দুটোর মধ্যে একটাকে ঘলেশ্বরী গাঙে ফেলবেই। সাময়িকের একটা প্রতিজ্ঞা করল পরান। অনেক দিন থেকেই এইসব ভেবেছে কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি। সংসারটা ভেঙে যাবে। টগরি, কানু ভোজন না পেয়ে থাকবে। এইসব চিন্তা করে এতদিন বলেনি। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবেই। আজ হরিপদকে ধরতে পারে তাহলে আজই শেষ। তার একদিন কি আমার একদিন।

ঘরোয়াতি রাতের খাওয়া শেষ হল। যে যার ঘরে চলে গেল সব। পরান বিছানায় শরীরটা রাখল যেন অনন্তকাল রাখে। হরিপদ আসবে বাইরে গেল। হরিপদ ভাবছে খেল, পরানও টান দিল। কিন্তু কোন কথা বলল না। বড় বড় চোখ করে হরিপদর সম্পূর্ণ মন শরীরটা দেখবার চেষ্টা করল। ঘৃণায়, ভয়ে, ক্রোধে তার শরীরে বান এসে গেল। পরান সেই বান আটকাতে পারলো না কোনদিন। হরিপদ কেশতিক দেখে বলল, ঘুমি তয়, আমি যাই। সারা দিন খাটনি গেছে।

পরান কোন কথা বলল না। শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইল। পূর্ণিমা আলোর তা চোখ দুটো হিংস্র বাঘের চোখের মত জ্বলজ্বল করছে।

বোধার একটা নিরাল ডাকল। বাড়ির নালায় ভোঙ্গর বড় পরে কানুরগুলি ঘটোপুটি করছে। অমাবস্যার শেষ রাত। সেইজন্য সন্ধ্যারাতেই যেন আকাশে, একটু পরেই চাঁদের আলোয় উঠোন ম ম করবে। পুকুর পাড়ের ঘাটে জলের ঢেউ লাগছে, ঘাস পোকে বাতাস বইছে। কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। পরানের গা শিউরে উঠল। পরান আস্তে আস্তে চৌকি থেকে নেমে চৌকাঠ পেরোল। তারপর যেন হুকুমে ঘরের সিঁড়ি ছেড়ে উঠানে নামল। যেন সোজা হয়েই হাঁটছে, পা কেলতে যেন অসুবিধা হচ্ছে না। পা টিপে টিপে পুবের ঘরের সামনে দাঁড়াতেই থমকে গেল। ফিসফিস করে হরিপদ কানুর মাকে কি যেন বলছে। পরান কি করবে কিছুই ভাবতে পারল না। পা ঠকঠকে। শরীর টলছে। মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে বমনী দিয়ে হড় পাতালে প্রবেশ করে। কিন্তু একি। সব সত্যি। এখন কি করবে। মুটোকে ঘরে ঘলেশ্বরী-গাঙে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দেবে, না রান্না ঘর থেকে দায় কাটা বটি এনে এখানেই শেষ করবে। না, ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। আগুন লাগলে তো কানু, টগরি, ভোজন শেষ হয়ে যাবে। ঘরের কেউ থাকবে না।

কিন্তু হঠাৎই পরান ঘুরে দাঁড়াল কি মনে করে। এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর কখন কোন ফাঁকে এসে গেল নিজেই জানে না। নৌকার বাঁধনটা খুলে বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকা ছাড়ল। এলোপাথাড়ি বৈঠা ফেলতে ফেলতে ঘলেশ্বরী নদীতে নৌকা চলছে। পাগলের মত পরান বৈঠা ফেলছে। ও যে অসুখ সব কিছু ভুলে গিয়ে বৈঠা ফেলছে হুশ নাই।

নদীতে ঢেউয়ের গর্জন। নৌকা ঘুরছে। নৌকার জল সামলে এলোপাথাড়ি। একবার নামছে, একবার উঠছে। এখন মধ্য রাত। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সবেমাত্র চাঁদ উঁকি দিচ্ছে আকাশে। নৌকো মাঝ গাঙে — পরান যেন দিশেহারা উন্মাদের মত ছুটছে, কোথায় যাবে, কি করবে কিছুই জানে না। জলের মধ্যে বৈঠা ফেলছে হুশহাশ। ওর গায়ে যেন অসীম শক্তি ভর করেছে কেউ। নৌকা একবার জলের নিচে যাচ্ছে, আর একবার ওপরে উঠছে।

পরান নদীর জলে ভিজে একসকসা। ওর কিছু খেয়াল নেই। তাকাচ্ছে-ঘুটছে সামনের দিকে। ▲▲▲

" We can only win over the opponent by love, never by hate. "
— Mahatma Gandhi

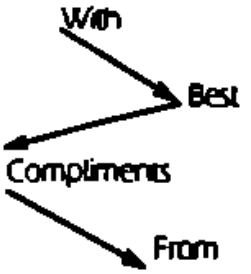

M/s. Jadavpur Wholesale Consumers' Co-operative Society Ltd.

114 P. Raja S.C. Mullick Road
Calcutta - 700 047

বিশেষ রচনা

লিঙ্কন গেটিসবুর্গে গেলেন

(কার্ল স্যান্ডবুর্গের রচনার অনুবাদ)

অসিত মজুমদার

যখন পেনসিলভেনিয়ার গভর্নর কার্টিন ১৮৬৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখটি গেটিসবুর্গে জাতীয় সৈনিকদের সমাধি উৎসর্গের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট করলেন, তখন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য একবার যে আমন্ত্রণ পত্রটি পেলেন তা ছিল একটি মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি।

ঐ দিনে বক্তৃতা দেবার ভার পড়েছিল এভারেটের উপর। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সম্ভবত আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বক্তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তিনি হয়েছিলেন ম্যাসাচুসেটসের গভর্নর, স্টেট সিটেনের রাষ্ট্রদূত এবং হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট। তাঁর বক্তৃতার চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ওয়াশিংটন সম্পর্কে তিন ঘন্টায় ১২২ পৃষ্ঠা বক্তৃতা দিয়ে ১৮৫৯ সালে ৫৮,০০০ ডলারের একটি তহবিল গঠন করেছিলেন এবং এই অর্থ দান করেছিলেন মাউন্ট ভার্নন ক্রয় করে একটি স্থায়ী বেদী নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে।

শান্ত, ভদ্র, ৬৯ বছর বয়সে সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র এভারেটকে পেনসিলভেনিয়ার কমিশনারগণ স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ করেছিলেন এবং তারা তাঁকে বক্তৃতা প্রস্তুত করার জন্য দু'মাস সময় দিয়েছিলেন। লিঙ্কনকে ভাষণ দিতে অনুরোধ নিয়ন্ত্রণটি পত্র চিঠা ভাবনা করে দেওয়া হয়েছিল। একজন কমিশনার পত্রে লিখেছিলেন 'এই রকম পবিত্র অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তৃতা দেওয়া যোগ্যতা আছে কি না সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল এবং সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠানের মাত্র দু সপ্তাহ আগে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

এই সময়টা ছিল আমেরিকার পক্ষে দুঃসময় এবং লিঙ্কন তখন অনেক সময়েই মোটেই জনপ্রিয় ছিলেন না। কোন কোন সংবাদপত্র লিখল যে প্রেসিডেন্ট গেটিসবুর্গে মৃতদের কবরের উপর রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি অসার বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন। সমসাময় রিপাবলিকান দলের নেতা থেডিয়াস স্টিভেন্স ৬৩ সালে বিশ্বাস করতেন যে রাজনৈতিক মঞ্চে লিঙ্কন ছিলেন একজন 'মহাভাঁড়'। তিনি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট পদে যেতে চাইছিলেন। তিনি যখন শুনলেন যে লিঙ্কন ও সেক্রেটারি অব স্টেট সীওয়ার্ড গেটিসবুর্গে যাচ্ছেন, তখন মন্তব্য করলেন, 'একজন মূর্খ দোক মৃতদের কবর দিতে যাচ্ছে।'

অনুষ্ঠানের আগের দিন একটি বিশেষ ট্রেন প্রেসিডেন্ট ও তার দলের লোকদের গেটিসবুর্গে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেনটির অভ্যন্তরে লাল সাদা ও নীল রঙ দিয়ে সাজানো হয়েছিল। তাঁর পদমর্যাদা যখন মনস্থ করলেন যে তাদের হাতে আর সময় নেই তখন তিনি বললেন যে তাঁর নিজেকে মনে হচ্ছে একজন ইলিনয়সের লোকের মত যাকে নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল কাঁসি দিতে। লোকটি যখন ছাড়া দিয়ে কাঁসিমঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন জনতা তীড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে যাবার রাস্তা আটকে দিচ্ছিল। অবশেষে সেই হতভাগ্য লোকটি বলে উঠল, 'ভদ্রে ভেদেরা, তোমাদের এত তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই, আমি ওখানে না যাওয়া পর্যন্ত কোন মজাই হবে না'।

গেটিসবুর্গে পৌঁছনোর পর লিঙ্কনকে পরিচয় করে একটি কেলভরী আবাসে নিয়ে যাওয়া হল। দুপক্ষ, ছোট পাহাড়-শহরটি লোকের তীড়ে উপচে পড়ছিল। সব বাড়িগুলি বিশিষ্ট এবং সাধারণ লোকেদের দ্বারা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। হোটেলগুলির মেঝেতে শত শত মানুষ ঘুমিয়ে ছিল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ব্যান্ডের বাজনা বাজল। তারপর গায়কের দল যখন প্রেসিডেন্টের কক্ষে গিয়ে তাঁকে একটি ভাষণ দিতে অনুরোধ করল, তিনি তাদের বললেন -'আমি যে পথে যাই তার জন্য কোন কোন সময় আমার পথে আসে যাতে কিছু না বলাই ভাল।' (কে একজন পাছু গলায় বলল 'আপনি যদি কিছু বলতে পারতেন।') 'এমন প্রায়ই হয় যে সব থেকে ভাল হল কিছু না বলা। এই রাত্রে আমার অবস্থাও এই রকম একথা ভেবে আমি আপনাদের কাছে আর কিছু না বলার জন্য ক্ষমা চাইছি।' উপস্থিত জনতা মনে করল যে এটা এমন কিছুই বক্তৃতা হল না। তারা পাশের ঘরে সীওয়ার্ডের কাছে ব্যান্ড নিয়ে বাজাতে শুরু করল।

যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নানা সমস্যায় ব্যস্ত থাকায় লিঙ্কন তাঁর ভাষণ তৈরি করতে একেবারে সময় পাননি। অনুষ্ঠানের আগের দিন সেই রাত্রিতে দর্শটা নাগাদ তিনি তাঁর ঘরে বসলেন এই ব্যাপারে আরও কাজ করার জন্য। তিনি যখন ঘুমোতে গেলেন তখন মধ্য রাত্রি পার হয়ে গেল।

ছোট পাহাড়ের উপর গোরস্থানটিতে অনুষ্ঠান দেখার জন্য অন্তত ১৫,০০০ লোক জড়ো হয়েছিল। পায়ে হেটে এবং অশ্বপৃষ্ঠে একটি মিছিল গেটিসবুর্গ থেকে সেখানে আসল। প্রেসিডেন্টের ঘোড়াটি মনে হচ্ছিল তাঁর পক্ষে ছোট। কমিশনারদের মধ্যে একজন যিনি প্রেসিডেন্টের শিছনেই অশ্বপৃষ্ঠে আসছিলেন তিনি লক্ষ্য করলেন যে তিনি সোজা হয়ে বসেছিলেন এবং তাকে দেখে মহিমান্বিত বলে মনে হচ্ছিল।

সমাধিক্ষেত্রে শুরু হল ১১টায় সময় এবং ১৫ মিনিটেই তা শেষ হল। কিন্তু সেদিনের বক্তা তখনও এসে পৌঁছননি। দুপুর পর্যন্ত ব্যান্ডের বাজনা চলল। মিঃ এভারেট এসে পৌঁছলেন। মঞ্চের উপর বসেছিলেন রাজ্যের গভর্নরগণ, সামরিক অফিসারবৃন্দ, বিদেশ মন্ত্রীরা, কংগ্রেসের সদস্যগণ, প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর মন্ত্রিসভা।

যখন এডওয়ার্ড এভারেটকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, তিনি লিখনের দিকে একটু

নয় হলেন তাঁদের নির্বাচনে দাঁড়ালেন তখনও সমানে যা বলতে পর্যন্ত বিদ্বুত হয়েছিল। আর তার পক্ষে ভোটের পরীক্ষা হবে। চতুর্দিকে ছিল আশা দেখে, আছে প্রবল জনি পীড়নের আক্রমণ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে এক অনুকূল পর্যবেক্ষণীয় তাদের নীল নৈল নিয়া। তিনি তাঁর প্রস্তুত করা ভাষণে এ সবের উল্লেখ করেছিলেন। এই বিদ্বুত মুহূর্তের যা এখন অপরীক্ষাধীন বৎসরের পরিমলের পরে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, এই সুদূর আলাস্কার পর্বতমালা যা আমাদের সম্মুখে অস্পষ্টভাবে সমুন্নত হয়ে আছে। আমাদের ভাইদের কবরগুলি যার উপর ছড়িয়ে আছি — এসবের দিকে তাকিয়ে আমি বিশ্বাসের নিতে আমার দৃঢ় করবার জন্যই আজ ঈশ্বরের এবং প্রকৃতির তাদের নীরবতা ভঙ্গ হয়।

তিনি আরও বললেন, 'এখেনে এই আইন চালু ছিল এবং বিশ্বাসভাবে ব্যাখ্যা করলেন কিভাবে গ্রীকেরা তাদের মৃত বন্ধুদিগের সম্মান জানাত যারা যুদ্ধে নিহত হতেন'।

মৃত বিস্তারে তার হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা দিলেন, স্টেটসমূর্গে তিনবিদের মৃত্যুর তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করলেন, রাজ্যের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের প্রসঙ্গে নিয়া করলেন, ইউনিয়নের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক উল্লেখ করলেন এবং নিয়ত দেশপ্রেমিকদের সম্পর্কে পেরিক্লিসের উক্তি উদ্ধৃত করে তার ভাষণের উপসংহারে টানলেন 'সমগ্র পৃথিবীই হল বিখ্যাত মানুষদের সমাধি'। তিনি একজন সৈনিক বিধবা মহিলা নিয়েছিলেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের পরিবর্তনের কারণ এবং যে পেশায় তিনি জীবন কাটিয়েছেন — স্বাধিনতা বিদ্যালয়ের যা কিছু পূর্ণতা তা এতে নিহিত ছিল।

যখন লিংকনের বলার সময় হল তখন তিনি তাঁর নিজের ভাষণের চলনটুকু পরে দাঁড়ালেন এবং এমনভাবে দুপাতা ভাষণ তার দিকে দু একবার তাকিয়ে উচ্চারণে এবং পরিষ্কার গলায় ধরে তাঁর ভাষণ দিলেন। একজন ফটোগ্রাফার তার সাজসরঞ্জাম নিয়ে ছবি তোলার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন, কিন্তু তিনি ঘরের মাঝে যাবা নিয়ে সাই মেরার আগেই প্রেসিডেন্ট বলে উঠলেন 'অনন্তের জন্য এবং অনন্তের জন্য', এবং ছবি নেবার মুহূর্তটি চলে গেল। সবটি বলা পাঁচ মিনিটে বলা হয়েছিল এবং হাতেরগুলি পড়লিল নিতান্তই স্বাভাবিক যা ছিল অনুষ্ঠানের প্রতি এবং উচ্চপদের প্রতি সেই মোড়বৃত্তের সম্মান জানানো যারা তিন ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করেছিলেন তাদের শেষের জন্য।

সেই রাতে লিংকন ওয়াশিংটনে ফেরার জন্য ট্রেনে রওনা হলেন। তিনি ছিলেন ক্লান্ত, সহকর্মীরা কথা বলছেন এবং সিটের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি কপালের উপর একটি ভিজে তোয়ালে রাখলেন। তাঁর মনে হল তিনি শ্রোতাদের কাছে যা বলেছেন তা হল যথেষ্ট - পরিষ্কার ভাষণের উপসর্গ যথেষ্ট ভাল হয়েছে। তিনি বললেন, 'এই বক্তৃতা নিশ্চয়ই বিফল হয়েছে এবং লোকেরা হতাশ হয়েছে।'

অধিকাংশ সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া ছিল নিন্দাসূচক। নিকটবর্তী হ্যারিসবুর্গের মি পেট্রিয়ট অ্যান্ড ইউনিয়ন বিদ্রূপ করে লিখল। 'প্রেসিডেন্ট নির্বোধের মত কথা বলেছেন। এরকম সময়োপযোগী মৃতদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানোর চেয়েও তিনি তাঁর দলের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বেশি কাজ করেছেন। আমরা প্রেসিডেন্টের মৃত্যু মন্তব্য উপেক্ষা করতে চাই। আমরা চাই যে রাষ্ট্রের স্বার্থে বিস্মৃতির অতলে এসব চেকে দিক এবং কখনো যেন এসব আর উচ্চারিত না হয় এবং আলোচনা না হয়।' এবং লিংকনের টাইমস লিখল : 'আমেরিকার প্রতিটি মানুষের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যাবে যখন সে পড়বে এইরকম বাজে উক্তি যা উচ্চারিত হয়েছিল সেই মানুষটির কণ্ঠে যাকে দেখিয়ে তিনিই বিশ্ব সেরাদের কাছে কাজে হবে যে ইনিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।' লন্ডন টাইমস সংবাদদাতা লিখলেন, 'এর চাইতে নীরস এবং ক্ষুদ্র যেন কিছু সহজে তৈরী করা যায় না।'

কিন্তু একজন সংবাদদাতা শিকাগো ট্রিবিউনের জন্য ভারবার্তায় একটি ঘটনার এক ভবিষ্যদ্বাণী পাঠালেন : 'প্রেসিডেন্ট লিংকনের উৎসর্গ ভাষণ অন্যতমটি মানব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।' ফিলাডেলফিয়া ইভনিং বুলেটিনে বলা হল যে হাজার হাজার মানুষ যারা যি এভারেটের বিশদ বক্তৃতা পাঠ করবেন না, তারা প্রেসিডেন্টের অল্প কয়েকটি কথা পড়বেন, 'এবং অনেকেই চোখের পাতা না ভিজে এবং হৃদয় দ্রবীভূত না হয়ে পারবে না'। এবং হার্পারস উইকলিতে একজন লেখক লিখলেন : 'যি এভারেটের বক্তৃতা ছিল সময় এবং উৎসাহহীন—— প্রেসিডেন্টের অল্প কয়েকটি কথা হৃদয় থেকে হৃদয়ে পৌঁছে যাওয়ার মত। "পৃথিবী আজই জানবে এবং দীর্ঘদিন মনে রাখবে না যে আমরা এখানে কি বলেছি, কিন্তু একথা ভেলদিন ভুলতে পারবে না যে তারা এখানে কি করেছিল।" এমন সরল, কথাবোদ্ধ এবং অকপটী কথা যেন এর আগে আর কখনো বলা হয়নি। এই ভাষণ সম্পর্কে এভারেটের মতামত যা তিনি পত্রের দিন একটি চিঠি নিয়ে লিংকনকে জানিয়েছিলেন তা ছিল নিছক সৌজন্য প্রকাশ করা ছেড়ে বেশি। 'আপনি অনুষ্ঠানের ভাবধারার কেন্দ্রে যেখানে দু মিনিট পৌঁছেছিলেন আমি যদি দু ঘন্টায় তার কাছাকাছি আসতে পারতাম তাহলে সুখি হতাম ও গর্ব অনুভব করতাম।' লিংকন উত্তর দিলেন : 'আমাদের পরস্পরের ভূমিকা অনুযায়ী আপনার পক্ষে খুব ভাল দেওয়া আমার পক্ষে যেমিকল বলা সম্ভব হত না। একথা জেনে খুশী হয়েছি যে আপনার বিচারে আজ যা কিছু আমি বলেছি তা একেবারে ব্যর্থ হয়নি।' ▲▲▲

"হে বালক বৃক্ষ,
আবণ মন্ত্রে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা
থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো।"

□ রবীন্দ্রনাথ

প্রবন্ধ

প্রতিকূল পরিবেশে শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক

সুবীরকুমার ব্যানার্জি

ব্যক্তি-মালিকানা ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ভূমিকা কেবলমাত্র সমবায় ব্যবস্থারই স্বীকৃত পরিচয় ছিল। বিগত সরকারি পরিকল্পনাগুলিতে সেরকমই দেখা যেতো। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে সে বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বও দেওয়া হতো। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী (১৯৯২-১৯৯৭) পরিকল্পনার এবং তার সংশ্লিষ্ট দলিলে সমবায়ের ভূমিকা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। অর্থাৎ 'সমবায়' ভারত সরকারের কাছ থেকে আর সে মর্যাদা পাবে না। অনেকেই মনে করেছিলেন অষ্টম যোজনায় সমবায়ের স্থান না পাওয়াটা অনবধানতামূলক ত্রুটি, তাই গত ১৩ সালের মার্চ মাসে দিল্লিতে ভারতীয় সমবায় সম্মেলনে সমবায় নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ত্রুটি সংশোধনের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। লেখক ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে যোগদানকারী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ কল্পনাথ রাওয়ের সম্মেলনকে জানিয়ে ছিলেন সরকার সমবায় নীতি (পলিসি) গ্রহণের কথা ভাবছেন। তিনি সমবায়ের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা রচনাকারী সংস্থা স্থাপনের কথাও বলেছিলেন। ঐ সংস্থা সমবায়ের উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলি রচনা করবে। পরিকল্পনাগুলি সরকারের কাছে পেশ করলে সরকার বিবেচনা করবে। আজও কেন্দ্রীয় সরকার 'সমবায় নীতি' গ্রহণ করেনি। স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে অষ্টম যোজনায় 'সমবায়' বিষয়টি বাদ যাওয়াটা অনবধানতামূলক ত্রুটি নয় এটি নীতিমূলক সিদ্ধান্ত।

প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও ক্ষেত্রে সরকার গঠন করার পরই অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন 'বিগত বিশের অর্থনীতির কারণেই ভারতের বর্তমান আর্থিক সংকট। নেহেরু পরিবারের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শমতো নিজে, বাণিজ্যে ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনমোহন সিং যে উদারনীতি অনুসরণে অগ্রণী তার প্রমাণ তিনি নিজে তুলে ধরলেন প্রতি পদক্ষেপে। ১৯৯১ সালের ২৪ জুলাই বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রের জন্য এবং ৬ আগস্ট ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রের জন্য নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করলেন যাতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ভূমিকা খর্ব করে ব্যক্তি উদ্যোগের পুঁজি এমনকি বিদেশি এক্সচেঞ্জিয়া পুঁজি বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। "রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাই দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে" স্বাধীনোত্তর ভারতের এই ঘোষিত নীতি ত্যাগ করা হ'ল। প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী "মুক্তবাজার - অর্থনীতি" প্রবর্তনের লক্ষ্যে অগ্রণী আর্থিক ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে নরসিমহম কমিটি (১৪-৮-৯১), রাজা চেলিয়া কমিটি (১৯৯১), রঙ্গরাজন কমিটি (সেপ্টেম্বর ১৯৮৮), মালহোত্রা কমিটি (১৯৯৩-৭ জানুয়ারি ১৯৯৪), নরসিমা কমিটি (সেপ্টেম্বর ১৯৯১), প্রভৃতি কমিটি গঠন করেন। তাদের সুপারিশের অন্যতম সমবায় ও সমবায়ভিত্তি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য করে সহানুভূতিহীন, মনোভাব প্রকাশ শুরু হল। বিভিন্নভাবে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করাও আরম্ভ হ'ল। এই নীতি গ্রহণের ফলে ব্যক্তিগত মালিকানার এমনকি বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলির গুরুত্ব বেড়েছে এবং তা সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। ফলে যে সব সংস্থার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষমতা আছে তারাই আর্থিক ক্রিয়াকর্মে থাকবেন অন্যদের কারবার গুটিয়ে ফেলতে হবে। এই অবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক সাম্যবস্থার মুনিয়াদে সমবায় সংস্থাগুলিকে টিকে থাকতে হবে।

ভারতের সমবায় আন্দোলনের শিকপাল এবং পথিকৃৎ ভাতার ভি ভূলিয়েন, চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (এন ডি ডি বি) গত ২৬ জুন'৯৫ ওয়ারাঙ্গলে আনন্দ-এ তাঁদেরই কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড-এর একবিংশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঐ সংস্থার চেয়ারম্যান হিসাবে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রের বর্তমান অর্থনৈতিক নীতির সমালোচনা করে বলেন "আমরা তো জানই যে, উদারনীতির ফলে একদিন হয়তো দেখবো আমাদের কৃষকদের রক্ষাকল্পে করা পরিবর্তনের ফলাফল সুটছে উত্তর আমেরিকার এক্সচেঞ্জিয়া কৃষি ব্যবসায়ীরা আর আমাদের গ্রামের মহিলাদের লালন-পালন করা গরুর দুধ থেকে তুলকর পাচার করছে জেনেরার বড় বড় ব্যবসায়ীরা।" তিনি বলেন, উদারনীতিতে সমবায়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষমতার ওপর। কোন সমবায় সংস্থাই প্রতিযোগিতার ভীতু নয় বরং তারা প্রতিযোগিতার অগ্রণী কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা কতটা সুষ্ঠু ও ন্যায্য।

সমবায় একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হলেও, এটি জনকল্যাণমূলক সংস্থা হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নের প্রয়াস বজায় রাখে। সমবায়ের এই সব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলীয় ব্যাঙ্কগুলির বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনা করা যাক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ১৯৯২-৯৩ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের মোট ১৪০২টি শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ ১০৫০০ কোটি টাকা এবং ঋণদানের পরিমাণ ১০১২৩ কোটি টাকা। এদের মধ্যে ৩১৩টি ব্যাঙ্ক এখনও ব্যাঙ্কিং ব্যবসার কোন লাইসেন্স পায়নি। যার মধ্যে ১০৫টি ব্যাঙ্ককে দুর্বল বলে গণ্য করা হয়েছে এবং ১৭৮টি ব্যাঙ্ককে লাইসেন্স দেওয়া হয়নি কারণ তারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নানাবিধ শর্ত পূরণ করতে পারেনি। যেমন অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণের (প্রায়োরিটি সেক্টর এ্যাডভান্স) লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না করা,

মারাঠে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ন্যূনতম মাপকাঠি (ভায়াবিলিটি নর্ম) উত্তীর্ণ না হওয়া, এবং ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন আইন (১৯৪৯) এর ৬, ৮, ১৪ এ, ১৮, ২০ এ এবং ২৪ ধারা অনুযায়ী নর্ম পূরণের ব্যর্থতা প্রভৃতি। গ্রস্ত দুই পক্ষেরও বেশি এই ব্যাঙ্কগুলির লাইসেন্সের নবায়ন করে লাইসেন্স না পেয়েও, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্টের উল্লিখিত ধারাগুলিতে কি বলা আছে? সংক্ষেপে তা হ'ল ঃ ৬ ধারায় শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি কি কি ধরনের ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় করতে পারবে যেমন বলা আছে তেমনি ৮ ধারায় বলা আছে। শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক কোন ট্রেডিং ব্যবসা করতে পারবে না। ১৪ এ ধারায় বলা হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন ছাড়া আমানতকারীদের স্বার্থে ব্যাঙ্কের কোন অংশ বা সম্পত্তি কোথাও পরিত্যক্ত বা বন্ধক রাখা যাবে না। ১৮ ধারায় নগদ জমার অনুপাত (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও) কি হবে তা বলা আছে। চাহিবামাত্র এবং মেয়াদি আমানতের (ডিমান্ড অ্যান্ড টাইম লায়বিলিটি-ডি টি এল) মোট দায়ের ৩ শতাংশ বিভিন্ন নগদ জমা হিসাবে কেন্দ্রীয়, জেলা অথবা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে চলতি আমানতের (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট) খাতা খুলে জমা রাখতে হবে। ২০ এ ধারায় বলা আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিনা অনুমতিতে প্রাক্তন বা বর্তমান কোন পর্ষদ সদস্যের ব্যক্তিগত ঋণের আংশিক বা পুরো মকুব করা যাবে না। আর ২৪ ধারায় বিভিন্ন তরল পরিসম্পদের অনুপাত (স্ট্যাট্যুটারি লিকুইড রেশিও) সম্পর্কে বলা হয়েছে। বলা আছে যে টি এল-এর ন্যূনতম ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বিভিন্ন তরল পরিসম্পদ হিসেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক অথবা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে ব্যবস্থাভামূলক পরিসম্পদ রাখতে হবে। প্রতি মাসেই তরল পরিসম্পদের আনুপাতিক অবস্থান সম্পর্কে নিয়মিত রিটার্ন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পাঠাতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে রিটার্ন না পাঠালে এবং ১৮ ও ২৪ ধারা অনুযায়ী নগদ জমার অনুপাত এবং বিভিন্ন তরল পরিসম্পদের অনুপাত বজায় রেখে ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন আইন (১৯৪৯) এর ৩৫(৩) ধারামতে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে আর্থিক অসুবিধায় ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেকে কখনো সময়ত সময়েই অনুপাতের তারতম্য ঘটে যায় যেমন উই বাড়ছাড়া বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি, এক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন কড়া মেজাজে নেয় না। অতি সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৩৫(৩) ধারার প্রয়োগ শুরু করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শহরাঞ্চলীয় ব্যাঙ্ক বিভাগের (আরবান ব্যাঙ্ক ডিপার্টমেন্ট - ইউ বি ডি) চিফ অফিসার এন টি হরিরামানী শহরাঞ্চলীয় ব্যাঙ্কের কার্যকর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন "শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কার্যকর্ম সন্তোষজনক।" অথচ যে ব্যাঙ্কগুলি দুর্বল বলে তাদেরও দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রেখে লাইসেন্স না দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। এমনকি শাখা খোলারও অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না।

অন্যদিকে নরসিংহম কমিটি সমবায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোনও সুপারিশ রাখেনি। শুধু বিদেশি ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সুপারিশ করেছে যথেচ্ছ শাখা খোলার। বিভিন্ন তরল পরিসম্পদ (স্ট্যাট্যুটারি লিকুইড রেশিও — এস এল আর) এবং নগদ জমার (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও — সি আর আর) অনুপাত এবং অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণদান (প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং) কে অনেকটা নমনীয় আনা, এবং বাজারী শক্তি ও অবস্থার নিজস্ব দর-মূল্যায়নের ভিত্তিতে ঋণ ও আমানতের ওপর সুদের হার নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে।

নরসিংহম কমিটির সুপারিশ মেনেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত ২২ জানুয়ারি '৯৩ বেসরকারি ব্যাঙ্ক স্থাপনের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলো। ব্যাঙ্ক খোলার জন্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, ট্রাস্ট, বিভিন্ন অর্থ প্রভৃতির কাছ থেকে শতাধিক আবেদন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা পড়েছিলো। যারা গ্রাহক পরিষেবার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং মানের সু-উচ্চ গ্রাহক পরিষেবার (যার মধ্যে কমপিউটার, টেলি-যোগাযোগ, রাতদিন ব্যাঙ্কিংয়ের গ্রাহক পরিষেবা ইত্যাদি।) ব্যবস্থাদি প্রয়োগ করতে পারবে। আবেদনকারীদের মধ্যে ইউ টি আই, এইচ ডি এফ সি, আই টি সি, টাটা, বিনুভাই, গার্ডনি এন ট্রাভেল, আই সি আই সি আই ইত্যাদিও ছিলো। কেন্দ্র ব্যক্তি মহিলাদের ব্যাঙ্ক খোলার অনুমতি দেওয়ার পর পিয়ারলেস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং এবং নিউ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান আর সি সুলেজাও দরখাস্ত জমা দিয়েছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উভয়ের দরখাস্তই বাতিল করে দেয়।

ইতিমধ্যে হিন্দুজাগোদী, ইউ টি আই (২১/৭/৯৩) আই সি আই সি আই (২১/৭/৯৩) এইচ ডি এফ সি (২১/৭/৯৩) ইত্যাদিরা ব্যাঙ্কের লাইসেন্স পেয়েছে। আই সি আই সি আই (প্রধান কার্যালয় ওয়োদারা) তাদের প্রথম শাখাটি গত ২৪ জুন'৯৪ মারাঠে খোলে একজনও আমানতকারীকে না দিয়ে। অবিশ্বাস্য হলেও এই সত্যটি ব্যাঙ্কিং নিয়ে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। যেখানে আমানতকারীরা হাপাত্রিত হচ্ছেন অশীলায়ে এবং পরিষেবা ছড়িয়ে গেছে প্রত্যন্ত ব্যাঙ্কিং এর নির্দিষ্ট সীমা।

অন্যদিকে ১৯৯২ সালের ২০শে মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের কাছে মারাঠে কমিটি (এস এস মারাঠে) শহরাঞ্চলীয় সমবায় সম্পর্কিতকে রিপোর্ট পেশ করে তাতে শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির লাইসেন্সের বিষয়ে যে ন্যূনতম মাপকাঠি (ভায়াবিলিটি নর্ম) সুপারিশ করেছে, রেজিস্ট্রেশন এবং তালিকাভুক্তিকরণের যে সময়সীমা ধার্য করেছে, শাখা খোলার ক্ষেত্রে যে বাস্তবানুকতা রেখে দেবার সুপারিশ করেছে তার সবগুলিই, বিশেষ করে সমবায়ের দিক থেকে দুর্বল এলাকায় (মূলত পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল) নতুন শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গঠন বা শাখা খোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা-জনক। আসলে নরসিংহম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষাপটে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে অত্যন্ত অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি করে দেওয়ার উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে মারাঠে কমিটির সুপারিশ।

সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হলেও, নরসিংহম কমিটি সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদনে একটি লাইন উল্লেখ না করলেও, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনাদায়ী অংশের (যে অংশের ক্ষেত্রে সুদও অনাদায়ী থাকবে) ঋণ থেকে মুক্তি পেতে নরসিংহম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গত ১৯৯২ সালের ২৭ এপ্রিল যে

নতুন হিসাব পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে তাতে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিরও অনাদায়ী ঋণগুলিকে 'নন্ পারফরমিং অ্যাসেট' (এন পি এ) খাত বিয়ে সেগুলির জন্য উচ্চহারে সংরক্ষণ তহবিল গঠনকে বাধ্যতামূলক করে ব্যাঙ্কের লাভ এবং পরিসম্পদ বিপুলভাবে কমানোর মতলবে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ খেলাপ করে তুলে দেবার ব্যবস্থা নিয়েছে। ফলে, এন পি এ'র লোকসানের বহর কমতে থাকা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জন্য গত ১৯৯৩-৯৪, ৯৪-৯৫ এবং ৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে যথাক্রমে ৫৭০০ কোটি, ৫৬০০ কোটি এবং ৫৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তখন সমবায় ব্যাঙ্কগুলির জন্য বরাদ্দ এক কানাকড়িও নাই। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এন পি এ-র সিংহভাগই ধনিকশ্রেণীকে দেওয়া ঋণ, সেগুলির মধ্যে যা একেবারেই পাওয়া যাবে না তার অংশ মেটাতে এই সরকারি টাকা ব্যয় হবে যা আসে প্রায় সবটাই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছ থেকে পরোক্ষ কর হিসেবে। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি লোকসান করলেও অতটা অসুবিধা নেই বা হয়নি যা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে এই সরকারি দাক্ষিণ্যের সিটেকোঁটা না পেয়ে হাতে যাবে।

ব্যাঙ্কিং শিল্পের নানাবিধ সমস্যা এবং ক্ষেত্রের বর্তমান আর্থিকনীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হয়ে শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কাজ করার স্বাধীনতা খণ্ডিত বা সীমিত হয়ে পড়েছে। এক সময়ে ভারতের যে শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্য পেয়েছিল, যাবতীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে প্রচলিত প্রথাগুলির আমূল পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নতুন পরিবেশে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে চলেছে। বেশিরভাগ সমবায় ব্যাঙ্কই আজ অপ্রাসঙ্গিক, যদিও এদের আর্থিক সংস্থান বা সামর্থ্য কোন অংশেই দুর্বল নয়। যদিও এরা ভারতের সেই ১৪টি শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, যারা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট ১৯৩৫ অধীনে দ্বিতীয় তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তফসিল ব্যাঙ্কের (সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক) মর্যাদাসম্পন্ন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রমাগত বিধিনিষেধ আরোপের ফলে এই তফসিলভুক্ত শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির উপর চাপ অন্যান্য বেশি এবং এই অতিরিক্ত চাপ আসে কর্মপদ্ধতিকে কঠোর সঙ্কুচিত করে তুলেছে। তাই সম্প্রতি তারা তাদের অবস্থা (স্ট্যাটাস) পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) এবং আর বৃদ্ধির জন্য পথ অনুসন্ধানে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমান অবস্থায় এই ব্যাঙ্কগুলি হাতে থেকে যাওয়া অতিরিক্ত (সারপ্লাস লিক্যুইডিটি) টাকার উদ্বৃত্তের বৃদ্ধিও অবধারিত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব চকচকে, বিশেষত ভোগপণ্য ঋণের ক্ষেত্রে, এই ব্যাঙ্কগুলির একচেটিয়া অধিপত্য ছিল। কিন্তু আজ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি মুক্ত বাজার অর্থনীতির স্বাদ পেয়ে এই ক্ষেত্রেও নাক গলাতে শুরু করেছে।

ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক মহারাষ্ট্রের সারস্বত কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (লিমিটেড-বোম্বাই)-এর স্যানেজিং ডাইরেক্টরের সুরেশ প্রভুর মতে "ক্রমাগত আমানতের ওপর সুদের হার কমার ফলে ব্যাঙ্কের লাভও ক্রমশ কমে যাচ্ছে।" ব্যবসার ক্ষেত্র সংকোচনের ফলে ঋণের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকায় ব্যাঙ্কের হাতে অতিরিক্ত নগদ টাকা জমে যাচ্ছে ফলে, আমানত ও ঋণদানের অনুপাতেও (ক্রেডিট-ডিপোজিট রেশিও) তারতম্য ঘটে যাচ্ছে। ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম শহরাঞ্চলীয় ব্যাঙ্ক অন্ধ্রপ্রদেশ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং সারস্বত কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আমানত ও ঋণদানের আনুপাতিক হার যথাক্রমে ৪৫ এবং ৫৮ শতাংশে নেমে গেছে, যেখানে পূর্ববর্তী বছরে ছিলো ৫৩ এবং ৭২ শতাংশ। অন্ধ্রপ্রদেশ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীমতী জন ডি' সিলভা-র বক্তব্য 'ঋণদানের জন্য তেমন কোন ভালো প্রস্তাবই আর পাওয়া যাচ্ছে না।' ডি' সিলভার এই বক্তব্যের সঙ্গে অবশ্য সকলেই একমত নন। ভারতের সর্ববৃহৎ শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক মহারাষ্ট্রই "বম্বে মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক" সূত্রে জানা যায় তাদের ঋণদানের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় ৪৩ শতাংশে বেড়েছে। ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে এই ব্যাঙ্কের ঋণদানের পরিমাণ ছিলো ৩৫৪.০২ কোটি টাকা। ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০৫.১৬ কোটি টাকায়। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীমতী ভাসন "আমরা ঋণদান দেওয়ার নতুন পথ আবিষ্কার করেছি।" তারা বিভিন্ন আবাসন উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে ঋণদান নিয়ে ঋণদান পদ্ধতির নতুন ধারণার প্রবর্তন করেছে। একই আর্থিক বছরকালে (৯৩-৯৪) ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ভেঙ্কটেশ্বর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ঋণদানের পরিমাণও বেড়েছে ৪৬.৮ শতাংশে। তবুও ঋণদানের উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাওয়ায় ফলে বেশিরভাগ ব্যাঙ্কই আমানত ও ঋণদানের আনুপাতিক হারের ক্রমাবনতি রোধ করতে অক্ষম। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির স্বাধীন ব্যবসার কোন সুযোগ নেই, অথচ আর্থিক আমানত বৃদ্ধির হার ২৫ শতাংশে। ফলে ব্যাঙ্কগুলি হাতে জমে থাকা অতিরিক্ত নগদ টাকার উপযুক্ত লগ্নি করতে পারছে না। ঐ বিপুল পরিমাণ আমানতের ওপর গড়-পড়তা মুনাফা মাত্র ৮ শতাংশে। যেখানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিনিয়োগের ঢালাও অনুমতি দিয়েছে সেখানে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আদেশ করে অতিরিক্ত নগদ টাকা জমে থাকা সত্ত্বেও সরকারি মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ পাবলিক সেক্টর বন্ডে বিনিয়োগ করার অধিকার দিয়েছে, তাও অতি সম্প্রতি। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মতো দেনার/ডিবেঞ্চারেও বাড়তি টাকা লগ্নি করতে পারছে না। এর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমবায় মন্ত্রকের নিবন্ধকের অনুমতি প্রয়োজন হচ্ছে। যখন অনুমতি মিলছে তখন বিনিয়োগের সুযোগ হাতছাড়া। কেউ কেউ মনে করছেন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের ক্ষেত্রে বেশি সুদ-সেক্টিসে আমানতে ১ শতাংশে (বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বার্ষিক সুদ ৪.৫ %, শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কে ৫.৫%) এবং মেয়াদি আমানতে .৫ শতাংশে (বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক — ১২ শতাংশে, সমবায় ব্যাঙ্কে ১২.৫ শতাংশ) অতিরিক্ত সুদ দেওয়ার জন্য লেনদেনের চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিষেবা খরচও বাড়ছে ফলে লাভের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি স্বল্প-মেয়াদি আমানতে অধিক সুদ দেবার কথা ঘোষণা করায় শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি থেকে বহু আমানত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে

চলে যাবার আশঙ্কা দেখা দেওয়াতে ফলে আর্বেটাইল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক একই মাসে দু'দুবার আমানতের ওপর সুদের হার পরিবর্তনে বাধ্য হয়। গত ১ জানুয়ারি '৯৫ সুদের হার নির্ধারণ করার পর আমানত-কারীদের চাপের মুখে পড়ে পুনরায় ২৭ জানুয়ারি '৯৫ থেকে স্বল্পমেয়াদি আমানতের ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে সুদ দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে হয়। তারা ৪৬ দিনের স্বল্পমেয়াদি আমানতের ওপর সুদের হার ৭.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০.৫ শতাংশে করতে বাধ্য হয়। একই অবস্থা সরস্বত কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক-গুলির ক্ষেত্রেও ঘটেছে। এই অতিরিক্ত সুদ দেবার জন্য লেনদেনের পরিমাণও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেড়েছে। স্বাভাবিক নিয়মেই পরিবেশ হার বাড়তি সুবিধা পেয়ে লাভের হার কমিয়ে নিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তফসিলভুক্ত ১৪টি শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কের যখন এই অবস্থা তখন অন্যান্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি কি অবস্থায় রয়েছে তা অনুমেয়।

এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই যে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন শুরু থেকেই নানা কারণে বেশ দুর্বল। ভারতের সব রাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্কের বিকাশ একরকম নয়। অনেক রাজ্যেই কোন শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক নেই। এই সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সিংহভাগই গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক ও তামিলনাড়ুতে অবস্থিত। ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও সব জেলাতে এই ধরনের সমবায় ব্যাঙ্ক নেই। পশ্চিমবঙ্গে ১০টি কর্মচারী কলকান সমবায় ব্যাঙ্কসহ মোট ৪৭টি সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। যার বেশির ভাগই কলিন নদীর দুই পাড় বরাবর অবস্থিত। যেমন হাওড়া, হুগলি, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার শিল্পসমৃদ্ধ শহরগুলির মধ্যে পড়ে উঠেছে। বাকি ব্যাঙ্কগুলি নদীয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে ছড়িয়ে আছে। রাজ্যের ৮টি জেলায় কোন শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক নেই। ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে রাজ্যের৪৭ টি শহরে সমবায় ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ ৩৯০ কোটি টাকা। ঋণের পরিমাণ ২৭৫ কোটি টাকা। যাতে অতিরিক্ত জমা নগদ টাকার পরিমাণ ১২০ কোটি। ৪৭টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ২৮টি ব্যাঙ্কের লাইসেন্স আছে। বাকি ১৯টি লাইসেন্সবিহীন ব্যাঙ্কের মধ্যে ৯টি ব্যাঙ্ক চলছে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ব্যাঙ্ক আন্দোলনে সাফল্য একমাত্র সমবায়ীদের প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির জন্য এ পর্যন্ত কিছুই করেননি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দেশ জুড়ে নতুন ধরনের ব্যাঙ্ক খোলার বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে নিজস্ব একটি ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য অনুমতি চেয়ে পেলেন না। তাই তিনি রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ককেই রাজ্যের ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সভা-সমিতি-সেমিনারে, জনসভায় সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন বাড়াবার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাতে শুরু করেন। অথচ সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসারিত পরিষেবা সঠিকভাবে প্রসারের আনুসঙ্গিক উদ্যোগ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত পঞ্চায়েত, পৌরসভা, পাবলিক ট্রাস্ট ইত্যাদি স্বশাসিত ও আধা-সরকারি সংস্থাগুলিকে তাঁদের অতিরিক্ত তহবিল সমবায় ব্যাঙ্কে জমা রাখার নির্দেশিকা না পাঠানো পর্যন্ত ঐ সমস্ত সংস্থা সমবায় ব্যাঙ্কে তাদের অতিরিক্ত আমানত গচ্ছিত রাখতে পারবে না।

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং আইনের আওতায় শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আনার পর তাদের কাজকর্মের গতি প্রকৃতি, স্বরূপতা, পরিচালন ব্যবস্থা ইত্যাদি সমীক্ষার জন্য ১৯৭৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর কে মাধবদাসের নেতৃত্বে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটি (মাধবদাস কমিটি) সমবায় ব্যাঙ্কগুলির শ্রীবৃদ্ধির জন্য একগুচ্ছ সুপারিশসহ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন। তাদের রিপোর্টের ৬৮ নং ক্লজিতে বলা হয়েছে —

"বর্তমান শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক-গুলিতে আমানত রাখার ক্ষেত্রে অনেক রাজ্যে স্থানীয় সংস্থা, আধা-সরকারি সংস্থা এবং অন্য পরিষদগুলির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা আছে। ঐ বিধিনিষেধগুলির আমানত সংগ্রহের ব্যাপারে তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। কমিটি এই অভিমত পোষণ করে যে, অডিট অনুযায়ী 'এ' অথবা 'বি' শ্রেণীভুক্ত শহরাঞ্চলীয় ব্যাঙ্কগুলিতে, স্থানীয় সংস্থা, আধা-সরকারি সংস্থা এবং জনসম্প্রদায়ের অর্থ গচ্ছিতগুলির উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত রাখার অনুমতি দেওয়া রাজ্য সরকারগুলির কর্তব্য।"

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, মাধবদাস কমিটির সুপারিশের পুরো ব্যাপারটি খুব উদ্বেগ করে বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় দপ্তরে গত ২০শে এপ্রিল '৭১ থেকে ২২শে ডিসেম্বর '৯৩ পর্যন্ত (১৪ বছর) অনেক চিঠি অনুরোধসহ দেবার পর বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় দপ্তর থেকে — "বিষয়টি এই দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়" এই ধরনের জবাব পেয়ে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চিফ অফিসার টি এন হরিহরামনী এ বিষয়ে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে উপযুক্ত নির্দেশ দেবার অনুরোধ জানিয়ে এবং ইতি-মধ্যে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হলে সেটা কি ধরনের তা জানতে চেয়ে গত ৯-১১-৯৪ তারিখে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যসচিবদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন (এই চিঠিটি 'আওতার' জুলাই '৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে)। সরকারের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব বর্তায় সরকারের সুদক্ষ, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ, সৎ অফিসারদের ওপর। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিত পথে মাধবদাস কমিটির সুপারিশ পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করা হলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের সূচনা হোত। রাজ্য সরকারের নিজস্ব ব্যাঙ্কের পরিকল্পনার বিলম্ব সহ্যন হোত।

গত ২৭ জুলাই '৯৫ বোম্বাইয়ের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় অফিসে শহরাঞ্চলীয় ব্যাঙ্ক বিভাগের (আর্বান ব্যাঙ্ক ডিপার্টমেন্ট — ইউ বি ডি) অফিসার স্টাফিং অ্যাডভাইসরি কমিটির সভা হয়েছে। ভারতের শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধিতের সঙ্গে আলোচনা এবং সমাধানের উদ্দেশ্যে শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের জাতীয় ফেডারেশন "ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস্ ব্যাঙ্ক ফেডারেশন

সোসাইটিজ লিমিটেড[৭] সম্বেশে 'ন্যাকবার্ড' তাদের কাছে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে আগত সমস্যা সমূহকে প্রস্তাবাকারে গত ২৯ জুন '৯৫ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার কে সীতারামুর কাছে পাঠিয়েছেন। অনুরোধ করেছেন যাতে প্রয়োজন অ্যাডভাইসরি কমিটির আলোচ্যসূচির বিষয়বস্তুরূপে প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করা যায়। প্রস্তাবগুলি সংক্ষেপে এইরকম ঃ

(১) সমস্ত রাজ্যের সমবায় সমিতি সংক্রান্ত আইনে এবং "বহু-রাজ্য সমবায় সমিতি আইন, ১৯৮৪"-তে শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এবং তদারক সমিতি সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজন।

(২) চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যে শীর্ষ শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (অ্যাপেক্স আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক) গঠন।

(৩) 'সমবায় বিকাশের' ক্ষেত্রপটে 'কম বিকশিত' এবং 'সবচেয়ে কম বিকশিত' এলাকা সম্পর্কে ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করা। নতুন শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক সংগঠনের জন্য প্রারম্ভিক মাপকাঠি (এন্ট্রি পয়েন্ট নর্ম) এবং স্বয়ম্ভরতার মাপকাঠি (ভায়াবিলিটি নর্ম) প্রেক্ষিতে এটি প্রয়োজন।

(৪) সমবায় সমিতি সমূহের নিবন্ধক দ্বারা শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কের বোর্ড (পরিচালন সমিতি) বাতিল সংক্রান্ত প্রশ্ন বিবেচনা।

(৫) বর্তমানে যে সব তদারক সমিতিগুলি ব্যাঙ্কির ব্যবসা চালাচ্ছে, সেগুলিকে ব্যাঙ্কির মানে উন্নীত করার জন্য সময়সীমা ৩১শে ডিসেম্বর '৯৭ পর্যন্ত সম্প্রসারণ, যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি মাত্রাতে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আরোপিত পূর্বশর্তগুলি পূরণের যথেষ্ট সময় পায়।

(৬) শহরাঞ্চলীয় ব্যাঙ্কগুলি বন্ড, সিকিউরিটির ওপর যে বিনিয়োগ করে, সেগুলি থেকে অর্জিত সুদের ওপর 'উৎস কাটা কর' (ট্যাক্স ডিডাকশন অ্যাট সোর্স — টি ডি এস) থেকে অব্যাহতি— অর্থমন্ত্রক দ্বারা যথোপযুক্ত প্রদর্শন।

(৭) ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জমার ওপর সুদ ১০০০০ (দশ হাজার) টাকার বেশি হলে (শাখা ভিত্তিক) 'উৎস কাটা কর'-এর যে প্রস্তাব এসেছে (১লা জুলাই '৯৫ থেকে কার্যকর) তার দ্বারা সাধারণভাবে ব্যাঙ্কগুলি যে সমস্যার সম্মুখীন হবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিষয়টি অর্থমন্ত্রকের কাছে উত্থাপন করতে হবে।

(৮) তফশিলভুক্ত শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কাজের এলাকা বৃদ্ধি। সারা দেশেই শাখা খোলার অনুমতি।

(৯) শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কাজের এলাকার মধ্যে শাখা খোলার স্বাধীনতা।

(১০) এল সি এ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানত এবং সরকারি সিকিউরিটি গচ্ছিত রেখে যে অগ্রিম দেওয়া হয় তাকে যেমন 'মাপকাঠি' (নর্ম) বাইরে রাখা হয়েছে অনুরূপভাবে স্বর্ণবন্ধকি ঋণগুলিকেও বাইরে রাখার বিষয়ে বিবেচনা।

(১১) তফশিলভুক্ত শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির 'স্টক ইনভেস্টের' ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া।

(১২) নতুন শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গঠনে এগিয়ে আসা উদ্যোক্তাদের (প্রমোটার) পরিচয় বা তদারক সংক্রান্ত বিষয়ে আরোপিত শর্তগুলির পুনর্বিবেচনা।

(১৩) বর্তমানে লাইসেন্সবিহীন শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা পর্যালোচনা সাপেক্ষে 'ভাল' নয় এমন ব্যাঙ্কগুলিকে যাতে লাইসেন্স প্রদান করা যায় এমন ব্যবস্থার উদ্ভাবন।

আমরা অপেক্ষা করেছিলাম 'ন্যাকবার্ডের' পাঠানো এই প্রস্তাবসমূহ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্টান্ডিং অ্যাডভাইসরি কমিটিতে আলোচনা হয় কি না এবং হলে কি সিদ্ধান্ত হয় তার জন্য। সমবায় ব্যাঙ্কের স্বার্থে পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে ন্যাকবার্ডের পাঠানো সুপারিশের অনুকূলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত নেওয়ার খুব প্রয়োজন ছিল। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল ন্যাকবার্ডের পাঠানো সুপারিশের অনুকূলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্ত নেয়নি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা ভারত সরকারের ভুলে গেলে চলবে না ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি যোগ করে সাংবিধানিক দিক দিয়ে ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং নয়া শিল্পনীতি অর্থনীতির অনুসরণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রসার বন্ধ করে তার পরিধি সংকুচিত করে সমবায় উদ্যোগকে অবহেলা করে তার সামনে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে প্রকারান্তরে গোটা সমবায় ব্যবস্থার বিনাশ-সাধনে সচেষ্ট হয়ে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে অবজ্ঞা করে সংবিধান বিচ্যুতির দায় বহন করতে হবে কি না ভেবে দেখতে হবে।

রাজনৈতিক দল হিসেবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সংবিধান ছাড়াও ১৯৮৯ এবং ১৯৯১ সালে দলের পক্ষে প্রচারিত নির্বাচনী ইস্তাহারে সমবায় উদ্যোগকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতেও ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সে দায়-দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে নেহেরু-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-সুভাষ-নজরুলের চিন্তা ও চেতনার সমবায় ব্যবস্থা থেকে সরে আসা কতটা সমীচীন হবে দেশের শাসন ক্ষমতায় আসীন থাকার পঞ্চম বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী একবার নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন।

▲▲▲

"Civilization is not a matter of mere material possessions or speedy communications. It is a state of mind, a tradition of culture, a sense of values."

Dr. S. Radhakrishnan

Born on 5 Sept. 1888 □Passes away on 17 April 1975

"সবারে করি আহ্বান"
মর্ত্যভূমির ঘাসে ঘাসে আজ রোমাঞ্চ,
'মা' আসছেন, মা দশভুজা,
রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, তাপ, অন্যায়, অবিচার,
এসবের বিরুদ্ধে 'মা'র যুদ্ধ।

নদীয়া সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিক অসাম্য, দারিদ্র্য, সঞ্চয় বিমুখতা,
কর্মহীনতা, গৃহহীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, বিভেদপন্থা এবং সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে।

নদীয়া সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক নদীয়ার মানুষকে দেখিয়েছে আত্মনির্ভরতা উপার্জনের পথ,
শিখিয়েছে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয় গড়ে তোলা।
অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে অসাম্য দূর করতে।
সর্ব ধর্ম এবং নদীয়ার কৃষিজীবী মানুষের সমাহার এ আর ডি বি গড়ে তুলেছে —
এক জাতি, এক প্রাণ, একতা

এই শারদে দেবীর আগমনে সবার জীবন উদ্ভাসিত হোক।
সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি, মৈত্রী ও সমৃদ্ধির আলোকে।।

নদীয়া সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

ভূমিশ্রী ◆ কৃষ্ণনগর ◆ নদীয়া

শাখা অফিস ঃ

রাণাঘাট ◆ কৃষ্ণনগর মেইন ব্রাঞ্চ ◆ তেহট্ট ◆ করিমপুর ◆ বেথুয়াডহরি

এন সি এ আর ডি বি /১৫

অমরতীর্থ অমরনাথ

দেবারতি মজুমদার

অমরতীর্থ অমরনাথ। না ভুবারতীর্থ অমরনাথ? যে তীর্থই হোক না কেন, আমাদের জন্মীয় ভ্রমণ প্রথম উপলব্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেবাদিদেব মহাদেবের 'অমরত্ব' নামধারী তীর্থক্ষেত্রটি। কিন্তু কি ঝামেলা। লোকে বলে মহাদেব নাকি অন্তেতেই তুষ্ট। কিন্তু তোষার তাঁর সেই সন্তুষ্টির লক্ষণ। অনেক কষ্টসহ্য পুড়িয়ে, পর্বতের গাত্রপথে এঁকেবেঁকে আমরা পৌঁছলাম পহেল গাঁও।

নদীর কলতানে মুখরিত, নুড়ি পাথর ভরা, সবুজ, সজীব ঢালানী বেষ্টিত, পাহাড় ঘেরা গ্রাম পহেলগাঁও। অবশ্য বছরে বছরে প্রকৃতি-প্রেমী, তীর্থযাত্রী, ভ্রমণার্থীদের বিলাসক্ষেত্রের হয়ে ওঠার জন্য 'গাঁও' নামটাকে বোধহয় আর না ঘোষ করলেই ভালো হয়। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য চারিদিকে ব্যাঙের ছাতার মত ছড়িয়ে থাকা দোকানপাট, হোটেল, রেস্টুরেন্ট গ্রামটিকে গ্রাম আখ্যা থেকে পরিণত করেছে।

যাই হোক আমার লেখার মূল বিষয় 'অমরনাথযাত্রার' সঙ্গে অবশ্য এর সম্পর্ক নেই। তবুও এখান থেকেই অমরনাথের যাত্রাপথ শুরু। কিন্তু যাত্রা ঘোষণার এবারে আমাদের হল না — এই হতাশাব্যঞ্জক খবরটা যখন আমাদের মনে প্রায় বদ্ধমূল হয়ে উঠতে চলেছে তখনই সামনে হাজির হল সেই ঘোড়াওয়ালা। পহেলগাঁও-এর ২৮নং ঘোড়াওয়ালা নাম তার আবদুল বাট। নিবাস পহেলগাঁও-এর অনুরবর্তী একটি গ্রামে। সে আমাদের অমরনাথযাত্রার দর্শনের জন্য নিয়ে যেতে চাইল। আমরাও দেরি না করে চাইতে অনেক মত তার কথা প্রায় মুখে নিলাম। হ্যাঁ সে ঠিকই বলেছে যে আমাদের অমরনাথের দর্শন করিয়ে নিয়ে আসতে চায়। কিন্তু সে কখনও হয় কি? অনেকে বলতে লাগল, ঘোড়াওয়ালারা অমন বলেই থাকে, তারপর খারাপ রাস্তার ঠান্ডায় পুরো যাত্রা নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু ফেরত এনে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ আদায় করতে ছাড়ে না। আবার কেউ বলল "রাস্তা তো নেই, সব বরফে ঢাকা, পাবলি নাকি? এই ঠান্ডায় কিভাবে নিয়ে যাবে।" কলওয়ালা, ওষুধের দোকান, এমনকি পাহাড়ী পথে যাবার প্রয়োজনীয় সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম যেখান থেকে ভাড়া নেওয়া হবে, সেখানকার জনসাধারণ ও আমাদের নানাভাবে নিরুৎসাহিত করতে লাগল। ট্যুরিস্ট অফিস থেকে তো সরাসরি বলেই দিল — ইউ আর লাইক টু কমিট সুইসাইড। না, আমাদের আত্মহননের কোন ইচ্ছাই ছিল না। তবুও অমরনাথ যেতে আমরা বদ্ধপরিকর। তাই রওনা হলাম।

ও কলতে ভুল হল, শুধু আমরাই নয়, আমাদের কর্ণধার হিসাবে যেখিয়ে ঘোড়া-ওয়ালারা একদিনের আগে এক ছোটখাটো দল যোগাড় করে ফেলল, যারা কেদার না কেদারনাথে অমরনাথে যেতে উৎসাহী। আমাদের সঙ্গী হল জনাকুড়ির এক যুবক-যেতী, এক ওজরাটি দম্পতি, এক বাঙালী পরিবার (যার সদস্য হলেন, এক অবিবাহিত কন্যা, তাঁর এক কন্যা, বাবা যার এসেছে, এবং পুত্র যার বাবা চোখে।) এছাড়া এক বৃদ্ধ যিনি বাংলা ভাষায় বাক্যালাপ করে, নানা কটূক্তি, ডিসেন্টি ও বক্রোক্তিতে আমাদের সমস্ত যাত্রাপথে নিজেকে তথাকথিত বৌদ্ধিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে প্রমাণ করার নিষ্ফল চেষ্টা চালিয়ে নিজের সম্মানকে ধূলিসাৎ করতে কসুর করলেন না। আমাদের পরিবারের পাঁচজনের জন্য চলল সাতটি ঘোড়া, ছয়জন ঘোড়াওয়ালা, যার নেতৃত্বে ছিল আবদুল বাট, এর সঙ্গে তিনদিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য, রসদ, বিছানা, এমনকি তাঁবুটি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হল।

তারপর আমাদের যাত্রা শুরু হল। আমাদের বিরোধী তথা আবদুল বাটের কথা অনুযায়ী আমরা পহেলগাঁও থেকে ভাড়া করলাম এক টাট্টি। উদ্দেশ্য চন্দনবাড়ি অবধি মোটরযানী পথ অতিক্রম করা। আমি আর আমার দিদি তো ঘোড়াওয়ালা সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলাম, তার সিদ্ধান্ত বিরোধী। আমাদের প্রশ্ন কেন আমরা এই ১৪ কিমি পথ ঘোড়ায় যাব না? পহেলগাঁও থেকেই তো ঘোড়া ঠিক করা যায়। কিন্তু আমাদের যাবতীয় উক্তিতো আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই ট্যাক্সিতেই চললাম। সকাল সাতটায় পহেলগাঁও থেকে রওনা হয়ে আটটায় পৌঁছে গেলাম চন্দনবাড়ি। কিন্তু আমাদের ঘোড়া কোথায়, আসে আর না। স্বভাব অনুযায়ী কটূক্তির মাত্রা বাড়তে লাগল। আমরা ভাবলাম সত্যিই ব্যাটা ঘোড়াওয়ালা আমাদের ভালো ঝামেলাই ফেলল। না, শেষ পর্যন্ত ঘোড়া এল এগারোটায়। আমরা ততক্ষণে আমাদের প্রাতরাশ, তথা বলা যায় দিনের বেলার আহারাদি সমাপ্ত করে ফেলে বসলাম চারপায়ী পাহাড়ী জন্তুটির পিঠে।

চলতে লাগলাম চন্দনবাড়ি ছাড়িয়ে যেখানে একটি ছোটখাটো হিমবাহের বুকে ছিদ্র করে ঝিলাপী মতনধারার জল চেষ্টা করছে মেঘ প্রদেশের ক্ষুদ্রাকৃতির ছেলেদের আনন্দ উপভোগ করতে। মানুষে চালানো কাঠের তৈরি ছেদ। এছাড়া অনেকে ছোটিংও করছে।

আমরা এগিয়ে চললাম। পথ ধীরে ধীরে খাড়াই হতে লাগল। পাহাড়ের গায়ে তখনও বেশ পাওয়া অঞ্চল মেষপালক বালকেরা মেষ চরাচ্ছে। একটি ছোট ছেলে আমাদের কাছে পয়সা চাইলে, আমাদের ঘোড়াওয়ালা বলে "এ-ভিক্ষা, যে না সে বর্ণছি," কথাটি বলে ঐ মেষবালককে। মেয়ের মুখের মধ্যে প্রচুর দাম ওখানে। না, পয়সা ঐ বালককে তখন দেওয়া হয়নি, ওকে বলা হয় যদি মেষদের দর্শন হয়, তাহলে ফেরার পথে দেওয়া হবে। পথে পড়ে পিসুটপ (১২০০০ ফুট)। যেখানে উচ্চতা অনেকের কাছেই কাল হয়ে দাঁড়ায়। এই জায়গা অতিক্রম করার সময়। তাই মুখে সজোরে জাতীয় নিম্ন রাখতে হয়। আমাদের কথা ছিল ঐদিন শেষনাগে থাকব।

কিন্তু না ঐ দিন আমাদের 'শেবনাগে' যাওয়া হল না। প্রচণ্ডিক আহ্বান করে মেঘ বসল। সঙ্গে নিয়ে এল ঝিরঝিরী বাদলাকে। ঘোড়াওয়ালার মতে পাহাড়ী পথের প্রধান শত্রু। ঘোড়াওয়ালা আমাদের আরও বলল যে পাহাড়ী পথে বর্ষার মধ্য যুদ্ধে না আসতে। তার মতে যে ভগবান এতদূর টেনে এনেছেন, তাঁর উপর ভরসা করলে, তাঁর দর্শনের জন্য যেন কথাই বলা থাকবে না। সব বাধা অতিক্রান্ত হবে বিশ্বাসের জোরে। ঘোড়াওয়ালারা যে এক একজন কত বড় ভক্ত তা পাহাড়ী পথে তাদের আচার আচরণ দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়।

ধীরে ধীরে ঘোড়াওয়ালার প্রতি আমাদের বিরূপ মনোভাব পরিবর্তিত হতে থাকল। ঠিক হল সেদিন রাতে শেবনাগে না গিয়ে, শেবনাগের ২ কিমি আগে জঙ্গপালেই থাকা হবে। কিন্তু "নানা মুনির নানা মত", তাই সহযাত্রী যুবক বাহিনীর মধ্যে একদল তখনই শেবনাগে গেল এবং তার ফল আমরা পরদিন সকালে তাদের প্রত্যাগমন করতে দেখেই অনুমান করলাম। প্রবল ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে "আগামে বরফ আবার হবে" এই বাণি দিতে দিতে তারা ফিরে চলেছে। বুঝলাম না আসলে বরফ কি হবে। আমার কিন্তু যাওয়া না আবার প্রচেষ্টা। যাই হোক আমরা তো জঙ্গপালেই থাকলাম।

'জঙ্গপাল' জায়গাটি বেশ সুন্দর। চারিদিকে পাহাড়ে বরফের হস্তক্ষেপ খাপ-ছাড়াভাবে বিদ্যমান। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছসলিলা শীতল জলে পরিপুষ্ট লিডার নদী। এই নদীটি অবশ্য পহেলগাঁও থেকেই আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। বলতে ভুল হল আমরাই এর সঙ্গ ছাড়িনি। সে যাই হোক না কেন, জঙ্গপালে আমাদের থাকার স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট হল ইউকনির্মিত, এক বা দুই তলার বিশিষ্ট ভূমির সঙ্গে অর্ধচন্দ্রাকারে নির্মিত, লম্বায় প্রায় ২৫ ফুট এবং চওড়ায় প্রায় ২০ ফুট আকারের দুটি বাড়ি। ওরই মধ্যে আমাদের সকলকে এঁটে সেঁটে, রান্না-বান্না করে, খেয়েদেয়ে থাকতে হবে। কিন্তু প্রবেশ-দ্বারের কাছে গিয়ে প্রথমবারে আমাদের ভেড়ার অভিত্বের কারণে ফিরে আসতে হয়। নীচু দরজা, নীচে, ভেতরে, মানুষের আনাগোনা জন্য থাকায় ওরা ভেতরটাকে ওদের বসবাস করে ফেলেছে। তাই পশু থেকে মানুষের অন্তর নিবেদনকে চলনসই বাসযোগ্য করতে ঘোড়াওয়ালারা বিশেষ তৎপর হয়ে উঠল। তারপর ভিতরে ঢুকে আব্দুল ঘাটের বাহিনী আমাদের জন্য মেঝের টোকরিতে আগুন করে দিল। সূর্যাস্তক্রমে বাঙালীর বাঙালী বন্ধু হিসাবে অপর বাঙালী পরিবারটি আশ্রয় পেল আমাদের আঙিনায়। কিন্তু প্রথম থেকেই ওদের বরফ হতে লালন ঘোড়াওয়ালারা আমাদের বেশি যত্ন করছে। এই নিয়ে তারা তখন থেকে ঘোড়াওয়ালাদের ওপর খিটখিট করতে লাগল। একই রান্নার অংশ ওদেরটা অপেক্ষা-কৃত নিম্নমানের বলে অনুভূত হল। ঘোড়া-ওয়ালারা কিন্তু মুখ বুজে, নিঃসঙ্কোচে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল সকল যাত্রীদের কিভাবে ভাল রাখা যায়।

ঐ রাতে একে ঠাণ্ডার আমরা নিদ্রাদেবীকে বিশেষ করে সঙ্গ করতে পারিনি, তার উপর ঐ পরিবারের শিশুকন্যাটি সারারাত তারস্বরে প্রথমার্ধে পেটে ব্যথা ও শেষার্ধে আমার ভয় করছে, আমি আর ঘুম নামে বলে চিৎকার করতে লাগলো। ঐ অবস্থায় অপরদিকে এক ঘোড়াওয়ালা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পরদিন সকালেই ফিরে যেতে বাধ্য হল। এরমধ্যে বাঙালী মহিলা বারনা ধরলেন ঐ রাতেই অতন ছেলে ওদের খাবার জন্য গরম জল করে দিতে হবে। সুতরাং ঘুম প্রায় হল না, বললেই চলে।

সকাল চারটের বেরোনোর কথা। কিন্তু উঠে দেখা গেল সব ঘোড়া ঠাণ্ডার নীচে নেমে গেছে, অতএব ঘোড়াওয়ালারা ঘোড়া নিয়ে আসতে আবার নীচে গেল। পাউরুটি, চা ইত্যাদি খেয়ে আমরা রওনা হলাম। সেখানে ঘোড়াওয়ালা বেশ রুষ্ট সারারাত ঘুম না হওয়ায়। আশ্চর্য ক্ষমতা ওদের। ওখানেই তখন আমাদের বলল ঐ ভদ্রলোক ছাড়া ঐ পরিবারের আর কারো পক্ষে 'আমরনাথের দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। আব্দুল ঘাটের এক সহকর্মী বলেরা নামের একটি যুবক, বেশ হাসিখুশি মিষ্টি স্বভাবের। সারা রাস্তা মজা করতে করতে চলেছে। সে তো তখন থেকেই ঐ মেয়েটাকে 'রোনেওয়ালা লেড়কী' আর ওদের পরিবারটিকে রোনেওয়ালা পার্টি বলতে শুরু করেছে।

ঐদিন সকাল থেকেই আমাদের সামনে আসতে লাগল নানা ধরনের ছবি। কিছুদূর যাবার পর রাস্তায় যেন অস্তিত্ব পাওয়া গেল না। বরফে চারিদিক ঢাকা, এর মধ্যে আছে চোরা বরফ। নীচে জল থাকায় এগুলিতে ঘোড়ার পা হঠাৎ করে অনেকখানি বসে যায়। ঘোড়াই বাচার পর ওকে নিয়ে চলে। কিন্তু হঠাৎ কিছুদূর যাবার পর ঘোড়াগুলো থেমে গেল। তখন, অগত্যা আব্দুল ঘাট ও তার সঙ্গীরা বেলচা এনে রাস্তা করতে লাগল। প্রথমে ঘোড়াগুলোকে পাহাড়ের গায়ে আড়া-আড়িভাবে, পিছল বরফের উপর দিয়ে টেনে টেনে পার করাতে লাগল, তারপর এক এক বার আমাদের অপেক্ষাকৃত ভাল জায়গা দিয়ে কিভাবে অভয় দিতে দিতে পার করালো — না অভিজ্ঞতা থাকলে লিখে বোঝান সম্ভব নয়। খানিক ঘোড়ায় খানিক হেঁটে, এভাবে কিছুদূর যাবার পর এমন এক জায়গায় আমরা উপস্থিত হলাম যেখানে পাহাড় সংকীর্ণ, খাড়াই মসৃণ বরফে আচ্ছাদিত। বাম অপর পার্শ্বে হাজার দুই ফুট নীচে খরস্রোতা লিডারের শুধু শব্দ শোনা যায়। গভীরতার জন্য দেখা যায় না। পথ নেই, তবুও যেতে হবে, পাশে নামবার একটা রড বেঁকিয়ে রেলিং দেবার প্রচেষ্টা হয়েছিল মাত্র। যথারীতি ঘোড়াওয়ালারা ঐপথে রাস্তা করার জন্য খাড়া বরফের উপর আড়াআড়িভাবে গর্ত খুঁড়তে লাগল। তারপর ঘোড়াগুলোকে একে একে ছাড়া হবে বলে ঠিক করা হল। আমাদের ঘোড়াওয়ালাদের নেতা যেহেতু আব্দুল ঘাট, তেনিং ঘোড়াগুলির মধ্যে সবথেকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হল 'রাজা'। তাই রাজার পালাই প্রথম। "যা রাজা, উঠ্ যা বেটা, সবাস রাজা" এইসব প্রশংসেরসূচক বাক্যের ওপর রাজা চেষ্টা চালালো। কিন্তু হায় রাজার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ। প্রায় অর্ধেক পথ দিয়ে রাজার পিছনের পা স্লিপ করলো সামনের পায়ে টাল রাখতে না পেরে রাজা পড়িয়ে পড়ে গেল। না রাজা পুরো পথ নেমে আসার আগেই তাকে ঘোড়াওয়ালারা টান করিয়ে আবার পাঠালো। কিন্তু রাজা আবারও ব্যর্থ। সেবারা নীচে নেমে ঐ নবযাত্রা শুরুতেই ঘোড়ার রাজা ধরবার জানিয়েছিল, তার মহামূল্যবান জীবনটিকে রক্ষা করার জন্য।

কিন্তু পর পর দুবার বাধা পাওয়ায় রাজা ক্ষেপে গেল। যে কিছুতেই উঠবে রাজি নয়। তাই ডাকা হল রানীকে। রানী একবারেই পার হল সেই দুর্গম পাহাড়ী পথ। আস্তে আস্তে ছাগল, সহদেব, বিবি, সবাই পার হল। না রাজার পালা তখনো আসেনি। তারপর একে একে সমস্ত জনলাকে পার করানো হল অসীম ধৈর্যের সঙ্গে। পরপর ঘোড়াওয়ালারা দাঁড়িয়ে গেল। একজন ঘোড়াওয়ালা এক একজন লোককে অপর ঘোড়াওয়ালা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এভাবে শেষের জন প্রায় টেনে টেনে প্রত্যেকটি লোককে পার করালো। কি অসম্ভব পরিশ্রমী। কিন্তু তখনও এদের মুখে হাসির কণা কেন ভাসিয়ে রেখেছেন। এই পরিশ্রমের বিনিময়ে কি অর্থই বা এরা পায়। দরিদ্রদের তো এদের অবসান নেই। তবুও মুখে মুখে এরা কিভাবে মানুষের পুরুষার্জনের প্রচেষ্টাকে কাজে পরিণত করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ভাবলেও অবাক হতে হয়। তার ওপর বছরের অর্ধেক সময় রাস্তা বন্ধই থাকে। তখন এদের রোজগারের সময় পথই বন্ধ। সমস্ত লোকের পথ পার হবার পর রাজাকে ঘোড়াওয়ালারাই ওপরে তুলল।

কিন্তু রাজা আর আগে যাবে না। আমি ছিলাম রানীর সওয়ারী। রানীই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। আরো কিছুদূর গিয়ে চোখে পড়ল দেবদার। এখানেও রয়েছে জঙ্গলের মতো ঘাসফুলের অস্তিত্ব। মনে হল এই জায়গাটিতে প্রবল শৈত্যের রূপ ফিরে যেতে হয়েছে আমাদের সহযাত্রীদের একজনকে। বিশাল দুই দেবদার। জল তখনও প্রায় জমা। মাঝে মাঝে গলতে শুরু করেছে। তাই জলের নীলচে-ওলিকে আলো বরফের ফাঁকে ফাঁকে অষ্টো-পাসের মতো দেখাচ্ছে। চারদিকে পাথরে ঢোকাও সমুদ্র বা বালাদীর লেশমাত্র নেই। বরফে সমস্যা হয়ে আছে চারদিক। দেবদার ছাড়িয়ে চলতে লাগলাম অমরনাথের দিকে। রাজার অকস্মিক পতন রানীর ঘোড়ার উপরও কিছুটা প্রভাব ফেলল। তাই রাজা-রানী উভয়েই নেতৃত্বের ঘোড়া হাতা করার জন্য সমান দেখে রানী হলা রাজা মাঝে মাঝেই পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু মনিবের সমস্যা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে আমার সে চলতে থাকে। কথায় কথায় জানা গেল এ নিয়ে অমরনাথের দুপুর 'রাজা' এই পথে তিনবার জীবন দিয়ে গেল। তবু করে হলেও আমরা রাজাকে এই রাজার মুখোমুখি নিয়ে গেছে।

যদি মেঘ চারদিকে বরফ আর বরফ। উপরে নীলাকাশে সূর্যিমামা উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু সূর্যের আলো সাদা বরফে এমনভাবে বিচ্ছুরিত হয় যে তাকানো যায় না। তাকালে মনে হয় যেন চোখ ঝলসে যাবে আলোয়। কবির কথায় সুরমিলিয়ে বিশ্লিষ্টকে বলতে ইচ্ছে হয়,

"এত আলো ঝলিতেছে, এই গগনে
কি উৎসবের লগনে।"

এ যেন বরফের মরুভূমি। দু দু মাইল বরফ চলা। তার মধ্যে আমরা চলেছি তো চলেছি। হঠাৎ মনে হল দূরে যেন বরফের উপর কে শুয়ে আছে। কে ও? এভাবে কেন শুয়ে আছে? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন মনে উঁকি দিতে লাগল। দেখা যাক না, কাছে গেলেই প্রশ্নের সমাধান হবে। ধীরে ধীরে লোকটির দূরত্ব কমতে লাগল। এসে দেখলাম সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। ঘোড়াওয়ালারা কাছে গিয়ে ভিড় করল। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বোঝা গেল মানুষটির দেহে আর প্রাণের স্পন্দন নেই। ঠান্ডায় বেশ কয়েকদিন আগেই দেহ থেকে প্রাণ নামক সচেতন পদার্থটি বিদায় নিয়েছে। ঘোড়াওয়ালারা বলল লোকটি স্থানীয় (কাশ্মীরি) নয়। অন্য কোন জায়গা থেকে পুণ্যার্জনের আশায় এসেছিল। আমাদের সকলেরই কেন মন খারাপ হয়ে গেল।

অজানা পথিক অজানাই রয়ে গেল। দেখলাম ঘোড়াওয়ালারা কেউ নির্মম। লোকটি এভাবে একা পড়ে আছে আত্মীয় পরিজন হয়ত জানেও না এই শেষ পরিণতির কথা। "কেন, এত নিষ্ঠুর কেন তুমি, দেবদিনেশ?" চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়।

আস্তে আস্তে লোকটির চিহ্ন প্রায় চাপাই পড়ে গেল পথের সৌন্দর্যে, এখান থেকে আবার পাহাড় খাড়াই হয়ে উঠেছে। বরফে তো কোন পথই দেখা যায় না, তবুও ঘোড়াওয়ালাদের অভিজ্ঞতা পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করে। ঘন্টা কয়েক পর, এই পথে একজন যে একটি বাচ্চাকে নিয়ে ভুল করে পাশের অন্য পাহাড়ে চলে গিয়েছিল। তারপর পথ চিনতে না পেরে ফেরত আসে। ওরা বলে আর পনেরো দিন পরে এলেও এই চেহারা প্রকৃতির থাকবে না। সমুদ্র পথ, আর সূর্যের তাপের চেহারাই বদলে যাবে তীর্থ পথের। তখন আলা কোন স্থানীয় কাছেই বিশ্বাসযোগ্য হবে না পনেরো দিন আগের এই রাস্তার চেহারা।

এরপর পড়ে মহাগুনা গিরিপথ। সাদা বরফে আর নির্জন নীলাকাশের সাদা মেঘের ভেলা যেন এখানে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এরপর আসল চালু রাস্তা। কিন্তু এটাও পথ খাড়াই ঘোড়া শুদ্ধ যাত্রীদের এনে ঘোড়াওয়ালারা ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত। তাই বিশ্রাম নিতে হল। কিন্তু আমাদের মতো বিলাসী তীর্থযাত্রীর দল চাঙ্গার ঘোড়ার পিঠে পাঁতে যেন কাবু, ভয়ে ভয়ে গরম পোষাকের আয়োজন তেমন করেও, সেখানে ওদের গরম পোষাক নেই বললেই চলে।

পরের চালু পাহাড় আমরা রেনকোটের উপর বসে, স্লিপ চড়ার ভঙ্গিতে নেমে এলাম। চড়াই উৎরাই পথ, পুনঃ পুনঃ অতিক্রম করে কিছুটা হেঁটে কিছুটা ঘোড়ার আমরা এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে বরফ তখনই গলতে শুরু করে পথকে আরো পিচ্ছিল থেকে থেকে দুর্ঘটনার সৃষ্টি করেছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদীর উপর সরু কাঠের তক্তা পাতা, পাঁকোয় আকারে। সেগুলি আমরা হেঁটে পার হই। আর ঘোড়াগুলি জলের মধ্যে দিয়ে সাঁতরে সাঁতরে পার হয়। এইভাবে আমরা পৌঁছলাম পঞ্চতরণীতে। আর মাত্র পাঁচ কিলোমিটার বাকি, না এবারে মনে হচ্ছে অমরনাথ সত্যিই আমাদের দর্শন দেবেন।

কেন জানি হচ্ছিল, সারা পথের এত সুন্দর শোভা, পাহাড়ের পর পাহাড় যেখানে তার চিরন্তন গাম্ভীর্য বজায় রেখেছে। কিন্তু তার গাম্ভীর্য কখনো তার অপরূপ রূপ লাবণ্যকে ব্যাহত করেনি। সাদা বরফ যেন প্রসাধনের প্রলেপ দিয়ে তার সৌন্দর্যকে আরো অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এত বরফ চারদিকে। অজানাই রয়া যায় না, তখন চিন্তা করি প্রচন্ড গরমে মধ্যগগনে সূর্যিমামার ভীষণ প্রভাবে, গ্রীষ্মকালের এক দুপুরে সমস্ত বরফে জমা আইসক্রিমের জন্য আমাদের অর্থ ব্যয় করতে হয় এই কলকাতায়। এটা যোগাড় করে তখনো কেউ ব্যাগ্যা করতে পারত যদি সে হোত রাজস্থানের মরুময় প্রান্তরের বাসিন্দা।

ভগবানের এই কারখানার জন্য না হৈচৈয়া ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়।

যাই হোক পঞ্চতরণীতে পাঁচটি নরের সমবয়লে আমাদের রাতের থাকার ব্যবস্থা হবে বলে ঠিক হল। তখন বাজে প্রায় দেড়টা। আমার বাসস্থানের ঘোষণা করার জন্য একজন ঘোড়াওয়ালা থেকে গেল। আবদুল ঘটিত থাকল করণ বরফে সূর্যের প্রতিফলিত কিরণে তার চোখে সাময়িক হয়েছে। সে চোখই খুলতে পারছে না। আমাদের নেতা হল এখন অন্যেরা। ঘোড়াওয়ালারা ইতিমধ্যেই আমাদের প্রায় বন্ধু হয়ে গেছে।

আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো এ পথের যাত্রী হয়েছিল, তারাই এবার ধরা ধরল। আমি তো খুব জোরে ঘোড়াওয়ালাদের বলতে শুনেছি, তোমরা কিছু জান না বাঙালী পরিবারটির তো সকলেই পৌঁছোবে, তোমরাতো প্রথমেই ওদের বাদ করে রেখেছিলে। ও, একটা জিনিস বলা হয়নি। পঞ্চতরণীর পথির ঠাণ্ডা জলে অনেকেই অতিরিক্ত মজার পুণ্যের সংযোজন করার জন্য স্নান করেছিল। আমাদের পরিবারের কারো ঐ ঠাণ্ডায় স্নান করার মত ইচ্ছা, প্রচেষ্টা, বা শক্তি কোনটাই হয়নি। যাই হোক চলতে চলতে হঠাৎ কেন জানি না বাঙালী ভদ্রমহিলার ঘোড়াটি পথ থেকে ছিটকে পাশের নদীর নুড়ি অধ্যুষিত পথে ডিগবাজী খাওয়ার ভঙ্গিতে ঘুড়িনবার পাক খেলো। ভদ্রমহিলার ঘোড়ার পিঠে থাকায় তিনিও ঘোড়ার অনুরূপ পাক খেয়ে বঞ্চিত হলেন না। আকারে ভুল সেবকল হবার জন্য বোধ হয় বেশি লাগল না। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়াওয়ালাকে প্রথম বর্ষণের ন্যায় গলাগাল দিতে লাগলেন। ঘোড়াওয়ালাদের কাছে ওদের গলাগাল এমন পর্যায় চলে গিয়েছিল যে ওরা তখন ওদের গলাগাল শুনেও সমানে হাসত। ভদ্রমহিলার বাঙলা ও হিন্দি মিশ্রিত বহু কথিত ভাষায় এরকম উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখে স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গলাগালির মাত্রা উপর্যুপরি বেড়েই চলল। মায়ের এই করুণ পরিস্থিতি দেখে ভীত শিশু কন্যাটি আবার তারস্বরে চিৎকার জুড়ল, "মা, আমিও পড়ে যাব, ওরা একদম কথা শোনে না, খালি খারাপ রাস্তায় ঘোড়াকে নিয়ে যায়" এবং কথাটিই শেষে তার ভবিষ্যতের বিষয় থাকলো আমি আর যাব না তোমরা ফিরে চল।" আমার অনুরোধ করে আমার সাথী এগিয়ে চলতে লাগল।

পথ ক্রমশ খাড়াই হচ্ছে। রাস্তাও খারাপ হতে লাগল। পাশে 'অমর গঙ্গা' কে সঙ্গে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে সমস্ত পাহাড়ের গায়ে তৈরি আঁকাবাঁকা রাস্তাকে ঘুড়ে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত খাড়া হিমবাহের অস্তিত্ব দেখা যেতে লাগল। আর পা দিয়ে ঘোড়াগুলো এঁকেবেঁকে এপাশে হেলে, ওপাশে হেলে, সামনের পায়ে, পিছনের পায়ে, সমতা বজায় রেখে হেলে-দুলে মাঝে মাঝে চলার কাঁসুনির সঙ্গত করে এগিয়ে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে খাড়া পথে ওঠার সময় নীচের নদীর দিকে চোখ গেলে আমারও ভীষণ ভয় করছিল। আমরাই শুধু নয় বাচ্চা থেকে বুড়ো অনেকেরই মাঝে মাঝে তারস্বর কণ্ঠের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। দুর্গম প্রকৃতিকে জয় করবার নেশায় আমরা এগিয়েই চলেছি। এই পথে আরো তিন সহযাত্রীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হল। যাদের একজনকে ঘোড়াওয়ালাদের বেশ পরিচিত দেখলাম — নামটা জানা হয়নি — ঘোড়াওয়ালাদের সম্বোধনে — 'চৌধুরী সাব।' বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব। হোটেলের মালিক, তারাও অমরনাথের পথে তাঁবু, গরম জামা ইত্যাদিও ভাড়া দেন। এগিয়ে চলেছেন অমরনাথে চলেছেন। দেখতে অনেকে তীর্থযাত্রীদের মতো রাস্তা এখন আছে কি না। আর একজন হলেন দিগম্বর মুখার্জি, তিনি কলকাতাবাসী এবং শিবের এক বড় ভক্ত। প্রতিবার সাদা বৈশাখ জৈষ্ঠমাস শিবের মাথায় জল ঢেলে এবং নিয়মিবাসী থেকে এই সময় অমরনাথে আসেন। তার কথা অনুযায়ী "বাবা এইসময় আমাকে বিশেষভাবে টানে।" ঐবার ভদ্রলোককে আটকান হল। জানি না ভদ্রলোককে "বাবা" আর কতবার টানবে। আর কতবারই বা তিনি এই দুর্গম বাধা অতিক্রম করে অমরনাথে পৌঁছতে সক্ষম হবেন।

আমরা এগিয়ে চললাম ঘোড়ার পিঠে চেপে। কিন্তু একি? ওরা দাঁড়িয়ে আছে কেন? একটি মুসলিম কলম সামনে আমার কেন রাস্তাই নেই, ওদের ঘোড়াওয়ালারা বলেছে যাওয়া অসম্ভব। তাই ফিরে যেতে হবে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এতখানি এসে আর মাত্র আড়াই কিলোমিটার পথের জন্য আমরা হবে না, আমাদের বয়েসী মনের এইরূপ বিমর্ষ ভাব বুঝতে পেরে কলম "আমি দেখতে আসি, আর যাওয়া যাবে কি না। ও চলে গেল, খানিকবাদে ফিরে এসে বলল, হ্যাঁ কিছুটা রাস্তা খারাপ আছে আর ঐ পর্যন্তটুকু ঘোড়ায় না গিয়ে হেঁটে যেতে হবে, তারপর ঘোড়ায় চড়ে খানিকটা যাওয়া যাবে।

আমাদের সঙ্গে তখন মাত্র তিনজন ঘোড়াওয়ালা, লোক আমরা পাঁচ জন। মাঝে মাঝে রাস্তার ধরন বদলে, জলে-কাদায় এক হয়ে গেছে। পা পিছলে পা বসে যাচ্ছে। আবার কোথাও বা কাদা মেখে পথেরই কোন অস্তিত্ব নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ঐসব অঞ্চল পার হতে হয়। মজাদারটি এইসব অঞ্চলগুলো ঘোড়াওয়ালারা অত্যন্ত সুকৌশলে, যত্নের সঙ্গে অভয় দিতে দিতে পার করে থাকে। এইভাবে কিছুটা পথ পার হবার পর সামনে পেলাম একটা বিশাল হিমবাহ। এইভাবে দুর্গম পথ পার হতে হতে আমাদের সাহস বেশ বেড়েই গিয়েছিল। আমরা মিথি সবার আগে যাবার জন্য পা বাড়াল। হিমবাহটা খুব খাড়াই। আগের একটাকেও এত দুর্গম বলে মনে হয়নি। এটার তলার অংশ পর্যন্ত গভীরতার জন্য দেখা যাচ্ছিল না।

মিথির অতি উৎসাহের সাক্ষী হিসাবে আমিও মিথির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। যদিও মিথিকে নিয়ে চলতে লাগল। মিথিকে উপরের দিকে রেখে, নিজে নীচের দিকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থায় থেকে ও পার করছিল। ওরা ধীরে এগিয়ে চলেছে, ধীরে ধীরে। না যাবার পথে পেরিয়ে গেল। কিন্তু, — এরপরই হল বিপদের সূত্রপাত। মিথির একটা পা হঠাৎ পিছলে গেল, যদিও প্রাণপণ চেষ্টা করল ওকে টেনে তোলবার। কিন্তু না, ও পারল না, দুজনেই স্লিপ করল। প্রথমে যদিও মিথির হাত ধরেছিল, যাতে ছিটকে না পড়ে। কিন্তু পরে ও হাত ছেড়ে দেয়। চোখের সামনে দেখছি দুজনে গড়িয়ে পড়ছে। ক্রমশই নীচের দিকে চলেছে। প্রাণপণে দুহাতে মাটি আঁকড়াবার চেষ্টা করছে। উঃ সে কী ভয়ানক দৃশ্য। মনে হচ্ছে এখনও গা শিউরে ওঠে। ভয়ে আমি

আর্তনাদ করে উঠলাম। এরপর দেখলাম ডুলো আটকে গেল। কিন্তু মিলিকে আর দেখা গেল না, গভীরতার জন্য। ডুবে আমরা উপরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের এক সহযাত্রী ছুটে নীচে নেমে গেল ওকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু সবাই বারণ করল। বলল "ওভাবে যাওয়াও যাবে না, নিজের প্রাণটাও যাবে। পরিস্থানে কানে এল "ডুবগিরি"। ছাঁ আটকে গেছে। সবাই তো কেন আগেই দেখেছিলাম না। ডলপপন প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। এই অবস্থায় ঐ পথ দুটি যেমন আমাদের ডুব ডুবারে প্রাণের সকার করল। এর পর ঘটল আমাদের সামনে কয়েকটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা। ডলেরা গিয়ে মিলিকে তুলে আনল। কিন্তু নিয়ে গেল হিমবাহটির অপর প্রান্তে। হঠাৎ দেখা থেকে অদৃশ্য শক্তির মত উদয় হল দুই মিলিটারির।

ওরা মিলিকে তুলে নিয়ে কি কেন বোঝাতে লাগল। এদিকে তো আমিও অপর শিশু কন্যাটির মতো বায়না করেছি যে যাব না। অভিভাবকেরাও কি করবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না, আকস্মিক একটা দুর্ঘটনার পর। ছাঁ ও ওখানে না আটকালে তাহলে নীচের মুড়ি পাথর অন্যায়িত অবস্থলে পড়লে ওকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

হ্যাঁ, সেই আশ্চর্য ঘটনার কথা বলছিলাম, মিলিটারি দুজন কেলটা নিয়ে ঐ হিমবাহের উপর সুন্দর পথ করে দিল। আমাদের তখন প্রশ্ন হল, ওধুতো এটা পার হলেই হবে না, পরের পথটাও তো যেতে হবে। কিভাবে যাব? মিলিটারিরা বলল আমাদের বাকি পথ তৈরি হয়ে গেছে। ওধু এইটুকুই হয়ে ছিল না, আর আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা, সোমবার, বাবার অবতার, এদিনে দর্শন হওয়া ভাগ্যের কথা। আর ভয় এইটুকু পথ যাবে না। ওরা তখন ওখান থেকেই একটা গুহা দেখালো। আমরা তখন গোটনার পড়েছি, যাব কি যাব না, কিন্তু মিলিটারিদের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঐ মিলিটারিদের সঙ্গে একটা সুন্দর কালো লোমওয়ালা কুকুরও দেখলাম। ঐ চারপাশে বরফ অন্যায়িত, দুর্গম, জনপ্রাণীহীন পথে কুকুর যে কোথা থেকে এল কে জানে! আমাদের যাবার সিদ্ধান্ত নিতে নিতে ভর হয়ে গেল ডুবারপাত। ঘোড়াওয়ালারা বলল রোজ এই সময় ডুবার পড়ে আর বিকেলে এক আধুর সময় পৌঁছা ডুবার চারদিকে আবৃত হয়ে থাকে। ঘোড়া চলতে পারে না। পা পিছলে বরফে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তাই যেতে হলে তখনই যেতে হবে। আমরা ঐ সময় যাব। ডুবার গলবে না। তাছাড়া। মিলিদের জন্য আমরা রসদে টান পড়বে। আর ফিরে থেকে আসা ঘোড়ার খরচও ডুবিয়েছে।

যাই হোক, আমরা চলতে লাগলাম। মিলিটারিদের বদৌলতে ঘোড়াওয়ালারা আবার ঘোড়াও নিয়ে এল। কিন্তু আমরা চলতে থাকলে ঐ পথের স্রষ্টা হয়েও দু'জন মিলিটারি কোথায় অন্তর্ধান হল টেরও পেলাম না। তখন আমাদের চলক সঙ্কল। সত্যিতো এ পথে তো হঠাৎ করে কেন মানুষের আসা সম্ভব নয়। তাহলে ওরা এল কোথা থেকে। আর কোথায় ওদের তৈরি রাস্তা? চারিদিক তো বরফে পরিবৃত। কয়েক দিনের মধ্যে যে ওখানে কেন মানুষ এসেছে সেখে তো মনে হল না। আর ওদের চিহ্নও দেখলাম না। ওধু তাই নয়, ওদের তাষায় বর্ণিত পাঁচ মিনিটের পথের তো অন্ত নেই। তারপর ডুবার কমের মাত্রা বাড়তে লাগল। চার পাশ থেকে এলোমেলোভাবে প্রথমে পৌঁছা ডুলোর মত, পরে শিলার মতো ডুবার পড়তে লাগল। আমাদের বর্ষাতিওলো আমাদের ও ঘোড়াকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হল। এইরকম ডুবারপাতের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকলে ঘোড়া মারা যায়। তাই ঘোড়াওয়ালারা খুব তাড়াহুড়ো করতে লাগল। পাঁচ মিনিটের পথ পার হবার করতে আমাদের প্রায় একঘন্টা লেগে গেল। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। চারিদিকে বরফে ঢাকা পথহীন ডুবারপথে আমরা চলেছি ডুবার বৃষ্টির মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যে আমাদের দেহের উপর এক একটা করে ডুবারের চুড়োও তৈরি হয়েছে। দেবাদিদেব কেন দর্শন দেবার জন্য আমাদের নতুন পোষাকে সজ্জিত করে তুললেন। চারদিকে পৌঁছা তুলোর মত নরম বরফ ভর্তি হয়ে গেছে। তাদের গভীরতাও বেড়ে চলেছে।

শেষে মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি আমাদের কর্ণ-গোচর হল। বোঝলাম এবার সত্যিই দেখা দেবেন মহেশ্বর। তারপর বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই ওহার দর্শন মিলল। এরপর আছে সিঁড়ি ভেঙে ওঠার পালা। ততক্ষণে মৈত্রার আমাদের হাত পা জমে গেছে। বিশাল সিঁড়ির উপরে ওঠে ওঠে বরফ পাতলারার আকারে পথ পিছল হয়ে গেছে। আমরা সেই সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলাম। চলেছি তো চলেছি। শেষ নেই যেন। এ যেন স্বর্গের সিঁড়ি। তারপর পেলাম প্রকৃতির আড়ম্বরে ভূষিত, স্বয়ম্ভিত দেবাদিদেবের বিশাল অন্যায়ান সেই ছল।

প্রকৃতিগতভাবে কিভাবে যে এভাবে কৌটা কৌটা জল পড়ে ওহার মধ্যে এরূপ শিবলিঙ্গ তৈরি হয় তাবলেও আশ্চর্য লাগে, অভিভূত হতে হয় এর কথা তাবলে। ওধু শিবই নয়, পাশে এই অনন্যসব বিগ্রহিত তীর্থ-ক্ষেত্রে গৌরী-গণেশকেও সঙ্গে রাখতে ভোলেননি তিনি। পাশে গৌরী এবং গণেশের দুটি মূর্তি একইরূপে গঠিত হয়। এ যেন কাঁচের গেলাসে (গ্লিসারিন) তৈরি তিনটি পৃথক লিঙ্গ। ওধু এদের মধ্যে থেকে আলাদা সন্ধানে ভূষিত হয়েছেন শিব তাঁর ত্রিশূলের মাধ্যমে। আমাদের মতো তীর্থযাত্রীরা নিয়ে যায় কিছু ফুল-বেলপাতা-দুধ, যার আড়ম্বরে তারপাটিকে মনপছন্দ চিরাচরিত প্রথায় তীর্থক্ষেত্ররূপে সাজিয়ে তুলেছে তারা ভালবাসেন। ভালবাসেন নিজের মতো করে ভক্তির অর্ঘ দেবতার পায়ে সমর্পিয়ে দিতে।

ও, বলা হয়নি। না, সত্যি, সবাই অমরনাথ অবধি পৌঁছায়নি। ঘোড়াওয়ালাদের ভবিষ্যদ্বাণী মতো ওধু বাঙালি ভদ্রলোক, ওড়িয়াটি দম্পতি, চৌধুরি সাব এবং মিঃ মুখার্জি এবং তার বন্ধুই ওধু পৌঁছেন। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা আমাদের পাঁচজনই এই পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমার মিলির পড়ে যাওয়া এবং যাত্রাপথের তয়াবহতার মতো অনুবঙ্গিক ব্যাপারকে অগ্রাহ্য না করতে পেরে বাকি সহযাত্রীরা ফিরে যায়।

ঘোড়াওয়ালারা এরপর আমাদের তাড়া দিতে থাকে ফিরে আসার জন্য। আমরাও আমাদের পথ নির্দেশকদের কথানুযায়ী প্রত্যাগমন করি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কেবার পথে একই রাস্তাকে আর তেমন তয়াবহ মনে হচ্ছে না। বোধহয় অমরনাথের দর্শন আমাদের মধ্যে এই বাড়তি সাহসের সঞ্চার করেছিল।

পঞ্চতরণীতে কেরা অবধি সারা রাত্তা যন্ত্রণা আমাকে খুব জ্বালাতে লাগল। বলতে লাগল মিলি পড়ে গেলে আমি কিভাবে চেঁচাচ্ছিলাম। মিলির মুখে বাঙলা তাষায়

নিজের আর্তনাদকে কেন মিষ্টি-মধুর বলে মনে হয়েছিল। ও খুব করে আমাদের কাছে বাংলা গান শুনতে চাইছিল। কিন্তু যাত্রাপথের কথনো শেষ পর্যন্ত আর শোনান হয়ে ওঠেনি।

আমরা পঞ্চতরণীতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সব ঘোড়াওয়ালারা মিলে আমাদের অবস্থানীর সমস্যর করতে লাগল। অসুস্থ আবদুল বারবার আমাদের কোন কষ্ট হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তারপর গরম চা, খাবার খেয়ে শোবার আয়োজন করা হল। এখানেও গোলাকৃতি ঘর। কিন্তু জন্তপালের সঙ্গে পার্থক্য হল এগুলি দোতলা। নিচে ঘোড়া-ওয়ালারা আর উপরে আমরা থাকলাম। কিন্তু ওদেও হবে কি? ঘুম আমাদের হল না। প্রবল ঠান্ডা যেন আমাদের না শোয় শুতে না শোয় বসতে। অতঃপর সারা রাত যাত্রাপথের শোনা অমরনাথ দর্শনের আনন্দ ও অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করে রাত কোন তাড়াতাড়ি কেটে গেল।

সকালে উঠে শোনা গেল। একে একে 'মহাগুনা পাস,' 'শেষনাগ', 'জন্তপাল', 'পিসুটপ' হয়ে আমরা চন্দনবাড়ি ফিরে এলাম। একটি কথা শুনতে কত ছোট লাগে না। কিন্তু যাত্রাপথের কথা চিন্তা করলে রোমাঞ্চে গায়ের লোম যেন সচেতন হয়ে ওঠে।

জানি না, সত্যি ভগবান বলে কিছু আছে কিনা। তবে যা দেখলাম তা যে কোনদিন ভুলতে পারব না তা হলফ করে বলতে পারি। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য থেকে শুরু করে মানুষের মানসিকতার বৈচিত্র্যে অনেকটাই নজর কাড়ার মতো। আর সবশেষে বলতে ইচ্ছা করে সত্যি আজও এই পৃথিবীতে আবদুল, জলেরা, এরা কঠোর নৈপুণ্যে কিভাবে অমর পরিশ্রম করে হাসি মুখে বাঁচার এই কঠিন লড়াইকে মেনে নিয়েছে। এদের কথায়, "প্রতিটি অভিযানের প্রথমে আমাদের জানা থাকে না ফিরব কিনা।" কিন্তু তাহলেও খারাপ লাগে, এরকম মানুষদের ঠকাবার জন্য একশ্রেণীর তথাকথিত ভক্ত, তীর্থযাত্রীর দলও এইপথে পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় যায়। আমাদের সহযাত্রী এরূপ এক বা একাধিক দলের এরূপ ব্যবহারের কথা ওদের মুখেই শুনি। এদের মধ্যে যে দেবতার অধিষ্ঠান, তা যেন এদের সঙ্গে থাকলেই মর্মে উপলব্ধি করা যায়। এদের কথায়, সৌহার্দ্য, প্রীতি ভালবাসা নিয়ে এরা যেন মূর্তিমান ভগবানের প্রতীক। হ্যাঁ, পহেলগাঁও থেকে চলে আসার সময় আমার সত্যি খুব খারাপ লেগেছিল শুধুমাত্র এই কথা ভেবে, যে এদের সান্নিধ্য আমরা হয়ত আর কোনদিন পাব না।

▲▲▲

Enjoy Comfortably at our
Holiday Home At Derjeeling

Please Contract :

West Bengal Fire Services Co-operative Credit Society Ltd.

41/42 William Kerry Sarani (2nd floor)
(Lalbazar Fire Station)
Calcutta - 700 001
or
136, C. R. Avenue
Calcutta - 700 073
Phone : 248-4545 Ext. - 3

With Best Compliments From

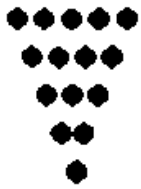

CENTRAL BANK OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

10, Nellie Sengupta Sarani (1st floor)
Calcutta - 700 087
Phone : 244-6789
Telegram : "CENTSAMABA"

- Serves above 7000 Members in Eastern India
- Offers Loan facility Rs. 30,000/- (Maximum)
- Runs Eight Holiday Homes at :

Puri, Rajgir, Bakkhali, Calcutta, Darjeeling, Digha, Benaras & Santiniketan

Extends many more facilities under Social Benefit Schemes.

Amitava Basu
Secretary

Provash Chakraborty
Chairman

- মুক্ত অর্থনীতির ঘোড়ো হাওয়ায় অনেক কষ্টের সঞ্চয়কে উড়তে দেবেন না।
- নিশ্চিত সংরক্ষণ ও নিশ্চিত হারে সঞ্চয়কে বর্ধিত করার জন্য

।। সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সঞ্চয় করুন।।

- সুদের হারও বেশি
- তৎক্ষণাৎ ঋণ পাওয়ারও সুবিধা

এবং

- নিরুদ্বেগ সংরক্ষণ

উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৮, শ্রীধর চক্রবর্তী স্ট্রিট, উত্তরপাড়া, হুগলি

ফোন : ৬৬৩-১৭৯৮

গল্প

পিছুটান

দিব্যেশ লাহিড়ী

খাবারটা ছিঁড়ে নেবার কি আকর্ষ রকমের ইচ্ছেতে হয়ে গিয়েছিল সে কথা তখনো আরও খানি পার সুবলের। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। এও কি সম্ভব। দল, মন্ত্রী, মন্ত্রণা কিংবা প্রত্যাবর্তনী পুঁটি অথবা অর্থ — যেন দিক থেকেই তার জোর নেই, তার কপালে লিখে রেখে কি চমৎকার ছাপার। এই মূলে এই সময়ে যখন সবকিছুই হারানোর দিকে তখন একজন অতি সাধারণ মানুষের জন্যে প্রাপ্তি যোগ অবিশ্বাস্য ঘটনাই বটে। বন কাটাতে মিনিট দুই লেগেছিল। তারপর আনন্দোল্লাস প্রকাশ করতে গিয়ে গলা দিয়ে যে বিচিত্র আওয়াজটা বেরিয়েছিল তাতে মালতী চমকে উঠেছিল, অবাক হয়েছিল, ভয় পেয়েছিল।

এটো হাতেই ছুটে এসেছিল — কি হল? শরীর খারাপ লাগছে?

আনন্দে উত্তেজনায় সুবলের মুখে তখন কথা নেই। হতচকিত বিহ্বল দৃষ্টি। যেন হুকুমে চিঠিটা মেলে ধরেছিল — চাকরি! অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। কাল পরশুর মধ্যেই জয়েন করতে বলেছে। মাইনে এখন সেড় হাজার টাকা পরে আরও বাড়বে।

মালতী অভূতভাবে তাকিয়েছিল। সে অবশ্যের শেষ সম্বল ছিনতাই হয়ে যাওয়ার ভয়। — তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

— কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ, পরিষ্কার আমার নাম লেখা।

মালতী অবাক হয়ে বাঁ-হাতে চিঠিটা উল্টে-পাল্টে দেখেছিল।

— ভুল করে দেয়নি তো! আসলে ওটা হয়ত অন্য কারও।

আজ এখানে এইভাবে স্থির হয়ে আকাশের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় তার কথা সত্যি হলে হয়ত ভালই হত। চাকরি ইন্টারভিউর পর পর তিন-চার বছর ধরে কম কষ্ট আর হয়রানি তো হয়নি। কিন্তু দিন তো কেটে গেছে। এ সমস্যা সে সমস্যা, কত ভাবনা আর ভালোমি, একে ধরা, ওকে খোসামোদ করা — অন্ধ থেকে মালতীর গয়না, ঘরের টুকটাক আসবাব, শেষে পৈতৃক ভিটেটুকু পর্যন্ত চলে গেছে। কিন্তু সব গেলেও ওই অভাব অনটন মুহূর্তের জীবনে এক ধরনের মুহূর্ত গতি ছিল। ছিল প্রাণের স্পন্দন। কোথায় যেন নেই জীবন। একটা ঘুণধরা অসাড়তা মানুষ পাথরের মূর্তি হয়ে দিন কাটাচ্ছে একথা তখনে যে বাচ্চাও হেসে ফেলবে!

হাসতে নিজেও হাসতে পারল না সুবল। নিজেকে শাসন করল — পাগল। তুমি এখন ডিটেচিতে। সুতরাং রামলক্ষ্মণের ছলনা।

সত্যিই এটা একটা সাংঘাতিক সমস্যা। প্রথম ক'মাস যে কি ভয়ানক অস্বস্তিতে হয়েছে তা আর বলবার নয়। সব কিছু দেখেও অন্ধ। হাসা কাঁদা বলা নড়া — কিছু চলবে না। চোখের পলকও সুযোগ বুঝে ফেলতে হবে। যাতে কেউ টের না পায়। আজব চাকরির আজব কায়দা-কানুন। মকে এইটুকুই যে, ঢোলা ঝুঁরি, বিশাল পাগড়ি আর ইয়া বড় গল্প পাঁয়ার আড়ালে থাকার অনেক পরিচিত জনও চিনতে পারে না। সন্দেহের দৃষ্টিতে দু-একবার তাকিয়ে ভাবে আশ-পাশের অন্য মূর্তিগুলোর মত এটাও পাথরের। চাকরিতে বহাল হওয়ার ক'দিন পরেই রামলক্ষ্মণের পানের আড়তের বীনবন্ধু আর কার্তিক এসেছিল বেড়াতে। অবাক হয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখেছিল। কিন্তু না — চোখে চোখ পড়া সত্ত্বেও তারা চিনতে পারেনি। পারলেও বড় লজ্জায় পড়ে যেতে হত। অথচ তখন মনের মধ্যে এখনকার মত এতটা লজ্জা ছিল না। নতুন চাকরির তোড়ে কেমন একটা বেপরোয়া ভাবমূলে ভাব তখন। হাতে ধরা মরচে পড়া বল্লমটায় যেন অনেক ধার, অনেক শক্তি। মানুষের ভিড় দেখলেই ভগবান যেমি উৎসাহ আর আনন্দ। দর্শকরা তাকে দেখে মজা না মজা পেত, সে নিজে পেত তার বিগুণ। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই —

ঢোলা-ভাউনিতে সুবল দেখল , মা — আজ তেমন ভিড় নেই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে কয়েক শ আছে তারা সব নড়-গমনের আসরে, তিতিও সেখে, রেডরোয়ার। বাচ্চারা মানুষ খেলায়। টয় ট্রেনে। এইদিকে কারো আসার সম্ভাবনা কিংবা মজার বড় একটা নেই। সুতরাং এই সুযোগ। চট করে বল্লমটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে মাথাটা ডান দিকে কাত করল। ঘাড়টা টনটন করছে, পা দুটোয় সাড় নেই। গোটা মেরুদণ্ডটাই অবশ। ক'ঘন্টা এমনি করে থাকলে সত্যি সত্যিই একদিন হাড় প্রস্তরীভূত হয়ে যাবে। সেদিন কি আর কারও মনে সন্দেহ থাকবে যে, একদিন মূর্তিটা জ্যান্ত ছিল।

কার্তিকের কথা মনে পড়ল সুবলের।

— ও দাদা, এ মূর্তিটার চোখ যে পিট পিট করে। এটা কেমনের মানুষ।

বীনবন্ধু ধমক দিয়েছিল, — দিন দুপুরেই নেশা করেছিস, না কাঁচা সুপুরি গিলেছিস? কত লক্ষ টাকা খরচ করে বানানো, চোখ পিটপিটাবে কেন?

— তুমিই দেখ না।

— আমি দেখেছি, তোর পরিবারকে এনে দেখান। সে মাগীর চোখে নিশ্চয় তোর মত ছানি পড়েনি?

হাসিতে ফেটে পড়তে চাইছিল সুবল। কিন্তু পারেনি। চারপাশে দেশি-বিদেশি অজস্র মানুষ। সাহেব-মেম-বাঙালী-অবাঙালী সবাই ছুটির দিনে নতুন আকর্ষণে জমায়েত। ভিড়ের ঠেলায় ওরা দু'জনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেনি। খেতে খেতে দেখায় মন হারিয়ে গিয়েছিল। আহা — বড় ভাল মানুষ ওরা। ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল চিৎকার করে ধরা দেয় — কি গো চিনতে পারছ না? আমি তোমাদের সুবলা — ঝাঁসির কলেজ পাড়ার সুবল মুহুরি। তোমাদের আড়ৎ থেকে পান নিয়ে হেঁড়িয়া বাজকুল বাজারে চালান দিতাম। সেবার টাকা ছিনতাই হওয়ার পর তুমি বীনবন্ধুদা বলেছিলে, ভাবনা ছাড়িস না — পুঁজি আমি দেব। আর কার্তিক, তোর মনে নেই ভাল কমিশনে রামলক্ষ্মণের মানুষ এনে দিবি বলেছিলি।

প্রথমে মজা লাগলেও পরে কিন্তু দুঃখই হয়েছিল সুবলের। হায় রে ছবরি। এমনই তার মহিমা যে, চেনা লোক দেখেও কিংবা চিনিও

কেউ এলেও কথা বলার বা পরিচয় দেবার অবস্থা নেই। মেয়ের দিকে খুব বেশি অবসর-চিন্তার অবকাশ পাওয়া যেত না। কিংবা ইচ্ছেও হত না। ছুটির দিনে প্রচণ্ড ভিড়। সে ভিড়ে নানান জায়গা, বন্ধু আর খেলা। অদ্ভুত সব কাণ্ড তাঁর অবাক-করা ছেলেমানুষি ছাপায়। পনেরো টাকায় টিকিট কাটো কয়ে কেন কেন সমস্যাই নয়। কিন্তু দর্শক সমাগম যেদিন কম, হাজ্যের চিন্তা সেদিন মাথায় থাকে। কিন্তু অবশ্য না ভাবলেও নিস্তার নেই। নীল আকাশে হঠাৎ ঘেরে আসা পাত পাত মেঘের মতই টুকরো টুকরো ভাবনা কেন জমতে থাকে।

চাকরি তো জুটল কিন্তু কি রকম চাকরি? এ কথা মালতীকে বোঝাতেই কেন কদিন লেগেছিল। — আসলে এটা একটা পার্ক। বিদ্যির আয়ু ঘর। কলকাতায় নিকো পার্ক, ঘরের ক্রিমন্যাল, আন্তারের লেকের বীচের চাইতেও মজাদার হবে এই পার্ক সম্পূর্ণ হলে। আজ ক'বছর থেকেই এর কাজ চলছে। মানুষের আমোদ-প্রমোদের এমন সব উপকরণ থাকবে এখানে যা এক কথায় চিত্তার বাইরে। লোকনৃত্য থেকে ক্যাসিনো, ঘুলবুলাইয়া থেকে সি-ক্রিয়ার।

— তা পার্কে তুমি কি কাজ করবে — টিকিট বিক্রি না হিসেব রাখা। — নিরোপদের পদের উল্লেখ না থাকায় মালতী কেন আরও কাঁপরে পড়ে গিয়েছিল। — এত লোক থাকতে তোমাকে নিল কেন?

— নিয়েছে এই ভাবনাই মাথার জন্যে। মস্ত ঘুণের একটা দুর্গের দ্বাররক্ষী হিসেবে মানাবে ভাল — তাই, মাথায় পাগড়ি। কানে মকরি, ইয়া বড় মোচ আর গালপাট্টা, কেমন লাগবে বল তো?

একথা শুনে দুই মেয়ে গীতা আর মিতা তো হেসেই খুন।

— চাকরি তোমার যাই হোক না বাবা, বেতন পাওয়া মাত্রই কিন্তু আমাকে একটা ভাল শাড়ি কিনে দিতে হবে।

মিতা বলেছিল, — বাবা, মুটি আমার চটি আর সেলাই করতে পারছে না।

দুই মেয়ের অনেক পরে পিন্টু এসেছিল। নিতান্তই ছোট, তাই বোঝাবোঝহীন। তাকে কোলে নিয়ে গায়চারি করতে করতে মালতী কেন আরও মনে গিয়েছিল। — তাহলে অফিসে চাকরি নয়? তুমি তো কলেজে পড়তে।

সুবলও যদি না বোঝে তাহলে তাকে বোঝাবে কে? চাকরি, ব্যবসা, বাড়ি, গাড়ি, ঘড়ি ঘুইয়েও মানুষ ঘর খোঁজে কি করে? — সুবল সত্যিই সেদিন অবাক হয়েছিল, রাগও হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ করেনি। কেননা চিরকাল সে পরিস্থিতির, ঘুট-বাছবোহীন। বাবা মারা যাওয়ায় কলেজে পড়া বন্ধ হয়েছিল। তেল দিন সে মায়ের কথা কাউকে বলেনি। ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিল। নিজের চেষ্টাতেই বড়পুরের ছেলের এক রিসেপ্তারের অধীনে চাকরি পেয়েছিল। ক'বছর পরে যখন সে মোহতর সংসারী তখন মুখ ফুটে একদিন ছাঁটাই হয়ে যায়। এ ইউনিয়ন সে ইউনিয়ন অনুকম্পা অনুকম্পা থেকেও যখন কিছু করা গেল না তখনও সে কাউকে দোষ দেয়নি। তেল সুবেল-সন্ধানী আপত্তায় নড়াও বাঁধেনি।

মালতী চটেছে। — তুমি ভুল করছ। পার্টি না করলে তুমি তেল দিন চাকরি পাবে না।

সুবল হেসেছে। — আমি নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ভালবাসি, ওসব পছন্দ করি না। পার্টি করা মানেই আরেক পার্টিকে চটানো, ঝামেলার জড়ানো। অবথা শত্রু বাড়িয়ে লাভ কি? তাছাড়া কিছু পাওয়ার জন্যে পার্টি করাকে আমি ঘেন্না করি।

— বাঁচতে তো হবে। তাছাড়া তোমার তো একটা দায়ি আছে। বাবা কংগ্রেস করত না?

— হ্যাঁ, গান্ধীজির কংগ্রেস। — ছেলেবেলায় বহুবার শোনা সে কথা মনে পড়ে যায় সুবলের। বিরাশিল সাল, যেদে তখন ব্রিটিশ তাড়ানোর আন্দোলন। আর সবার মত বাবাও তাতে সামিল। উত্তাল অধিগর্ভ মেদিনীপুর, মিছিল লাঠিওলি। সপ্তমাইলের খালের এদিকে বিশাল এক জনতা আর পুলিশ একদিন মুখোমুখি। জনতা যত এগিয়ে আসতে চায় পুলিশ তত বাবা মেরে — দূর হটো, ভাগো — নইি তো মারেগা। পিছতে পিছতে খালের কিনারায় এসে জনতা থেমে রুখে দাঁড়ায়। বাবাই নাকি প্রথম বলেছিল — আর পিছবনি। সে কথায় সুর মিলিয়ে বলিয়া গর্জে উঠেছিল — পিছবনি, কিছুতেই পিছবনি। লাঠির ঘায়ে বাবা লুটিয়ে পড়েছিল — খালের ওপর অনেক পরে সেতু হয়েছে, নাম তার পিছবনি সেতু হলেও কে আর মনে রাখে সেসব পুরনো কথা। লাঠির ঘায়ি মুলধন করে বাবা তো কোন দিন কিছু পায়নি, তবুও।

তাহলে! মালতী কি বাবার না পাওয়াটা এখন সুদ সমেত আদায় করতে বলছে? দাবির ইঙ্গিতটা কি তাই? ওসব কথা এখন কেউ বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া চাওয়াটাই তো একটা লজ্জা-জেয়ার ব্যাপার।

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল যে, কলেজে পড়লেই কি তার মোহের চাকরি পাওয়া যায়? বলেনি। বললে মালতী হয়ত আঘাত পেত। মুখ আরও বাড়ত। হাসিমুখে তাই বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। অফিসে না হলেও এ চাকরি মোটেই খারাপ নয়। কেন দিদি। তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, যেদিন দেখবে সেদিন টের পাবে যে, কি বিশাল কারখানায়। মস্ত ঘুণের — এই ধর চিতোর কিংবা জয়পলমীরের অনুকরণে একটা ছোট দুর্গ — কেন গোটের মুখে একটা উঁচু বেদী, সেখানে সেই ঘুণের গালপাট্টাওয়ালা এক প্রহরী দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। আশপাশে আরও অনেক মিনার — অশ্বারোহী — মানুষ সাইজের স্টাচু — তার মধ্যে সত্যিকারের মানুষও স্টাচু সেজে। ব্যাপারটা কেমন মজার বল দেখি?

মালতী আরও রেগে গেল, — পার্কে ওসব থাকবে কেন? মাথা খারাপ না হলে কেউ ওসব বানায়? মানুষ স্টাচু সাজবে - আমার বাপু —

মুখের কথা কেড়ে নিয়েছিল সুবল, — আরও খুলে বলছি। তালসারি, দিঘা, শঙ্করপুর, দুনপুট — এসব জায়গায় সমুদ্রই প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু পর্যটকরা দু'দিনেই হাঁপিয়ে ওঠে। তারা চায় আরও মজা। আরও অবাক উত্তেজনা, আলাদীনের আশ্চর্য দুনিয়া। তাই এক কোটিপতি জলদায় বানিয়েছে এক অত্যাশ্চর্য পার্ক, সমুদ্র-কাউবয় ছাড়াও এখানে আছে অতীত, বর্তমান আর আগামী ভারত, ইতিহাস আর ঐতিহ্য, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি, কলা আর কৌশল। ঘুরন্তিক থেকে ক্যালটেনি সব তুমি পাবে। মনোরঞ্জনের উপকরণে ঠাসা। এ পার্ক শেষ হলে পর্যটন মানচিত্রে জলদা দিঘা-পরিধিভুক্তকেও হারিয়ে দেবে। রামনগর, টাপপুর, আলমপুরের ঢেউয়ো কাদে যাবে। দিঘার কালে জলদায় হয়ে উঠবে রাইটিন অফ

বেরল। আর্থ্য মন্ত্র পেয়েছেন বীজ স-ব হেরে যাবে। বেখলেই বুঝতে পারবে আমার চাকরিটা কেমন মজার।

ঠিক দু'মাসের মাথায় পাশ পেয়ে মালতী, গীতা, বিতা আর পিন্টু এসেছিল পার্কে। কিন্তু তার আগেই সে নিজে টের পেয়ে গিয়েছিল যে, চাকরিটা কেমন মজার। প্রথম প্রথম দাঁড়িয়ে থাকতে জীবন কষ্ট হত। বেলা বারোটা থেকে এক নাগাড়ে বিকেল ছটা। পা দুটো ফুলে উঠত। ফুলের ভেতরে আগুন জ্বলত। মনে হত এই বুঝি পড়ে যাবে। গলা শুকিয়ে কাঠ, হাত দু'টো অবশ, মাথাটা লোহার — দৃষ্টি ঘোলাটে। কপালের ঘাম গড়িয়ে চোখে পড়লেও মোছবার জো নেই। তার মধ্যে আছে দর্শকদের মানান রঙ্গ ব্যঙ্গ টিপ্পনি অত্যাচার অসামাজিক কাণ্ড। একদিন একটি মেয়ে গায়ে সেন্টের শিশি ফুটিয়ে পরীক্ষা করেছিল মূর্তিটা জ্যান্ত না পাথরের। কতজনে অবাক হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছে। গায়ের উর্দিতে এক টাকা দু'টাকা পাঁচ টাকার নোট ঝুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে নোট ঘরে আসেনি। মালিকের কড়া হুকুমের জন্যে ম্যানেজারের কাছে জমা দিতে হয়েছে। মনটা তার হলেও সুবল নিজেকে বুঝিয়েছে — সত্যিই তো উপরি এ পাওনটুকু আসলে তো তার প্রাপ্য নয়। লোকে মজা পাচ্ছে, খুশি হয়ে তারিফ করছে — ওইটুকুই তো যথেষ্ট পুরস্কার। একদিন কয়েকটা বাচ্চা তাকে লক্ষ্য করে ক্রমাগত ঢিল ছুড়েছিল। মার খেয়ে রেগে-মেগে তাদের ধমক দিতেই উপস্থিত দর্শকরা হেসে লুটোপুটি। — আরে ব্যাপো ব্যাপো স্ট্যাচু ধমকাচ্ছে। সেই থেকে আর ঢিল খেলেও যত আঘাতই লাগুক না কেন সে মোটেই নড়েও না — প্রতিবাদও করে না। আর একদিন এক ভদ্রলোক রেলীর নিচে দাঁড়িয়ে গায়ে সিগারেটের ছাঁকা দিয়েছিল। পরের রবিবারই লোকটা বলেছিল এইবার দেখবে স্ট্যাচুটা ঠিক কথা বলবে। আগুনে চিৎকার করে উঠবে। কিন্তু সে কিছু করেনি। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে। এই সহ্য করার মধ্যে দিয়ে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ জেতার আনন্দ সেদিন সারা দেহে মনে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ছাঁদনা পাওয়ার কষ্টের চাইতেও বেশি কষ্ট পেল সেদিন। যেদিন ওরা এসেছিল।

ছুটির দিনের দুপুর, চারপাশে তখন মেলা মেলা ভাব। গীতা বিতা ছুটতে ছুটতে সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অবাক হয়ে পাশাপাশি থেকে মালবা পর্যন্ত জরিপ করে হাসতে গিয়েও তারা কেউ হাসতে পারল না। একটা অসহায় যন্ত্রণা ফুটে উঠল তাদের চোখে-মুখে, ফিসফিস করে দু'জনে কি বলাবলি করল। আর যাকে ওই অবস্থায় দেখা মাত্রই মালতীর বুকটা কেন কেমন হয়ে গেল। তাহলে কি চিনতে পারেনি? একবার ভেবে সুবল শক্ত হাতে বাঁশটা উঁচিয়ে আরও দাঁতের মত বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মালতী আরও ম্লান। যে কেন তার মুখের হাত তবে নিয়েছে। দৃষ্টি ঝুলেই মাটির দিকে। এমন সময় পিন্টু হঠাৎ জোরে কেঁদে উঠল। গীতা তাকে কোলে নিয়ে বকে বলে — কাঁদে না, ওই দাদা বাবা, তত ও জোরে কাঁদতে থাকে। কিছুতেই চোখের দিকে তাকায় না। চিনতেও পারে না। ভয় পেয়ে হাত-পা ছুড়তে থাকে। সামলানোই মুস্কিল হয়ে ওঠে। অন্য দর্শকরা বিরক্ত হয়।

জীবন ইচ্ছে হল পিন্টুকে কোলে নিয়ে আদর করে ঘোমায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। রেলীর ওপরে পায়ে গজাল ঠুকে কে যেন আটকে রেখেছে। সেখান থেকে নড়বার এতটুকু শক্তি নেই। পিন্টুর কান্না থামাতে বিতা এক কাণ্ড করে বসল। ওকে কোলে নিয়ে রেলীর ওপরে উঠে 'বাবার কাছে যাবি' বলে এগিয়ে দিতেই পিন্টু প্রথমে ভাবাচাকা — তারপরে দম আটকানো কান্না. রাবল মার্কা গোঁফ দেখেই তুমুল চিৎকার - বাবা যাব না, রাক্ষস - রাক্ষস।

পিন্টুর কান্না মাখা রাক্ষস শব্দটা প্রায়ই বুকের মধ্যে ঘা মারে। মনে হয় ওদের না আসতে বললেই ভাল হত। সেই রাতে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বাসায় ঢুকতে না ঢুকতে টেন পেয়েছিল কি একটা যেন ছুটে গেছে। গীতা বিতা চেষ্টা করেও স্বাভাবিক হতে পারছিল না। দুই বোনে ফিসফিস করে কথা বলছিল। আর মালতী — সে তো প্রথমে সামনেই আসেনি। বিছানায় শুয়ে যার বুকের এদিক ওদিক করে বলেছিল, — চাকরিটা সহজে। তুমি তাহলে সত্য সাজ!

চিৎকার করে সুবল বলে উঠতে চেয়েছিল, - হ্যাঁ, হ্যাঁ, সহজের চাকরি। জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফেরার সত্য — পাঁচটা পেটের অন্নে সত্য। কিন্তু কিছু বলেনি। একটা কান্না ওপরে ওপরে যেন দলা পাকিয়ে উঠেছিল। — কি করব মালতী? কিসে যে কি তারতম্য অভিশাপ তা তো তুমি জান। পারে ধরে পাও তাই তোমাকে বলিনি. প্রথম মাসে পুরো বেতন দিলেও এ মাসে দু'শ টাকা কম দিয়েছে। বলেছে পার্ক এখনও জমেনি। জমলে দেব। প্রতিবাদ? কোন সাহসে করব? মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ, নেতা সবার সঙ্গেই মালিকের ওঠা-বসা। আর সত্যিই যে জমলে দেবে কোথা থেকে। নিশ্চয়ই মিথ্যে বলছে না। দয়া করে চাকরিটা দিয়েছে, তার ওপরে আর কি কিছু চাওয়া যায়? চাওয়ার যে অধিকার বাবার ছিল আমার কি তা আছে? অধিকার থাকা সত্ত্বেও বাবা কি পেয়েছিল মনে নেই? প্রায় বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালের বারান্দায় মারা গিয়েছিল। কেউ একবার দেখতে পর্যন্ত যায়নি। এ যুগে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং অতিরিক্ত আশা করব কেন? ভোগ সুখ ঐশ্বর্য তো রাজনীতি-ব্যবসায়ী আর বড়লোকদের। মনে হয়ে হাত বাড়িয়ে আমি আমার শান্তি নষ্ট করব কেন? এ দেশের কোটি কোটি মানুষের মত অতি অল্পেই তুষ্ট আমি। সব জেনে নির্দ্বিধায় ঘুমি জীবনটা কাটে তো ক্ষতি কি? তুমি যাদের বিরাট মনের মানুষ বলে ভাবছ তারা কি সব সাজে না? মিথ্যে বলে না? ধাপ্পা দেয় না?

কানের কাছে খিলখিল হাসিতে পুরনো ছবি মুছে যায়। সতর্ক হয়ে সুবল সমুদ্রের দিকে তাকালেও দেখতে পায় সামনে প্রায় উদোম শিকলিকে এক সাহেব তার দিকে ক্যামেরা তাক করে, আর এদিকে প্রায় ঘাড়ের ওপরে যুবতী সঙ্গিনী। ফোসফোস করে তার গরম নিশ্বাস গালে লাগছে। ঘামি সেন্টের ঝাঁঝ নাকে ঢুকছে। এখন হাঁচি পেলেই সর্বনাশ। সাহেবের একটার পর একটা ছবি তোলে। যুবতী একসময় চকাস করে তার গালে চুমু খায়। হেসে বলে, — সত্যিকারের পুরুষ স্ট্যাচু, তোমার মত যুবলা নয়। এই রকম পার্টনার না হলে —

সুবল খুব বেশি চঞ্চল হয় না। এখন এসব গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু খুব সাবধানে দেখে, চেনা-শোনা কেউ দেখছে কিনা। মালতীর কানে এসব পৌঁছলে ও হয়ত ভাববে এই জন্যেই চাকরি করছে। ঘুমিও অতি বড় শত্রুতেও এ দোষ কেন দিন দিতে পারেনি।

ঠোঁটটা সামান্য ফাঁক করে একটা হাই চেপে। হাই আসতে আজ কত দেরি? অনেকদিন রোদ্দুর দেখে দেখে। আজ মেঘলা, তাই বোঝা যায় না। একটু তাড়াতাড়ি ঘুমের কোল পাওয়া দরকার ছিল। মালতী বারণও করে ছিল। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি, যদি ছাদেনার ছুটি না দেয়। যদি পার্কে অনুমিতে হয়। তার কাজ অন্য কাউকে দিয়ে হবে না। পরশু আসেই মল্লিক আদাওয়ালজি পিঠ চাপড়ে গেলে বলেছিল, — তুমি তো দেখছি ছিপ্ত স্টাফ হয়ে গেছ। আরও পারফেক্ট হতে হবে। মো অলটারনেটিভ, তেরি গুড।

মাথা নিচু করে কৃতজ্ঞ হাসি হেসেছিল সুবল। তার মত জন কেউ পারবে না এ কথা জেনে কেন তৃপ্তি বোধ করেছিল। লোকটি চমৎকার গুছিয়ে কথা বিতে জানে। মল্লিকের কথা ভাবতে ভাবতে মালতীর কথা ভুলে যায়। বিকেলে লোক বদ বাড়ে সে তত বুক দুলিয়ে পাখনের মত নিশ্চল হয়। পাখনের চোখে মেখে চারদিকে সজীব মানুষের আনাগোনা। নাগরদোলা, টয় ট্রেন, মেলা রেল, স্পুটনিক ফ্লাইট, বিভিন্ন খেল, নাচ, গান, মাজিক, রেস্টুরেন্ট স-ব সমানে করছে। চারপাশে শুধু মজা আর মজা। ফুর্তি আর উল্লাস। কোন মানুষের কোন দুঃখ, অভাব, সমস্যা নেই। আছে শুধু বেঁচে থাকার আনন্দ। এমন মজার জীবন ক'জনের ভাগ্যে জোটে। সুনি রাজপুরের মূর্তি দেখেছিল, এত ফুর্তি দেখলে নিশ্চয়ই কাঁদত না। জীবনে অর্থটাই কি সব? মোটেই না। রসুলপুরের মোহনার নবকুমার পথ হারিয়েছিল। আর তার পরেই জলদার সমুদ্রতীরে একজন নতুন করে খুঁজে পেয়েছে বাঁচার পথ।

ক্লান্ত দেহে যখন বাসায় ফিরল তখন রাত প্রায় আটটা। বাস থেকে নেমে হাঁটা পথ। ওই পথটুকুই ভয়ানক দীর্ঘ মনে হয়। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলেই যদি কিছু জিজ্ঞেস করে তো হাঁ-ই করে উত্তর দেয়। ফল — ওই পর্যন্তই। কেন ছাপাতেই এটুকুও আগ্রহ বা কৌতূহল দেখায় না, মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়ে যায় — এত নিস্পৃহ হলাম কি করে? সত্যি সত্যিই কি পাথরের মূর্তি হয়ে যাচ্ছি?

চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে খুশি করা গলায় মালতী বলল, — জান, আজ রাণুদি এসেছিল।

— কে রাণুদি? তোমার কোন —

— ওই যাকেই তো তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিলাম,

— পারলাম না। সব কর্মীকে নিয়ে মল্লিক মিটিং করেছিল। সামনে আমাদের নতুন অফিস। তারজন্যেই এক নম্বর এটারটেনমেন্ট পার্ক হবে এটা। হাজারে হাজারে বিদেশি টুরিস্ট আসবে। ফুলফুলাইয়া মহল শিল্পীদের খুশবে। ওটা কি জান তো? লক্ষ্ণৌ-এর কারবার ভুলভুলাইয়া খেলার জোড়া গলি আর লুকিয়ে থাকার ঘর।

— রাণুদিকে চেন না। এক নম্বর মহিলা নেত্রী। মহিলা উন্নয়ন সংঘের প্রেসিডেন্ট।

— হবে, তা কি মনে করে এসেছিল?

— গীতা মিত্তার চাকরির চেষ্টা করবে বলছিল। রোকসানা সামলে হলেও তোমার জেবা তো কিছুটা করবে।

— হলে করবে, না হলে বাড়বে। — সুবল হাসল, — তোমার রাণুদি কি সেই জোড়া মেয়েটি যে মেয়েদের মিছিলে খুব গলা ফাটাত?

— মেয়ে নয়, মহিলা। এখন আর জোড়া নয় — বেশ মোটা। অধিকাংশ দিন তো মিছিলেই থাকে। মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠা-বসা।

— তাই নাকি।

— এই দিন এসে গীতা মিত্তার কটো আর পারিবারিক নিয়ে যাবে বলেছে। সব ঠিক তো?

— ভাল যা বুঝবে তাই করবে। নিশ্চিন্তে বেন থাকতে পারি।

— তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ করবে বলেছে।

— কি হবে আলাপ করে? আর, কাল একটা কাজ এসে আমায় মাথার বলেছিল? কলিন আগে একজন গায়ে ফুঁ দিয়েছিল।

— তুমি কিছু বলনি?

— কি হবে বলে? অশান্তি আরো বাড়ত। মল্লিকের কথায় কমফোর্ট টুকে নিলেই —। কথা শেষ না করেই অন্য কথা পাড়ল সুবল, — পরশে মোটা উর্দিটার আগে কেন কষ্ট হত। এখন না — বরং একটু আরামই লাগে। কিন্তু ওটার হারপোকা আছে। গোঁফের স্পিরিট ঘামে আগে কামুর আঠার মত চুলকোত — এসব কিছু বুঝি না।

— রাণুদি ওদের দু'জনের চাকরি যদি করে দিতে পারে তাহলে —

— উঁ-হু, চাকরি চাইব না। জমি আমার চাকরি তোমার পছন্দ নয়। কিন্তু মালিক মেহনতুল্য। ক'দিন থেকেই ভাবছি ওদের জানে বলব। দু'জনকে বোঝায় দিতে পারবে না। একজনকে

ঁকিয়ে ওঠে মালতী, — মেয়েদের সঙ্গ না সাজলে ভাল লাগছে না?

চাকরি পেলে ওরা ফুর্তি হবে না। আরও মানুষ হয়েই কাজ করবে। তারপর হাতে একটু পয়সা জমলেই চাকরি ছাড়িয়ে বিয়ে দেব। তদ্দিনে আমার মাইনেও বেড়ে যাবে। মালতীর চোখে চোখ রাখে সুবল। — পিন্টু বড় হয়ে দেখবে তার বাবা নকল বোতা। তারপর একটা জেব নিয়ে সে পড়াশোনা করবে। ঠাকুর্দার মত আসল বোতা হবে। তারপরে একদিন আমাকে আর চাকরি করতে দেবে না। তোমাকে পিতলের পানের বাটা কিনে দেবে। রামনগরে সার্কাস দেখাতে নিয়ে যাবে।

মালতী হাসতে গিয়েও হাসতে পারে না, — সারা দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব স্বপ্ন দেখ বুঝি?

— অকর্ম, দুর্বল মানুষ স্বপ্ন ছাড়া আর কি দেখবে। একেক দিন কি মনে হয় জান? সব কিছু অসহ্য করে — সুবল অস্থির পায়চারি করে। একটু পরেই মালতীর কাছে এসে ঠাণ্ডা গলায় বলে — আসাওয়ালজি বলছিল আমরা সবাই একই পরিবারের, উন্নতি আমাদের হবেই। দেখা যাক।

দিন যত কাটে সুবল তত পাথর হয়। লোকে তারিফ করে — মূর্তিটা একদম মানুষের মত। সমুদ্র আর মানুষ দেখতে দেখতে মুছে যায় প্রিয়-পরিজন। ভুলে যায় মালতী-গীতা-মিতা-পিন্টুর মুখ। আশা-আকাঙ্খা, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ — সব মিলে মিশে একাকার হয়ে হারিয়ে যায় কাউন্টারের কারায়, নিত্য মানুষেরার আর ঢেউয়ের মাঝিনিয়ায়।

আগে কর্দমাক্তের মুখ দেখলেই মনে মনে বিশ্লেষণ করত, মানুষটা কেমন। ভাল না মন্দ, রাগী না শান্ত, দুর্মুখ না মেজাজ, লোভী না অসুখ, সন্ধান না মোহোনার, ধার্মাবাজ না ধার্মাবাজ — কিন্তু আজকাল সবাইকেই বিশেষত তার মত সাধারণ মানুষদের দেখা মাত্রই মনে হয়,

অনুভূতিশূন্য নিস্তেজ কতগুলো মাংসল ভারী ঢোঙা মূর্তি।

ভরা-কোটাল মরা-কোটালে কিংবা নিম্ন চাপে সমুদ্রের ঢেউ যেদিন আছড়ি-পিছড়ি মাতামাতি করে, সুবলের হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় পাথরের স্পর্শে সবাই জড়ল পাথর হয়ে যাচ্ছে। চতুর্দিকে নিঃসীম অন্ধত্বে সবকিছু বুদ্ধিহীন প্রাণহীন অবয়ব। সমুদ্র আর বাউবনের সোঁ সোঁ হাওয়ায় ভেসে আসে একদা শোনা এক বিমল কবির ঘোষণার — ভেসে যাচ্ছে আসল, সেটা বাংলাদেশ। — না বাংলাদেশ নয়, সন্ধ্যা দেশ। কোটি কোটি মানুষ।

হাসতে পারে না, কাঁদতে পারে না, তবুও অদ্ভুত এক আনন্দের নেশায় প্রায়ই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সুবল। ভাবে, মানুষ যত নিরেট পাথর হবে তত তার সুখ বাড়বে। জীবনের মরা গাঙে ফুল ফুটবে। মসৃণ ইটের মত, পোড়া কাদার মত কঠিন হয়ে থাকবে না কোন বোধাবোধ, কোন অনুভূতি, কোন চিন্তা-বুদ্ধি কিংবা জ্বালা যন্ত্রণা কিংবে। আর কি চাই? বেঁচে থাকে নির্ঝঞ্ঝাট লাভ কি কম কথা? সব জন্তুরই কাম্য তো এটাই। অতএব বেঁচে থাকুক আলমওয়ালজি আরও হাজার বছর। নিজের অজান্তেই মুখটা আরও ঝুলে যায়। সুখের আবেশে কাঁচা সুপুরির কিমুনি লাগে শরীরের কোনায় কোনায়। মনে মনে বলে, এই যে অনড় দাঁড়িয়ে থাকা প্রাণহীন প্রতিমূর্তি সন্ধ্যা, এটাও তো একটা নিয়ম।

তা সেই নিয়তি একদিন এসে দাঁড়াল মূর্তির সামনে।

তখন শেষ বিকেল। সকাল থেকেই সমুদ্র উতাল। একটার পর একটা তাড়া ঢেউ পাথরের বোল্ডারে এসে আছড়ে-পিছড়ে পড়ছে। যেন ভেঙে চুরে সব তছনছ করে দিতে চাইছে। বাউবনও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথা ঝাঁকে ফেপে উঠেছে।

সুবল প্রায় সব বন্ধ করে দাঁড়িয়ে।

আলমওয়ালজি সঙ্গিনীকে চারদিক ঘেরিয়ে বলল, ঘুরি তো অনেক দিন আসনি।

ঘুলমিনী হেসে বলল, সময় পাই না পেত্নী, দোকানের দারি চব্বিশ ঘন্টাই তদারক করতে হয়।

— নেত্রী হলে তদারকেই হবে।

— আপনার কাজ কিন্তু ঘুরিনি। সেন্টারের সভাপতি সিরাজির পেছে যাবেন। পার্কের ব্যাপারে অনেক মিনিস্টারই ইন্টারেস্টেড, তদ্বির কেলটা না হলে —

— তদ্বিরও হবেই। আসল কাজ কদুর? আগামী মাসেই ঘুলঘুলাইয়া মহল খুলে দেব।

মহিলা ইশারায় সুবলকে দেখায়।

আলমওয়ালজি চোখ টিপে হাসতে থাকে — হাবু, এটা একটা স্টোন্ড। ও তনতে পায় না, দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না। এ পারকেই ইডিয়ট লাইক ইওর কলোরার্স। ওর সামনেই তোমাকে নিয়ে আমি যদি ঘুলঘুলাইয়া মহলের গোপন খেলা তরু করি তবুও ও কিছু বলবে না। পালরও হবে না।

— যাহ্, আপনি না — মহিলার চোখে মুখে দুষ্টুমি ঝলকায় — মহলে চেহারা ঘুরলি কতগুলো?

— আরটি প্রেজেন্ট কিনটি, জমলে আরও বাড়াব। ইট ডাইল বিকাম এ ট্যুরিস্ট পারাডাইস। ক'জনকে রিঝুট করতে পারলে? টিন এজারদের কার্ড হেকারেল। তোমার বয়েসী হলে অমি ছড়া — । মহিলার কাঁধে হাত রাখল আলমওয়ালজি।

মহিলা আদুরে গলায় বলল, মর কিন্তু একটু বেশি পড়বে। সাজাসে গোজাসে মেয়েগুলোকে সাধারণ সুন্দরীদের মতই লাগবে। কিন্তু খেয়াল রাখবেন, কেঁসে যেন না যাই। ফরেন্সের ঝামেলাতে নিজেন নেই।

সোঁ সোঁ হাওয়ায় বালি উড়তে থাকে। ফেলে যেওয়া কাগজের ফাপ-ফোট এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে। সমুদ্রের গর্জনটাকেই বাড়ে।

অনেকদিন পরে চলিল ইঞ্চি ছাতির নিচে একটা তীক্ষ্ণ পারুষ কেন বাজপাখির মত তানা ঝাপটায়। এতদিনে কেন সে ফিরতে পারে তার নিজের।

সুবলের চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে ওঠে গীতা মিতার মুখ। আর তখনই মনে হয় পাগড়ির ভেতরে একটা বিষাক্ত বিষে জোয়ারেরা করছে। এখুনি তাকে না মারলে সব নষ্ট করে দেবে। ভেবে করে দেবে।

আলমওয়ালজি মহিলার পায়ের পর টেনিয়ে বলল — ভেরি ওড। মেলাসী ঘাস খেইসা গার্ল — ঘাস পেলে দেখবে টুরিস্টরা আর এ আয়না ছেড়ে সরবে না।

পেটা পৃথিবীটা যেন কেঁপে ওঠে। ঢেউ ভাঙার শব্দ আরও তীব্র। বাউবনের মাথা একবার ওদিক, আরেকবার ওদিক। ঘুরে যেখানে আসল আর সমুদ্র গলাগলি, সেখানে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে।

চারপাশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে মহিলাটি বলে — আপনার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে।

— বলে ফেল। না ঘুটুরিতে গিয়ে বলবে?

— আমি কোন সাক্ষী রাখতে চাই না।

— পাথর কি কখনও সাক্ষী হয়? হয় না। ওটা তো মরারও অধম। ওর মাথায় সমুদ্র ফকে যুগে।

হঠাৎ সারা শরীরে তুফান তুলে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে সুবল। সমুদ্রের গর্জন হাপিয়ে সে হাসির প্রতিধ্বনি শোনা যায় চতুর্দিকে। এক ঝাঁক সামুদ্র-পাখি ভয় পেয়ে দূরে হারিয়ে যায়।

ওরা দু'জনে অবাক হয়।

আলমওয়ালজি বিরক্ত হয়ে বলে— কি হল, খেপলে নাকি?

কোমর থেকে নেমে পাগড়িটা খুলে সুবল বলে — না। মালিক, এ উর্দিটা বড় বেশি নোংরা। তাই খুলে ফেলেছি জন্মের মত।

— কি বলতে চাও? চাকরি করবে না?

ভয়ঙ্কর সত্যে মেঘ ডাকে। — মালিক, ত্রিটিশের তাড়া খেয়ে আমার বাবা সাত-আট মাইলের খাল অবধি পিছিয়েছিল। তার তেরার বছর পরে লাথ খেতে খেতে আমি সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। এরপর কোথায় যাব? আর তো পিছাবনি। কিছুতেই পিছাবনি। এবার আমি সামনে যাব।

সুবল আলমওয়ালজির চোখে চোখ রেখে সোজা দাঁড়ায় — পাগড়ি, উর্দি, নাড়া এমন কি বেতন পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম। শুধু নিয়ে যাচ্ছি এই মহতে পড়া জামাটা। এটার দাম দিতে হবে।

ভয়ার্ত বিস্ময়ে ওরা দু'জনে পাথর হয়ে দেখে, ঝড়ের তাণ্ডব অগ্রাহ্য করে একটা অচেনা মানুষ শক্ত পায়ে দ্রুত বড় সড়কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

▲▲▲

"ওই রে নগরী, জনতারণ্য — শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য
কতই বিপণি কতই পণ্য, কত কোলাহল কাকলি। ....."

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোলাহল মুখর জনতারণ্য
কলকাতা শহরের
নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যকে
উন্নততর করতে
আমরা সতত সজাগ —

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলকাতা পুরসভা

গল্প

সে

পার্থপ্রতিম গোস্বামী

"On February 27th while the election was pending, the Reichstag building was burned down in mysterious circumstances and ..... Large numbers of the common people were driven from their homes, confined in the concentration camps or subjected to great physical brutality....."

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে এসে দাঁড়ালেন অনুভা। একটু আগেই লোডশেডিং হয়ে গেছে। টেবল-ল্যাম্পের অস্পষ্ট আলো ছায়া। দেওয়ালে দীর্ঘ ছায়া ফেলে এখনও পড়ার টেবিলে কি একটা বই এর দিকে ঝুঁকে রয়েছে রাতুল। চুলগুলো একইরকম উদ্‌ভ্রান্ত। সন্ধ্য ইলেভেনে উঠেই চলছে পড়ছে। মাইনাস ফোর। ডাক্তার বারণ করেছেন টেবল-ল্যাম্পের আলোয় পড়তে কিন্তু এই একটা নিষেধ অনুভার কিছুতেই শোনে না রাতুল। চোখদুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। খয়েরি সার্টটার উপর চাদরটা জড়িয়েছে। পাজামার ঢাকা সাদা পা টেবিলটার নীচে, মাঝে মাঝে একটু কাঁপছে। পায়ের কাছে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে লেব্রাডুলিয়ে র‍্যাকেলো। বেড়ালটা রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলেন অনিকেত। আলমারিটার নীচের তাকে এখনও রাখা তাঁর সব বই একইরকম, শুধু অব্যবহারের ধুলো-ময়লা সামান্য। মাঝের তাকটা আপাতত রাতুলের। আর সব থেকে উপরেরটার আসর নিয়েছেন অনুভার ইষ্ট দেবতারা, একটি কোন প্রাচীন দেবীর, অন্যটি সরস্বতী। আর তাই একপাশে অনিকেতের ফটো, হাসছেন, চোখ উজ্জ্বল সেই একই রকম ভাবে অনুভা পারতপক্ষে ঐ ছবির দিকে তাকান না।

ঘরের মধ্যে একটাই খাট, সেদিকেই এগিয়ে গেলেন অনুভা। বিছানাটা একটু গোছালেন, উপরের বেডকভারটা সরিয়ে পাট করে রাখলেন, বেডশীটটা গোছালেন, মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে মশারির প্রান্তগুলো বেডশীটটার তলায় ভালো করে ঢুকিয়ে নিলেন। বাথ থেকে নেমে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালেন রাতুলের চেয়ারের পেছনে। কি পড়ছে এত মন দিয়ে। ছবি-ওলা একটি ইংরেজি বই। পাশ থেকে একটু তাকালেন অনুভা, "এই যে রাতুলবাবু, কি পড়ছেন এত মন দিয়ে। সাড়ে এগারোটা বাজে। চল্, কাল সকালে যে আমাকে আবার তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, অফিস আছে না, চল্ বাবা"। না কোন রূপান্তর নেই, সম্ভবত কথা কানে যায়নি, "আহাই, আহাই সিম্পল্-টি"

— "হ্যাঁ- আ, কে। মা। ও। কি বলছ? কি?"

— "বলছি রাত সাড়ে এগারোটা বাজে, ওঠি চল্।"

— "হ্যাঁ, এই যাচ্ছি"

— "যাচ্ছি যাচ্ছিই তো করছিস। চোখটাও তো দেখছ! দেখি কি পড়ছিস তো?"

বাঁধানো মলাটের একটা বই। সবুজের উপর কালো রঙে লেখা, "The Imprisoned Souls At The Concentration Camp" — একটা বিদেশি বই। দু এক পাতা উল্টানোর পর চোখ পড়ল একটা পাতায়। সাদা পাতা। একেবারে নীচের দিকের কোণায় সেই ম্যাজেন্টা রং কলমিতে লেখা — "আমার রাতুল সোনাকে, জন্মদিনের ভালোবাসাসহ - বাবা, ১.৫.৮৫." তখন রাতুলের সাত। এতটুকু বাচ্চাকে কেন এত গরিষ্ঠ বই দিতেন অনিকেত? কে জানে? এর পরের বছরই তো — হ্যাঁ এর পরের বছরই ——— । বইটা টেবিলে রেখে একটু সরে এলেন অনুভা।

অন্ধকারে ডাইনিং স্পেস হাতড়ে এক্সট্রা জল খেলেন অনুভা। এখন এই দুটো ঘর আর একটা সরু ডাইনিং স্পেস। একটা ঘরে অনুভার রাজত্ব। অন্য ঘরটা রাতুল এবং অনুভার। অনিকেত ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। মেয়েটাও হয়েছে বই-এর পোকা। আর পাঁচটা ছেলের মত নিজেদের, ক্রিকেট ওর তেমন কোন আকর্ষণই নেই। বন্ধু-টন্ধুও তেমন একটা নেই বোধহয়। বই, ছবি আঁকা আর ও। একলা এক ছেলে মানুষ। স্কুলে ছেলেরা পেছনে লাগলে মায়ের কাছে এসে কেঁদে ফেলে।

ঘরে ঢুকলেন অনুভা। রাতুল এর মধ্যে শুয়ে পড়েছে। অনুভা মশারির ভেতর এসে বসলেন। হাত মাথা করে কাকে কোন মমতায় জানালেন। শুয়ে পড়লেন তারপর। ছেলেটা তখনই ঘুমিয়ে পড়েছে। টেবল-ল্যাম্পের অল্প আলোয় ওর মুখ, চৌটটা একটু ঝিম ঝিম কাঁপছে। চোখটা আবছায়া। মুখের আদলটা কিছুটা অনিকেত, কিছুটা অনুভা। হঠাৎ মনে হল কি যেন ঝিড় ঝিড় করছে। অনুভা কান পেতে শুনলেন, "এ্যাতোগুলো লোক — সমবেত — কি ঝিম-ঝিমাক্ত — কি কষ্ট মুকে — শেষ, সব শেষ।" ঘুমিয়ে পড়ল, ভাবটা একটু কেটে গেছে। ঘুমে কোন অসুখের কোন এক অতিথির ঘন্টা বেজে উঠল - ঢং, ঢং, ঢং...

দুই

"গ্রামের সেই পুরানো ফুঁয়ের পাশ দিয়ে তারা কিন্তবে ভুলে অবহা পথ বেয়ে, অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে তারা, অনেক কিছু, কেউ হারিয়েছে পরীক্ষের কোন অঙ্ক, কেউবা হারিয়েছে স্মৃতি, কেউবা তাদের প্রিয়জনদের, কে থাকবে দাঁড়িয়ে সেদিন ওদের সম্বর্ধনা জানাতে, থাকবে কি কেউ? ....." শেষ ক্লাসের শেষ কথাটি শেষ না হতে হতে ঘন্টা বাজলো ক্লাস শেষের। রিং-রিং-রিং - রিং-রিং-রিং। খাতা বই গুছিয়ে ওরা প্রস্তুত হয়ে নিল। স্যার বেরিয়ে যাওয়ার পর বেরিয়ে এল ওরা। রাতুলকে দেখা গেল সৌমনের সাথে, সব ছেলেওলোই নিজেদের মধ্যে, কি সব বকতে বকতে আসছে। সকলেই সাদা শার্ট, কাঁকি ফুলপ্যান্ট - ইউনিফর্ম পরে আছে।

"অসমাপ্ত পড়াচ্ছেন স্যার Send Off কবিতাটি। না রে রাতুল?"

— "হ্যাঁ, মামা, আর অসমাপ্ত কবিতা Owen এর।"

— "ঠিকই বলেছিস, আমার favourite!" ওরা গেটের কাছে পৌঁছল। হঠাৎ সৌরভ বলল, "আই রাহুল, আমি চললাম। তুই তো যাবি না। 'U. F. O'র উপর একটা দারুণ সিনেমা এসেছে জোরে। চলি রে।" রাহুল হাত নেড়ে বিদায় জানাল বন্ধুকে। গেট পেরিয়ে জনসমুদ্রে মিশে গেল সৌরভ। রাহুল হাঁটতে লাগল উল্টোদিকে। বাস স্টপ থেকে বাস ধরে সোজা বাড়ি আসবে। বাসস্টপে এসে দাঁড়াল। কলেজ আসার সময় নিশ্চয় ছিল না, কিন্তু যাবার সময় রাস্তার উল্টো দিকে সার সার সব এসে বসেছে অনেকগুলো ঝুপড়ি। এলোমেলো। আরে উল্টোদিকের ফুটে আর এল বেঁটে যাচ্ছেন না! একইরকম সুসজ্জিত চেহারা, ঘুড়ি-পাগলামি পারা, সৌম্য গায় জহলোক, কি লম্বা, মাথায় চুল উলটে আঁচড়ানো, ভারি ফ্রেমের চশমা। শিক্ষকের প্রিয় স্যার, পুরো বাবস্থাপনা দারুণ — ভবভান্ সেনগুপ্ত। হঠাৎ ফিরে তাকালেন, ঐ অত ঘুড়িটা কি বলছে বোঝ যায়। সামান্য একটা বাড়ি, ঘুড়িতে কিছু পড়ল, ফিরে দেখেন ওর কাছে, এ পকেট ও পকেট হাতড়ে খুচরো কিছু ঘুড়িটাকে দিলেন। ঘুড়িটাকে দেখে দারুণ খুশি মনে হচ্ছে। স্যার আবার চলতে শুরু করলেন। এইদিকে স্যার জোধায় চলেছেন। রাস্তাটা একটু ঘুরে গেছে। পথের বাঁকে স্যার হারিয়ে গেলেন। হঠাৎ একটা হৈ-চৈ শোনা গেল, কতগুলো ছেলে, তিন-চারটে, কালোমতো, হাফপ্যান্টপরা , এই দশ-এগোরো বছরের হবে, পথের ঐ প্রান্ত হতে ছুটে এলো। একটা ঘুড়ি কেটে পড়ছে রাস্তার মাঝখানে, অনেকটা সুতোও আছে, বেগুনী রঙের ঘুড়ি, লেজটা সবুজ, সোজা খেয়ে পড়ছে বাতাসে এদিক-ওদিক কাঁপতে কাঁপতে। ঘুড়িটা দেখে একটু লোভও হল, পড়ার টেবিলের সামনে টাঙিয়ে রাখলে বেশ হয়। ঘুড়িটা প্রায় মাটিতে এসে পড়ছে, হঠাৎ ঝুপড়ির ভেতর থেকে একটা সাত-আট বছরের মেয়ে, ছেঁড়া ফ্রক পরা, অবাধিত সুক্ষ্ম চুল মাথার উপর উড়ছে, ছুটে বেরিয়ে এলো, ঘুড়িটা ধরতে পেরে এলো রাস্তায়, ধরলও সুতোটা, তার পর পেছন ফিরে দৌড় দিয়ে আবার ঝুপড়ির কাছে উঠে গেল, ছেলেগুলো কিন্তু তার পেছন ছাড়েনি। একজন সোজা গিয়ে হাত থেকে ছিনিয়ে নিল ঘুড়িটা, মেয়েটা একটু হিঁচে গেল, কিন্তুটা সুতো রয়া রইল ওর হাতে। ও কাঁদিয়ে উঠল, "একি আমার ঘুড়ি, আমিই তো প্রথম ধরেছি, দাও," একটা ছেলে আমনি মুখ ভেংচে বলল, "হ্যাঁ আমার ঘুড়ি — কি আহ্লাদের কথা, আমাদের ঘুড়ি আমরা ওড়াচ্ছিলাম ওই মাঠ থেকে, এখন হল গিয়ে তোর ঘুড়ি—"। মেয়েটাও নাছোড়বান্দা, "তো কি করব? তোমাদের ঘুড়ি আমি তো আর চুরি করতে যাইনি।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, "না, তা চুরি করনি কেন? কিপ্পুসীরা কি আর চোর হয় — সাধুপুরুষ হয়, চন্দ্রে চন্দ্র — হুঁঃ, আবার তোপা করছে, ইস্কি কত!" বন্ধুর মত ছেলেগুলো ঘুড়িটা নিয়ে কেটে পড়ল।

একজন পর মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখে পড়ছে। বসে আছে ফুটপাতের উপর পা ছড়িয়ে, ফ্রক পা-ঢাকা, ফ্রক হলুদ হয়ে আসা চুল, ফ্রকটাও জীর্ণ, কি রঙ ছিল এখন বোঝা যায় না, ডেলিটটিটে মেয়েটা মুখটা ঝামরা, কাঁদতেই বোধহয়। মেয়েটার উপর মায়া হল রাহুলের। স্বভাবই তো ওর কি দোষ? মেয়েটা কাঁদছে, মেয়েটার পিঠটা ওঠা নামা করছে কান্নায়। হঠাৎ মেয়েটা চোখ তুলল, কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ অবাক হয়ে থমকে গেল, তারপর একটু একটু করে কি একটা বস্তুর দিকে এগোতে লাগল। কি ওটা? ঘুড়ির সেই ছেঁড়া লেজ, লেজটা পড়ে রয়েছে, চোখ মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। সদ্য কান্নার কিতেটা ভুলে গেল, একটু হাসলও বোধহয়, তারপর মাথার চারিপাশে জড়াল, কপালের উপর দিয়ে রিবনটা গোল করে ঘুরিয়ে মুখটা তুলে একটু হাসল বোধহয় আমায়, আর সঙ্গে সঙ্গেই পিটিয়ে উঠল রাহুল। মুখটা নামিয়ে রেখেছিল বলে দেখতে পায়নি, একে? এ এখানে কি করে এল? কি করে? রাহুল যার দেখতে না তো! বিদ্যুতের মত এগোতে লাগল রাহুল। ফুটপাত থেকে অন্যমনস্কভাবে পা রাস্তায় পড়ে যেতেই, হঠাৎ সমস্ত থেকে গতীরে পা পড়লে যেমন হয়, চমকে উঠল, আর সঙ্গেসঙ্গে গাড়িঘোড়া পেরিয়ে এসে উঠল অন্যফুটে। হ্যাঁ তাইতো সেই একই মুখ, কপালের উপর ঘোরাতে কাজের মত সদ্য কাপড়টা আটকে থাকায়, আরো বেশি করে মনে হচ্ছে। ও একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি নাম খুকি?" ও রাহুলকে দেখেনি, বড়মত চোখে বলল, "কলকলি"। রাহুল জিজ্ঞেস করল ও কে? তোমার মা?" বলল, "মা দিদী, তোমার পড়ে গেছে তো, ও এখানেই বসে থাকে তখ বাবুরা যায়, তাকে পয়সা দেয়," তারপর হঠাৎ উজ্জ্বল সুরে বলল, "তোমাদের এখানকার লোকেরা খুব ভাল, খু-উ-ব।" রাহুল বলল, "তোমার ঘুড়ি আজই এসেছে? তোমাকে আমি একটা লজেন্স কিনে আমি দেবো। বোধহয় একটু লজ্জা পেল ও, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ'। আবার মনে হল এ-ই 'সে', এ সে-ই। রাহুল তাকে আবধানা কাডবেরী দিল আর একটা দু' টাকা দিয়ে বলল, "ওই যে একটা ঘুড়ির দোকান দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে ঘুড়ি কিনে নিও - হ্যাঁ।" মেয়েটা নিল, নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভেতর থেকে একটা পুরুষালি কণ্ঠ ভেসে এল, "কার সঙ্গে কথা বলছিস রে কলকলি? কে? ভেতরে আয়, তোকে কতবার বলেছি না বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলবি না, ভেতরে আয় বলছি, হারামজাদী।" মেয়েটা চকোলেট আর টাকাটা কেঁটড়ে লুকিয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে গেল। রাহুল খুব বড়মত দেখে, বেশ অসুস্থ ছাড়ে পড়ল সে।

— "কিরে রাহুল, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস, কি ব্যাপার?" ঘুরে দাঁড়াল। কে? ও রাপেনদা, ইতার কলেজ টেবল-টেনিসে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবার।

— "না মানে, এই বাস ধরব তো তাই "

— "বাস ধরবি! তুই এখন বাড়ি যাবি না!"

— "হ্যাঁ সেইজন্যেই তো, সেইজন্যেই তো"

— "তাহলে এই উল্টোদিকের ফুটে?"—

তিন

এখন না গোধূলি না সন্ধ্যা। কোয়ারকমে বিকেলের জলখাবার সাকে মুখে তুলে মায়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, ওর পড়ার টেবিলের কাছে। 'সে', মেয়েটা নিশ্চয়ই 'সে', কিন্তু কি করে হয়। এটা হল ১৯৯৫ আর তখন হয়ে ১৯৩৩। এই একবার

পর একটা মানুষ কি করে একই ঘরানে থেকে যায়, আর তা ছাড়া ইতিহাস তো বলছে —, তার থেকে বাঁচা নামাল রাতুল। পরাজয়ের উল্লেখ আছে সে, আর সরকারের সময় যদি একটা জিনিসও খুঁজে পাওয়া যায়। ঘরের দেওয়ালে একটা টিকটিকি শব্দ করে ডেকে উঠলো। মুহূর্তে বলমূত্র যেন ঘড়িতে "চং, চং —" করে ছটা ঘন্টা বেজে উঠলো যেন কোন অপার্থিব জগৎ থেকে ভেসে আসা অলৌকিক আওয়াজ সবীরের মত।

ক্রমে ঘন্টার শব্দ কমে আসতে আসতে মিলিয়ে গেল অতলে। এই তো এই সেই ছবি, তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও ছেইজি ফুলের মত প্রস্ফুটিত সেই মুখ। এই তো সেই হাসি, যেন আলোকের গান। কপালে বাঁধা সবুজ ব্যান্ড, এই তো সেই — অ্যান ফ্রাঙ্ক, হিটলারের অন্যেনট্রেশন ক্যাম্পে যার মা বাবার উপর ভিলে ভিলে অত্যাচার করে শেষে নারকীয় পদ্ধতিতে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয়েছিল, যার বোনকে ভিলে ভিলে মৃত্যুর কোলে চলে পড়তে হয়েছিল নির্বিচারে, অথচ সেই যন্ত্রণাদায়ক বিষাক্ত নারকীয়তার মধ্যে বসে, এই তো সেই অ্যান যে লিখত তার সমৃদ্ধ ডায়েরিতে মানুষের উপর তার দৃঢ়বিশ্বাস বিশ্বাসের বাণী, যে লিখত "All men are basically good." কিন্তু তাকেও তো মরতে হয়েছিল সেই যন্ত্রণায় অথচ, তাহলে, তাহলে কি করে — কি করে —

"মা - মা" একটা মর্মভেদী ডাক। অনুভা সেনাই করছিলেন, হঠাৎ আদুলের ডগায় সুতোর তীক্ষ্ণ প্রান্তটা বিঁধে গেল, তিনি দ্রুত অন্যের দিকে এগিয়ে গেলেন। "একি রে তোর অমন কি হল? চোখমুখ লাল, হাঁফাচ্ছিস, কি রে তোর অমন জ্বরটর এল নাকি?" অনুভা তার কপালে হাত রাখলেন। "না ঠিকই তো আছে, কি দেখছিস বলতো অমনি করে। আরে, এটা তো অ্যান ফ্রাঙ্কের ছবি দেখছি, কিন্তু তুই ...., কি হল বলত তোর।" বিহ্বলজড়িত কণ্ঠে রাতুল বলতে লাগল, "জানো তো মা এই সেই, আমাদের কলেজের উল্টোদিকে এই - এই ছিন্নলীদের ঝুপড়ির সামনে এই বসে আছে, এই চোখ মুখ এই বিশ্বাস আজিই হয়ে আছে তার সমস্ত শরীরে—"

কিছুদিন ধরে পড়ে ছিল রাতুল। ঘরের দোরে সে কিসের বকম, " আন, বলিলন আন তুমি কেমন করে — তোমার হাতের মুঠি— ওরা কেড়ে নিল কেন — আন?"

দিন সাতেক পর সবে ভাত খেয়েই কলেজে এল রাতুল প্রায় জোর করেই। যান থেকে নেমেই উল্টোদিকে তাকাল ও । সে নেই। সব ঝুপড়ি সাফ। একটা হলদে 'নেই' সাদা শাড়ির উঁচল পাক খেয়ে, কলের পান দোকানে জিজ্ঞেস করতেই গাঁজাটু কালো মতো ছেলেটা জবাব দিল, "অ, সেই ছিন্নলীগুলো? ওরা মাঝে মাঝেই আসে এইখানে, চোর ডাকাইত্ লোক সব, কাল রাতে পুলিশ এসে ওদের ঝুপড়ি ভেঙে দিয়েছে, যত সব নোংরা ছোরের দল, তা আপনি ওখোজেন কেন? যেতের মূলধনি করে খেয়ে বলে পালা উঠলা নিয়েছিল, তা হলে আর পেলেন না, যেন যেন ওদের, চোর জোচ্চোর লোক ওরা বস্—"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ▲▲▲

Welcome to :

Phone :
3177/3272/3397
STD CODE : 03242

HOTEL SAPTARSHI

(A deluxe Hotel of Bankura at Lalbazar Bus Stand, Bankura)

Available AC, Non AC deluxe Rooms, Conference Hall, Banquet Hall, Bar, Restaurant, TV in all rooms, Laundry, STD, Doctor on Call, Room Service, Taxi Service, Parking facilities.

Sister Concern

HOTEL AMRAPALI

(at Mukutmanipur, Bankura)

Available Double Beded Rooms attached and non attached bath with Restaurant Service. STD-0343, Ph. - 53206

With Best Compliments From

The Bank Employees' Co-op. Bank Ltd.

(Registration No. 5. Calcutta of 1947)
23A, Netaji Subhas Road (3rd & 4th floor)
Calcutta - 700 001
Phone : 220-8564

We are glad to inform our members customers, constituents and all well-wisher that, after marching over 48 year's glorious achievement. **The Bank Employees' Co-operative Bank Ltd.**, has stepped into the most important functioning of a Bank whereby comencing Cheque Clearing facilities on and from 04.02.91 under Calcutta Bankers' Clearing House.

Earn & Earn to Save ☐ ***Making Savings the First***
Item of your Expenditure ☐ ***Save for Safety and Security***

We offer higher rate Interest on Savings and other Term Deposits of the public.

Rate of Interest on Fixed Deposit & other Deposits

Savings Banks	5.5%
For Deposit of 46 days to 90 days	10%
For Deposit of 91 days & above but less than 1 year	11%
For Deposit of 1 year & above but less than 3 years	12%
For Deposit of 3 years & above	12.5%

Recurring Deposit of Rs. 10/- to Rs. 1000/- & Co-operative Yojna of Rs. 500/- to 10,000/- earn quarterly compound interest for 12 months and for 24 months and 36 months & above.

N.B. : ***Rate of Interest are subject to RBI guidelines.***

ALL DEPOSITS ARE INSURED WITH DEPOSIT
INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION

Prompt in service : Cordial in behaviour : Co-operation in activities :

For particulars please contact Secretary

ENJOY OUR HOLIDAY HOME AT PURI

গল্প

অবসর আলাপন

তুলসী মুখার্জি

— ইমন।

— ইমন রায়।

— ইলেকট্রনিক্স ইনজিনিয়ার।

সেটেল-এ আজ প্রায় সাত বছর। ওখানেই সেটেল করেছে। বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কলকাতা এসেছে। সঙ্গে স্ত্রী কৌশিকী আর চার বছরের ছেলে মহারাজকে নিয়ে। শেষ এসেছিল বছর পাঁচেক আগে। মায়ের শেষ কাজ করতে। একা এসেছিল, কৌশিকীর তখন এ্যাডভান্সড্ স্টেজ অব প্রেগনেন্সি। মহারাজ তার ঠাকুমা-ঠাকুমাকে ফটোতেই চেনে।

মায়ের শেষ কাজ, নিয়মভঙ্গ সবকাজ সব মিটে গেছে। কৌশিকী মহারাজকে নিয়ে আজ সকালে ওদের বাড়ি গেছে। জেঠুদের সঙ্গে দেখা করতে। আবার সেটেল-এ ফিরে যেতে হবে। প্রস্তুতি চলছে, কাঁকে কাঁকে। ইমন বাড়িতে একা। এটা সেটা নেড়েচেড়ে দেখছে। সব জিনিসেই মা-বাবার স্পর্শ। ওঁদের স্মৃতি জড়িত।

মনটা বিষণ্ণতায় ছেয়ে আছে। দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বাবার বলা কিছু কিছু কথা আজ তীব্রভাবে মনে পড়ছে। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। অনুশোচনায় ভিতরটা ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

ইমনের বাবা উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক ছিলেন। প্রায় বছর দশেক আগে অবসর নিয়েছিলেন। জয়-জয়ন্তী সমবায় আবাসনে মোটামুটি সুন্দর বাড়ি করেছেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রেখে। এই সমবায় আবাসন ওঁরাই উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল। নিজের দেশকে একটু বেশি ভালবাসতেন। সমাজ নিয়ে, দেশ নিয়ে ভাবতেনও। একটু বেশী বয়সের ছিলেন। একটা ইশের কাজ করতো ওঁর মতে। ওঁর মত সেরা মেধা স্বাধের পক্ষে তা যোগ্যতম ছিল না। একমাত্র সন্তানের বিদেশি হয়ে যাওয়া মেনে নিতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি।

এসবই ইমনের জানা। মা-বাবা দু'জনেই চলে গেছেন। কিন্তু ফিরে গেল। আর হয়তো কোনদিন কলকাতায় আসাই হবে না। আসার প্রয়োজনই হবে না।

— মেসের কথা, মা-বাবার কাছে তোমার প্রয়োজন কি আদৌ কিছু অবিশিষ্ট ছিল ইমন?

অপরাধী মন। নিজের ওপর সঞ্চিত ক্ষোভ, রাগ, বিস্ময় একসঙ্গে গলে চোখের জলে পরিণত হ'ল।

কাঁদ ইমন, কাঁদ। এই শেষ সুযোগ। চোখের জলে মাতৃভূমির তর্পণ করার এই শেষ সুযোগ।

বিদেশে পড়তে যাওয়া থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাবাই তাকে সেটেল-এ পাঠিয়েছিলেন। ওঁর আত্মহত্যেই যাওয়া। পড়াশুনো শেষ করে দেশে ফিরে এসেছিল ইমন। বহু চাকরিও করত কলকাতায়। কিন্তু মন যে বিদেশে বাঁধা রেখে এসেছে তা জানতে মা-বাবার অন্তত এক বছর সময় লেগেছিল।

কৌশিকীর বাবাও সেটেল-এ সেটেল করেছেন। তিনিও ইলেকট্রনিক্স ইনজিনিয়ার। নিজের ব্যবসা। যথেষ্ট বিত্তবান। বনেদিয়ানা আছে। কলকাতায় পৈতৃক বাড়িও আছে। তবে অনেক দিন আসেননি। একমাত্র সন্তান কৌশিকীর মনের খবর জানতে পেরে কলকাতা এসেই ইমনের বাবার সঙ্গে দেখা করে বিয়ের প্রস্তাব। বিয়ে। বিয়ে। এক মাসের মধ্যে সব হয়ে গেল। মেয়েকে যৌতুক বাড়ি ছেড়ে যথাস্থানে ফিরে গেলেন।

শিক্ষিতা, সুন্দরী পুত্রবধূ আর বড়লোক বিয়েনি পেয়েই পেয়ে মা-বাবা খুব খুশি। কেন আনন্দেই ছিলেন। সেই আনন্দ যে এত স্বল্পস্থায়ী হবে এঁদের তা জানা ছিল না।

কৌশিকীর বাবা কলকাতায় নাতনিকে বিদেশে ফিরে। আসলে ছক কষা আগেই হয়েছিল। শুধু যাওয়া বজায় রাখতে কয়েক দিনের আগোষ আর ঘুরতের আড়াল সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল।

ওদের বিয়ের মাস দু'য়েক যাবার কৌশিকীর বাবার চিঠি এলো ইমনের বাবার কাছে। সঙ্গে মেয়ে-জামাইয়ের জন্য দু'খানা এয়ার প্যাসেজ। ছোট্ট চিঠিতে প্রস্তাব, ক'দিনের জন্য ইমন, কৌশিকীকে নিয়ে এখানে বেড়িয়ে যাক। এখানে মেয়ে বিয়ের পার্টিও দেয়া হবে আর ওদেরও সেট হানিমুন করা হবে।

— ওটা তো ঠিক প্রস্তাব বা অনুরোধ ছিল না। বরং আদেশ ছিল বলা যায়।

ইমনের ভিতরটা জ্বালা করে উঠলো। বিস্ময় নিল নিজেকে। সব পরিকল্পনার শেষ অংশ নিয়েছিল। শুধু স্বভাবকে দোষ দেওয়া যায় না। নিজের মা-বাবার সঙ্গে ছল-চাতুরি করেছে। দেদার। বিয়ে করার আগেই নিজেকে রিক্তি করে এসেছিল। সাময়িক মোহ আর লোভের কাছে হারিয়ে গিয়েছিল সব আদর্শ, কর্তব্য, মুক্তি-তত্ত্ব।

— ছি ইমন, ছি।

কৌশিকীকে নিয়ে চলে গিয়েছিল ইমন। মাস দুই পরে একা ফিরে এসেছিল।

মা-বাবার ব্যাকুল প্রশ্ন, ফিরে, বৌমা কোথায়?

—কৌশিকীর শরীর খারাপ। ছোট লালে সহ্য হবে না। তাই রেখে আসতে হয়েছে।

— যা যা ইমন, যা। নিজের মা-বাবার কাছে কি সুন্দর অভিনয় করেছিলে। কত বড় মিথ্যে বলেছিলে।

বুকটা ফুলে উঠলো ইমনের। আসলে কৌশিকী এলেনে থাকবে না। ওঁরাও চান না ইমন এখানে সাধারণের একজন হয়ে থাকে। ইমনও সেটেল-এ সেটেল করুক ওঁরা তাই চান। চাকরির ব্যবস্থা করাই আছে। ফিরে গেলেই হ'ল। আসলে মেয়েকে ওঁরা কাছ ছাড়া করবেন না। তাছাড়া শ্বশুরের ব্যবসার মালিক তো ওরাই হবে। ওদেরই দেখতে হবে।

— কিন্তু ফিরে যাবার একটা অজুহাত তো সৃষ্টি করতে হবে। তা যে কিছুতেই হচ্ছে না। সরাসরি বাবাকে এ কথা বলার মত

সাহসও পাচ্ছে না।

মা-বাবা বেশ কয়েক বার বলেছেন, কৌশিকীর শরীর এখন কেমন আছে, কবে আসবে ইত্যাদি।

এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। কোন উত্তরই ছিল না দেওয়ার মত।

দু'তিন দিন পরপর কৌশিকীর ফোন এসেছে। প্রশ্ন একটাই — কবে ফিরছো?

—এই যাবো, মাম্মি গোছের এড়িয়ে যাওয়া উত্তর দিয়েছে।

ইতিমধ্যে মাস দুই কেটে গেছে। কৌশিকীর বাবা একদিন ফোনে ইমনকে বললেন —

— এভাবে চলতে পারে না। আমার একমাত্র সন্তানকে আমি ওদেশে মুখে কোনদিন থাকতে দিইনি, থাকতেও দেবিনি। ওর অবস্থা দেখে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। আমি আজই তোমার ফিরে আসার টিকিট পাঠিয়ে দিলাম। ওপন আছে। টিকিট পৌঁছুলেই অফিসিয়েট পলিসিস্ জয়েন ডেট জানাবার করে আমাকে জানাও। কৌশিকী উইল রিসিভ ইউ এ্যাট দ্য এয়ারপোর্ট। ওর কোন কিপ ওভ মাই বয়। গড ব্লেস ইউ।

এটাও আন্দাজই ছিল। মতামত চাননি। মা-বাবা কেমন আছেন জিজ্ঞেস করেননি। পারফেক্ট বিজনেস টক। ভাল করেই খেলেছিলেন শ্বশুরমশাই।

পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে বাস্তবে আসল কথা এখন না বলে উপায় নেই।

খুব সাহস করে এক রবিবার সকালে বাবাকে বলেছিল — এদেশে কৌশিকীর শরীর সুস্থ করছে না, ও আসতে চাইছে না। সেটেল-এ চলে গিয়ে ওখানেই সেটেল করতে চায়।

কথাগুলো শুনে মুখ নেই করার মৃদুটা ইমন কোনদিন ভুলতে পারবে না। মা শুধু কেঁদেই ছিলেন। কোন অভিযোগ করেননি।

বাবা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল সত্য সমাজ কোন সুদৃশ্য ইমারতের হঠাৎ ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া বনেদীয়ানা-এর দিকে তাকিয়ে আছেন।

— কবে ফেরে চাও?

— এখনও দিন ঠিক করিনি।

— সেটাও করতে শুরু কর। যাওয়ার দিন ঠিক কর। এ নিয়ে আমার মতামত দেওয়ার বা আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। যে রকম ভাল মনে হবে তাই কর। শুধু যাওয়ার আগের দিন, তোমার সুবিধা মত, যে কোন সময় আমাকে ফটা ধানেকের মত সময় দিও। তোমাকে কিছু বলবো। তবে আর কখনও সুযোগ না হয়।

বাবার এই ঠান্ডা ব্যবহার ইমনকে ভাবিয়েছিল। গলাফলা, রাগারাগি করলে বোধ কিছুটা সান্ত্বনা পেতো। সে এক অসহনীয় অস্বস্তি। মন্দ কাজে ফেরেও কি রকম বাঁধে বাঁধো লাগতো।

দিন পনেরোর মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। যাওয়ার আগের দিন সকালে

— বাবা, আমি কাল রওনা হব। সকাল সাড়ে দশটায় ফ্লাইট।

— আমাকে কখন সময় দিচ্ছ?

— আজ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ।

— ঠিক আছে।

সন্ধ্যা বেলা বাবা-মা এক ঘরেই ছিলেন। ফোনের সঙ্গে সঙ্গে বাবা কথা বলতে বলে কোন ভনিতা না করেই বলতে শুরু করেছিলেন।

— যা বলবে শুধু শুনে যাবে। তোমার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাইছি না। কোন উত্তর আশা করছি না। বিদেশে পড়াশোনা করে এলে নিজের দেশে অনেক দাম বাড়বে — এই অকাঙ্ক্ষায় আমি তোমাকে বিদেশে পাঠাই-নি। তোমার বিষয়টি নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনার সুযোগ তখন এদেশের চেয়ে স্টেটস-এ ভাল থাকায় তোমাকে পড়তে পাঠিয়েছিলাম। যথেষ্ট কষ্ট করে তোমার পড়ার খরচ যুগিয়েছিলাম। শুধু তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষায়। সেদিক থেকে আমি সফল। তুমি আজ সার্বিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত। তোমাকে ইনভিনিয়ার করতে আমাদের এই পরিবার দেশ অনেক খরচ করেছে। আমি বাবা, আমার কর্তব্য তাই তোমার জন্য খরচ করেছি। তোমার কাছে আমাদের প্রত্যাশা তুমি আমাদের দেখবে, সঙ্গ দেবে। তোমাকে ঘিরে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সৃষ্টি হবে। আমাদের সামনে যারা বেড়ে উঠবে। আমরা দেখে তৃপ্তি পাবো। এই প্রত্যাশা। তোমার কাছে আর্থিক সহায়তার প্রত্যাশা নেই।

তোমার কাছে দেশের প্রত্যাশা — তুমি বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে দেশের কাজে সহায়ক হবে। প্রগতিতে অংশ নেবে। উচ্চতর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দেশকে সমৃদ্ধ করবে।

— আমাদের প্রত্যাশা আমরা প্রত্যাহার করে তোমাকে দায়মুক্ত করলাম, দেশের কাছে তুমি ঋণ রেখে যাচ্ছো। সে দায় কিভাবে মেটাবে, তোমার ভাবনা।

— আমরা তোমাকে ফেরে যেতে মানা দিচ্ছি না। কারণ 'ব্রেন-ড্রেন'-এর এই চিন্তা আর মানসিকতার অবক্ষয়ের সঙ্গে আমি আপোষ করতে নারাজ। তাছাড়া তোমার ক্লাসফেলো থাকার কথা নয়। এ দেশেও তুমি যথেষ্ট সম্মানীয় পদে কাজ করতে।

— তুমি জানোই, তাই তোমাকে আটকাবো না। আমাদের কাছে চিঠি লিখে পার। উত্তর পাবে না। কেন করতে পার, তোমাদের কথা শুনব, আমাদের খবর জানতে চাইবে না। আমি এবং আমার স্ত্রী কে আগে এবং কবে মারা যাবো জানি না। আমাদের মৃত্যু সংবাদ পাবে। আসা না আসা তোমার ব্যাপার। তোমার মা আগে মারা গেলে ভাল হয়। আমি নিজে তাঁর শেষ কাজ করতে পারবো।

যাই হোক, আমাদের দু'জনের শেষ কাজের জন্য আলাদা করে টাকা পয়সা থাকবে। তাতেই কাজ শেষ করতে হবে। তোমার কোন টাকা কেন ঐ কাজে যা লাগান হয়।

— তুমি কখনো আমাদের নামে টাকা পাঠাবে না। পাঠালে ফেরত যাবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য জীবনে সফলতাই কাম্য। অনেক অর্থ উপার্জন করলে স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে। সুখ আসবেই তার কোন গ্যারান্টি নেই। অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়।

— তোমরা যখন নিজের দেশ, বাবা-মা-এর জন্য কোন আকর্ষণ নেই, ঘরে ফেরার মন এদেশের এই বাড়ি তোমার কোন কাজে লাগবে না। তাই এই বাড়ি আমাদের অবর্তমানে কোন বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হবে। বাড়ির অছিলায় তুমি পাবে না।

— কাল তোমার মাকে নিয়ে সকালে এক জায়গায় যাবো। তোমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে যাওয়া সম্ভব হবে না। তোমার প্রতি আমাদের রাগ, অভিমান, ক্ষোভ কিছু নেই। সন্তানের

আমরা কামনা কোন অবস্থাতেই কেন করতে পারে না। আমরাও করছি না। তোমরা সুখে থেকো।

বাবা এক মনে কথাগুলো বলে উইলটা দিয়েছিলেন। মা বসে বসে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছিলেন।

— বাবার চোখেও কি জল এসেছিল? তা লুকোবেই উইলটা?

আজ এর উত্তর কারো কাছে পাওয়া যাবে না। যাঁরা দিতে পারতেন তাঁরা কেউ নেই।

ইমনের মনটা ব ব করে উঠলো। চোখের জল বাঁধ মানছে না। যদিও এই চোখের জলের আজ যেন মূল্য নেই।

আজ কাজ শেষ করে ফিরে যাওয়ার আগে অনেক চেষ্টা করেছিল ইমন বাবার সঙ্গে সহজ হতে। নানা বিষয়ে কথা বলে বাবাকে হালকা করতে। সফল হয়নি। বাবার কোন পরিবর্তন হয়নি। খুব সাদা করে একদিন ইমন বলেছিল, বাবা, তুমি তো কোন দিনই আমার কাছে যাবে না তাহলে। এতদিন যা ছিলেন, আমি ভাবিনি। এখন তুমি একা এত বড় বাড়িতে কি করে থাকবে? আমি একটা ওল্ড এজ হোম-এর সঙ্গে কথা বলেছি। ভাল ব্যবস্থা। তুমি সেখানে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরতে পারি।

— বাবা একটুও রাগ করেননি আমার কথা শুনে। শুধু বলেছিলেন, যেদিন ছেড়ে যাওয়ার সময়ই তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম। আমাদের কাছে তোমার কোন দায়বদ্ধতা নেই। আমাকে নিয়ে ভাববে না। আমার ব্যবস্থা আমিই করে নেব। তুমি নিশ্চিন্তে ফিরে যাও।

এবার ইমন ফিরে যাবে বলে মুক্ত হবে। কোন সিদ্ধান্তই অবশিষ্ট রইল না। নিজের দেশে আসার প্রয়োজনও শেষ হয়ে গেল।

এসব ভাবছে আর ঘাঁকা বাড়িতে এল আসনে বাবার ঘরে তাঁর পড়াশুনা করার টেবিল, চেয়ার, ড্রয়ার, আলমারি সব খুঁজেপেতে দেখছে। বাবাকে লেখা ইমনের কিছু চিঠি পেল ড্রয়ারে। সব কটা চিঠির উপরের বাঁ কোণে তারিখ সহ বাবার ইনস্ট্রিকশন করা। চিঠিগুলো একসঙ্গে গার্ডার দিয়ে আটকানো। শেষের দিকে অল্প দুই আর চিঠি লেখেনি ইমন। কেনই বা লিখতো। বাবা একটা চিঠিরও উত্তর দেননি। অল্প মৃত্যু সংবাদ জানার জন্য কখনও কোনও করেননি।

বাবা-মাকে দেওয়া আঘাত আজ চতুর্গুণ হয়ে ফিরে এসেছে ইমনের বুকে। ভিতরটা কেটে চুরমার হয়ে গেছে।

— যেদিন ছেড়ে যাওয়ার সময় বাবা বলেছিলেন বাড়িটি বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হবে। কি সেই বিশেষ কাজ? খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। তাছাড়া, আর দু'তিন দিনের মধ্যেই ওদের ফিরে যেতে হবে। কাজ বাড়ির কি ব্যবস্থা করেছেন জানা নেই। যাওয়ার আগে বাড়ি কি করে যাবেন এসব ভাবতে ভাবতে একটা মোটা খাম পেল আলমারিতে। খামের মধ্যে একটা 'উইল' আর কিছু। সঙ্গে ইমনকে লেখা একখানা চিঠি —

স্নেহের ইমন,

জানি না এই চিঠি তুমি কবে পাবে, বা আদৌ পাবে কিনা। আমার আর আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাড়িটি "জয়-অরন্তী" সমবায় আবাসনের ডিরেক্টর বোর্ডের অধীন মেম্বার ওয়েলফেয়ার কমিটির দায়িত্বে থাকবে। বাড়িটির ট্রাস্টিও ঐ কমিটিকেই করা হয়েছে।

সমবায় আবাসনের বাড়ি করার জমি সরকার নিয়েছেন অনেক কম দামে। কোঅপারেটর স্ট্যাম্প ডিউটিও মকুব করেছেন সরকার।

আমি স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের মানুষ। আমার মূল্যবোধের কমপোস্ট-এর সঙ্গে অনেকেই একমত হবে না। যেমন পারনি তুমি। আমি মনে করি, সমবায় সমিতির সদস্য হিসেবে যে সরকারি সহায়তা পেয়েছি, তার বিনিময়ে আমার কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। সন্তানের স্নেহের জন্য কিছু করা উচিত।

তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কর্মজীবন থেকে তো বটেই, জীবন থেকেও অবসর নেওয়ার দিকে যাঁরা অনেক পথ পেরিয়ে এসেছেন, শুধু তাঁদেরই আলাপন হবে এই বাড়িতে। যাঁদের সন্তান থেকেও কিছু নেই, শুধু তাঁরাই থাকবেন এ বাড়িতে। যাঁদের কৃতবিদ্য সন্তানেরা স্নেহের বন্ধনে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে, মা-বাবাকে অসহায় করে এদেশে ফেলে রেখে — এই বাড়ি সেইসব অসহায়দের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আবাস, ওল্ড এজ হোম, বৃদ্ধ-আশ্রম নামগুলোর মধ্যে কেমন একটা অবহেলা মিশে আছে। মৃত্যুপথ যাত্রী মনে হয় এঁরা যেন সমাজের মূল স্রোতের বাইরে থাকা অপাংক্তেয় কিছু মানুষ। এ ধরনের ভাবনা থেকে এই বাড়ির আবাসিকদের কষ্ট না দেয়, তাই বাড়িটির নাম দিলাম "অবসর-আলাপন"।

ইতি

শুভার্থী

মমা

▲▲▲

ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য সংবেদ

পুরী, দীঘা ও দার্জিলিং-এর উত্তম ও মনোরম পরিবেশে

হলিডে হোম

যোগাযোগ করুন ঃ

রাইটার্স বিল্ডিংস এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্যান্টিন এ্যান্ড স্টোর্স লিমিটেড

মহাকরণ, 'ই' ব্লক, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলিকাতা - ৭০০ ০০১ (ক্যান্টিন অফিস)

দূরভাষ ঃ ২৫-৫৬০১ এক্সটেনশন - ৫১১

With
best
Compliments
From

NORTH BENGAL STATE TRANSPORT EMPLOYEES' COOPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

Siliguri

Regd. No. 20 Dt. 30.3.89

1.	Number of membership	85
2	Paid up Share Capital	Rs. 8,76,320/-
3	Thrift Fund	5,02,025/-
4.	Working Capital	65,31,716/-
5.	Net profit '94-'95	96,306/-

N.B. : We have started consumers business for the members.

Supravash Kali	**Uday Sankar Bose**	**Subhas Ch. Sarkar**
Chairman	*Vice-Chairman*	*Secretary*

বিশেষ রচনা

কদম

দেবশংকর রায়

সেদিন সকাল দশটায় — অসহায় কন্যার মাস্টারের চোখের সামনেই ঘটে গেল ঘটনাটা। পর পর বেশ কয়েকটি মূত্রাসনের ঘায়েই কদম মুর্ছিতে আছড়ে পড়তেই মাস্টার আর্তচিৎকার করে উঠল বুকের ভেতর থেকে "— ওরে কদম, কদমরে তোকে বাঁচাতে মুই পারলুম না — তোকে ওরা খুন করল; আমাকেও একদিন খুন করবে। ওরা বড় নিষ্ঠুর বড় হিংস্র মানব পশুর দল।"

তারপর দু'হাতে চোখ ঢেকে সারাদিন তিনি বিছানায় পড়ে থুলে থুলে অনেকক্ষণ কাঁদলেন —। এক সময় কান্না বন্ধ হলেও কানে ভেসে আসতে লাগলো মানব পশুদের মূত্রাসনের সঙ্গ-প্রতিসঙ্গ ঠন্-ঠন্ ঠনান্ — ঠন্-ঠন্ ঠনান —।

পিতৃ স্নেহের যন্ত্রণা। আঁতকে উঠলো কন্যার মাস্টার। ততক্ষণে অন্ধকার মাখানো বাড়িময় কদমের স্নেহময় বড় উঠল মা-মা-মাহ- মা মা মাহ —।

রাত্রিতেই কন্যার মাস্টার ঠিক করে ফেললেন — "না এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। যেদিকে দু চোখ যবে সেদিকেই সে চলে যাবে তবু ছেলে-বৌ এর সংসারে আর নয়। কিসের জন্য থাকবে। কার জন্য থাকবে—? আর কিসেরই বা মায়া। সংসারে আর কেউই থাকলো না। সেই কবে স্ত্রী অপরাজিতা গেছে আর আজ কদম —। না-না এই অপমান পুঁজিতে আর নয়।

স্থির সিদ্ধান্ত। রাত্রি ভোর হতে না হতেই মাস্টার সবার অলক্ষ্যে, একটি শান্তিনিকেতন ব্যাগ সম্বল করে বোলপুর স্টেশনে এসেই হাওড়াগামী ট্রেনে চেপে বসলেন।

ট্রেনে চেপেই কন্যার মাস্টার যেমন এক ঘোরে পড়ে গেলেন। ঘোরে রাতার ঘোরে তার মৃতা স্ত্রী এসে হাজির হলেন।

— স্ত্রী অপরাজিতাকে পেয়েই কন্যার মাস্টার আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন — "কিন্তু কদমরো। অপরাজিতা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে মিষ্টি কণ্ঠে ভালোবাসার সুর তুলে বললেন "— দেখবে মাস্টার দেখবে এই কদম একদিন কত বড় হবে কত সুনাম হবে কত মানুষ ওকে ভালোবাসবে — এই পৃথিবীর মত সব কবু চক্র পাপ-পাপালী পশু-চালী আমাদের কদমকে ঘিরেই থাকবে। দেখো মাস্টার কদমের জল হাস পড়ে প্রকৃতি একদিন আমাদের এই ছেলে অভিনয় — এসে তার বাঁচবে। হয়তো সেদিন পৃথিবীর একজন থাকবো না কিন্তু আমাদের কদমের ছায়ায় তলে এসে বলবেই অনুভব করতে পারব আমরা বেঁচে আছি — কি গো ঠিক বলছি না· বলেই অপরাজিতা মানুষের জাগল পরা দুটি চোখ তুলে বলেছিলেন — "যাও মাস্টার যাও কদমকে একবার আমার হাতে দাও।" কন্যার বাবু কদমকে সস্নেহে স্ত্রীর হাতে তুলে দিতেই অপরাজিতা কোমল সুরে কদমকে আদর করতে করতে বলেছিলো — "কদম আজ আমরা তোকে এই পৃথিবীর জলবায়ু-আলো-বাতাসের মহিমময় প্রকৃতিতে কন্যা সন্তান সম নতুন করে জন্ম দিলাম। দুই জনের অনেক বড় হয়ে ওঠ কদম——।" ঘোরের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কন্যার মাস্টারের মনে হচ্ছিল এই তো সেদিনের কথা — আজ —

ঝাঁকুনি খেলেন —। মাস্টার বেশ জোরেই ঝাঁকা খেলেন। পাশের সিটে বসা অচেনালোকটি বললেন — আরে আপনিতো বেশ মশাই, — উঠুন হাওড়া এসে গেছে — ঘোর কাটা দুটি চোখ মেলে তাকালেন কন্যার,— কন্যার মাস্টার।

হাওড়া স্টেশনের জন আরণ্যের মিছিলে পা মেলাতেই কন্যার মাস্টার ডুবে গেলেন ভেসে গেলেন অসহায় সমুদ্রের অজানা নতুন দেশে —।

তারপর আর কিছুই মনে করতে পারেন না — কি করে এই অচেনা হসপিটালে এসেছেন কেই বা এনেছে। কে নিয়ে এসেছে। কোথায় তার ঠিকানা। যখনই মেঘলাই ঠন্ ঠন্ ঠনান-ঠন্-ঠন্ ঠনান শব্দ ভুলে যান যায় যেমন এক পশুপাখিদের মধ্যে ফেলে দেয় আর ঠিক তখনি চোখের সামনে ভেসে ওঠে কদমের সেই মর্মভেদী কান আর্তনাদ মা-মা মাহ-মা মা মাহ——।

— না, তখন আর কন্যার মাস্টার চুপ করে থাকতে পারেন না যিনি অসহায় প্রতিবেশী কণ্ঠে আকাশ-বাতাস-প্রকৃতিকে কাঁপিয়ে চিৎকার করে ওঠেন '— না-না কদম কে তোমরা খুন কোরো না — ওরো তোমাদের কোন অনিষ্ট করেনি —'

'— শোন বৌমা, তুমি অন্তত শোন কদম বেঁচে থাকলে - আমাদের এই সুন্দর প্রকৃতির মহিমা পৃথিবী বেঁচে থাকবে। কদম বাড়ির সৌন্দর্য নষ্ট করছে এই মিথ্যা অজুহাতে তুমি ওকে খুন কোরো না বৌমা। ওদের ফিরে যেতে বলো, না হলে দেখবে তোমরাও একদিন খুন হবে। কদম যে আমাদের প্রকৃতির প্রহরী।' কথাগুলো চিৎকার করে বলতে বলতেই কন্যার মাস্টার অসহায় উত্তেজিত হয়ে ওয়ার্ডে-জানালার গ্রিলে দেখলাই ধরা যাচ্ছেন আর শোনা যায় ঠন্ ঠন্ ঠনান — ঠন্ ঠন্ ঠনান ——।

এদিকে সারা ওয়ার্ডে তখন হৈ-চৈ পড়ে যায়। ডাক্তার নার্স-কেয়ারী-বেয়ারা-আয়ী যে যেখানে থাকেন — সকলেই ছুটে আসেন।

— সকলেই এই ভাবে ছুটে আসতে দেখে কন্যার মাস্টার মাথায় ধরা মাথা বন্ধ করে অসহায় ছেড়ে পড়া মানুষের মতো দুটি হাত জোড় করে আবারো বলতে থাকেন — ওনুন আপনারা ভালো করে ওনুন — স্যার আমার পুরবধূ — হাঁ-হাঁ আমার পুরবধূ চন্দ্রা কদম কে খুন করেছে। আমি তার জীবন্ত সাক্ষী। স্যার চন্দ্রাদেবীর শাস্তির জন্য আমি আপনাদের কাছে সত্য বিচার ভিক্ষা চাইছি —। অসহায়-উত্তেজিত মানুষটিকে সান্ত্বনা দিতে ডাক্তার বাবুরা এগিয়ে আসেন। এক বছর কাল এই সাতচল্লিশ নম্বর রোগীটির চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিন্তু সত্যি আশ্চর্যের কথা ডাক্তার বাবুরাও অনুসন্ধান কোন হদ্দ খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে ওঁরা একটা জিনিস গত বছরও লক্ষ

করেছিলেন এবার ও লক্ষ্য করছেন যে সাতচল্লিশ নম্বর রোগীটি বর্ষা বন্ধুর আগমন বার্তায় কেমন যেন একটিবারের বিবরতায় ভোগেন। মনে যেন খুঁজে পেতে চান - অথচ আশ্চর্য! রোগের যেন "দু" খুঁজে পাচ্ছেন না।

এদিকে প্রকৃতির কোলে গায় গাছগুলির মাথায় মাথায় কীট পতঙ্গের মুখে মুখে কচিপাতার পাখায় পাখায় বর্ষা বন্ধুর আগমন বার্তা পৌঁছেগেই কনক্কর মাষ্টার একেবারে নিশ্চুপ বিস্ময়ের ঘোর হয়ে ওয়ার্ডের জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকে উদার উদাসীন বর্ষার আগমন পানে আর ঠিক তখনি মাষ্টার ফ্লেশে পড়ে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে মনে পড়ে যায় কনক কে। বেচারা কনক কে। ভালোবাসার ও ভালো লাগার কনক কে- সর্বোপরি প্রকৃতির কনক কে আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ভেসে ওঠে কনক জীবনের ছবি — প্রতিচ্ছবি। অপরাজিতার সেই চোখ-সেই হাসি-সেই মুখ-না আর পারে না-বিষন্নতার ঘোর থেকেই কনক্কর মাষ্টারের গলায় আওয়াজ উঠে আসে, "আমাদের স্নিগ্ধ কনককে খুন করেছে চন্দ্রা ; মিঃ লর্ড আমি এই কনক্কর রায় কসম খেয়ে একজন একজন মহাপাতক -প্রকৃতি হত্যাকারিনি চন্দ্রা দেবীর সমিধ কামনা করছি। আমরা বলছি এখানে শেষ নয় মিঃ লর্ড চন্দ্রা দেবী কনক কে খুন করে পৃথিবীর পরিবেশকে হত্যা করেছে। পৃথিবীর অধিবেশন, জল, বায়ু, আলো আমাদের সর্বোপরি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে পৃথিবীর মহিমময় উপাদানকে স্বাভাবিক অবস্থাতেই খুন করেছে। ওকে আপনি কঠোর শাস্তি দিন।" কথাগুলো একটানে বলার পরেই উত্তেজিত কনক্কর মাষ্টার যেমন ধরা-ধরা করে কাঁপতে থাকে।

এতক্ষণেই চলে তার বর্ষা বন্ধুর দিনগুলি এবং তাকে সুস্থ করবার দায়িত্ব নিয়েই বার বার ছুটে আসেন ডাক্তার বাবুদের দল-মার্সদের দল।

ওরা আসবার পরই সাতচল্লিশ নম্বর রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয় ইলেকট্রিক শক্ থেরাপির ওয়ার্ডে।

কোন কোন দিন সাতচল্লিশ নম্বর রোগী ইলেকট্রিক শক্ থেরাপির ওয়ার্ডে যেতে না চাইলে কনকের লোভ দেখিয়ে নিয়ে যান সিস্টারেরা। কনকের লোভে কেমন সরল নিস্পাপ হয়ে সিস্টারের পেছনে পেছনে হেঁটে যায় একটি প্রকৃতি পৃথিবীর মানুষ বিষন্ন কনক্কর মাষ্টার। দুখী কনক্কর রায়।

●

সেদিন সকাল, সাতটায় ঝম্ ঝম্ বর্ষার বৃষ্টির মধ্যেই ঘেমে উঠল ওয়ার্ডের পাগলা ঘন্টি। সাতচল্লিশ নম্বর রোগী কনক্কর রায় হঠাৎ ওয়ার্ড থেকে বেড়িয়েই হসপিটাল চত্বরের পুকুরটির পাড় ধরে দৌড়াচ্ছে——। সাতচল্লিশ নম্বর রোগীটিকে বাঁচানোর দায়িত্বে, সারা হসপিটাল একটা হৈ-হৈ রব পড়ে গেল। ততক্ষণে কনক্কর মাষ্টার সব বাধা তুচ্ছ করে আরো বেগে দৌড়তে লাগলো —। এ দৌড় যেন উঁচু কাছে মহাজীবনের পথে দৌড় - এ দৌড় যেন সীমাহীন অসীম আসমের দৌড় —তার যে যেন হাজারো পাপের শাস্তি মুছি পায়ে এক করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের নিশানায় দৌড়েই চললো-দৌড়েই চললো।

- সকলেই ভাবলো আর উপায় নেই। সাতচল্লিশ নম্বর শেষ অবধি তাহলে আত্ম-হত্যাই করল। এই নিয়ে যে কয় ছাড়ে দোষ চাপাবে সেই নিয়ে কর্মীরা যখন বাদ্ বিতন্ডায় ব্যস্ত ঠিক তখনই সাতচল্লিশ নম্বর আর এক অঘটনিয় ঘটনা ঘটালো।

ঘটনার পর ঘটনার উপস্থিত মানুষেরা একটি অঘটন ঘটে যাবার আশঙ্কায় যখন বুক বাঁধার জন্য তৈরী হচ্ছে তখনি তারা দেখলো পুকুর পাড়ে হলুদ ফুলে ফুলে ঢাকা যৌবনবতী কদম গাছটিকে ধরে কনক্কর মাষ্টার আবেগ জড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো "ওরে কদম, কদম ও আমার, তুই এখানে কি রে এলি? তোকে যে মদন পতন জল ছেটে ফেলেছিলো-তুই কি করে আমার ফিরে এলি? কদম তুই পৃথিবীর প্রকৃতি ছেড়ে ছড়া আমরা কি কেউ বাঁচতে পারি বল? তোকে ছাড়া আমি কিছুতেই আর বাড়ি ফিরবো না —"

— আশঙ্কা মূর্ত হয়েই কর্মীরা ছুটে এলেন — সাতচল্লিশ নম্বর রোগী কনক্কর রায় কে কোনমতে টেনে হিচড়ে নিয়ে ওয়ার্ডে বন্দী করবার দায়িত্বে।

পুনরায় সাতচল্লিশ নম্বর রোগীকে সুস্থ করবার জন্য ডাক্তারবাবুরা একটি মেডিকেল বোর্ড বসালেন। আলোচনা চলাকালীন হাসপাতালের নবীন ডাক্তার অভিজিৎ চৌধুরী হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন -ইউরেকা-ইউরেকা, স্যার আমি একটা কমমূলা পেয়েছি। একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি স্যার? সিনিয়র ডাক্তার বাবুরা মুখ টিপে হাসলেন এবং মীহু গলায় সম্মতিসূচক করে বললেন — "এতদিন ধরে আমরা যা পারিনি সেটা উনি পারবেন বলছেন। তা ভালো। মেডিকেল বোর্ড, প্রেসিডেন্ট সকলের এ ব্যাপারে মতামত জানতে চাইলেন। তখন সিনিয়র ডাক্তারেরা অবজ্ঞা ভরা দৃষ্টি নিয়ে নবীন ডাক্তার অভিজিৎ চৌধুরীর দিকে তাকালেন এবং সমস্বরে কণ্ঠে বললেন —আমরা চেষ্টা করেছি এবার তার চৌধুরী যখন বলছেন তখন উনি একবার চেষ্টা করুন। বোর্ড প্রেসিডেন্ট তার পরামর্শও সম্মতি জানিয়ে আলোচনা শেষ করলেন।

শুরু হোল তার চৌধুরীর চিকিৎসা —।

হাসপাতালের সকলেই দেখেন সকাল-বিকাল কনক্কর মাষ্টার মাঝে সাতচল্লিশ নম্বর রোগীটিকে সঙ্গে করে তার চৌধুরী পুকুর পাড়ে সেই কদম গাছটির নীচে বসে রয়েছেন কখনও বা গল্প করছেন কখনও বা কদম গাছটির শাখাপ্রশাখা নিয়ে খেলা করছেন কখনও বা বর্ষার বৃষ্টিতে কদমের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা গান করে —।

অবাক হয়ে মানুষেরা কান পেতে শোনে। আর সিনিয়র ডাক্তারেরা ট্যারা চোখে ব্যাপার-ট্যাপার দেখে মনে মনে অবজ্ঞায় হাসি হাসেন। তাদের বোধ হয় তার চৌধুরীও পাগল হয়ে গেছেন। কিন্তু না একদিন এ অনুমান মিথ্যা করে দিলেন নবীন ডাক্তার চৌধুরী।

●

টেনশন্। হাই টেনশন্ শুরু হয়ে গেল নবীন ডাক্তার চৌধুরীর। আগামিকাল মেডিকেল বোর্ডের সামনে কনক্কর রায় সুস্থ নাকি অসুস্থ তার প্রথম পরীক্ষা শুরু হবে। প্রথমে উত্তীর্ণ হলেই সাধনা সার্থক।

এদিকে সত্যি সত্যি কনক্কর মাষ্টার সেই আগের মানুষটি হয়ে গেছেন। সব কিছুতেই তিনি স্বাভাবিক। মনে পড়ে সব কথা। বাড়ির কথা-স্কুলের কথা, প্রেয়সী সহধর্মিণী মেঘলতার

কথা —স্কুলের কথা। স্কুলের পাশে ছুটো মোকলীর কথা — প্রিয় ছাত্র রতন আর অন্নের কথা। গ্রামের প্রান্তে রথতলার কথা। চণ্ডীতলায় কেষ্ট যাত্রার কথা, বুড়ো কীর্তন ওয়ালা ঘুন্টী, ন'টা মাসের কথা — কবিরাজ জীবন উদ্বের স্মৃতি কথা _____। আর ঠিক তখনি মাষ্টারের বুকের ভেতর টায় টু-টু করে ওঠে মতো ক-ত কর্মিয়ার -মুর্শীদি কর্মিয়ার কত ভেসে _____। কত ওঠে_____।

কনক্কর মাষ্টারের ইচ্ছে করে — কত ইচ্ছে করে ওরে ফেরবার। ফিরে পেতে চাই সব কিছুকে কিন্তু পরক্ষণেই চন্দ্রা দেবীর কথা মনে পড়তেই দুপায় তার ফিরে না যাওয়ার জোটাই বেশি করে চেপে বসে_____।

মনে মনে ধিক্কার ওঠে — না এখানে আর নয়। যারা গরু-পালা পাখ-পাখি কীট-পতঙ্গ সর্বোপরি প্রকৃতিকে ভালোবাসে না সত্যিকার মূল্য বোঝে না তারাতো মানুষ নয়, তাদের তো মান-ধর্ম কিছু নেই। তারাতো পিশাচ। তার চেয়ে বরং নবীন ডাক্তার চৌধুরীর কাছেই জীবনের এই শেষ কটা দিন কটিয়ে দেবেন। ডাক্তার সত্যিকারের একজন মানুষ। প্রকৃতি প্রেমিক একজন মানুষ। উদার-উদাসীন একজন মানুষ। ডাক্তারের ছুটিহীন চেম্বার আবারো তিনি পূর্বের কনক্কর রায় হতে পেরেছেন। নবীন ডাক্তার চৌধুরীকে দেখা মাত্রই মাষ্টার আনন্দে উচ্ছ্বাসে মুহূর্ত ঘড়িয়ে জড়িয়ে ধরে আপন-জনের কণ্ঠে বলেন "— সাবাস ডাক্তার সাবাস, তুমি আমার জীবনে নবীন সন্ন্যাসী। তোমার প্রকৃতির ভালোবাসার মন্ত্র আমাকে আবার সত্যিকারের মানুষ করে বাঁচিয়ে তুললো। হে নবীন সন্ন্যাসী তুমি আমাকে ভাড়িয়ে দিও না।"

◆

মেডিকেল বোর্ডের সামনে সাতচল্লিশ নম্বর রোগী কনক্কর রায়কে উপস্থিত করা হোল। যখন পরীক্ষা — নিরীক্ষার পর ঘোষণা করা হোল "— সাতচল্লিশ নম্বর রোগী সম্পূর্ণভাবে সুস্থ।"

আনন্দের উত্তেজনায় ডাক্তার চৌধুরীর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর সমস্ত অভিনয়_____।

এদিকে ডাক্তার চৌধুরীর চিঠি পেয়েই রবিবার আজ রায়ের পোষ্টা পরিবার মহানন্দে বাবা কনক্কর মাষ্টারকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসার সংবাদে আনন্দিত হাসপাতালে এলেন। ভীড়ের মধ্যে মাতৃসী-প্রিয় মাতৃসী হেমলতাকে দেখতে পেয়েই কনক্কর মাষ্টার আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে আসতেই সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুত্রবধূ চন্দ্রাদেবীকে দেখার মুহূর্তেই আঁতকে উঠলেন এবং ঘৃণায় অসহ্য ঘৃণায় মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

চন্দ্রাদেবী ক্ষমা চাইতে যাবার মুহূর্তেই হেমলতা সবার পেছন থেকে ছুটে এসে গরু কনক্কর মাষ্টারের চোখের সামনে নিজের দুহাতে ধরে থাকা কলম গাছের চারাটি বসিয়ে দিয়েই প্রচন্ড খুব প্রচন্ড কনক্কর মাষ্টার তাঁর প্রিয় ছাত্রী - প্রিয় মাতৃসী হেমলতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আনন্দ অশ্রু ভেজা কণ্ঠে বলে উঠলেন ক-ল-য _____।

▲▲▲

সমবায়ী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ঃ

কন্টাই কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

কাঁথি ঃ মেদিনীপুর
ফোন নং ঃ কাঁথি - ৪৫১৮৪

কৃষি, অকৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, ছোটগাড়ি ও গৃহনির্মাণ প্রকল্পে স্বল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণগ্রহণের জন্য

যোগাযোগ করুন ঃ

শাখা অফিস ঃ
কাঁথি, এগরা, হেঁড়িয়া, পটাশপুর ও রামনগর

কলিকাতার বাইরে যেতে দূরপাল্লার বাসে

কি ভাবছেন? বাইরে বেড়াতে যাবেন?
কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা
দূরপাল্লা রুটের সার্ভিসের মাধ্যমে আরামে ও স্বচ্ছন্দে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে
নিয়মিত যাতায়াতের ব্যবস্থা রেখেছে অল্প সময়ে এবং কম খরচে।

বেড়িয়ে আসুন —
দীঘা, বিষ্ণুপুর, জয়রামবাটি, কামারপুকুর, মুকুটমণিপুর, তারাপীঠ, কল্যাণী, হলদিয়া,
নামখানা, মুর্শিদাবাদ, যাজ্ঞাগ্রামুন্ডারী, রামপুরহাট।
পুর্ণিয়া, বালুরঘাট, দীঘা, রাজগীর, রাজগীর, শিলিগুড়ি যাতায়ার জন্য চালু রয়েছে রাত্রিকালীন বাস সার্ভিস।

এসব ছাড়াও আরো অনেক জায়গায় আমাদের নিয়মিত দূরপাল্লার সার্ভিস চালু আছে।
অগ্রিম টিকিট কাটারও ব্যবস্থা রয়েছে।

টিকিট প্রাপ্তি স্থান ঃ
দূর পাল্লার বাস স্টেশন, ধর্মতলা
দূরভাষ ঃ ২৪৮-১৯১৬

দীঘা বুকিং অফিস ঃ দূরভাষ — দীঘা - ৩৬২১৭

আপনাদের আরাম ও নিরাপত্তার ব্রতী

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা

৪৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলিকাতা - ৭০০ ০১৩

মনে রাখবেন, বিনা টিকিটে ভ্রমণ আইনতঃ দন্ডনীয়।
টিকিট কাটার দায়িত্ব আপনার।

না ট ক

ম কা হি
রা নী

নাট্যরূপ ঃ
সাধনানন্দ মন্ডল

পুরুষ ঃ রামখিলান রামস্বরূপ
রামনিওরাস রামপিয়ারী
রামপ্রকাশ রামলাল
রামদেও লালাজি
কমলী মিসোরন
মুরুল পয়লেলান

স্ত্রী ঃ রামখিলানের বউ
রামস্বরূপের বউ

[মণি মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প "রুখাভুখিয়ার রাম" দ্বারা অনুপ্রাণিত]

প্রথম দৃশ্য

[মঞ্চ ঃ পর্দা খুললে দেখা যায় মঞ্চের পিছনে একদিকের একেবারে পিছনের উইংস থেকে অন্য দিকের একেবারে পিছনের উইংস বরাবর কালো জাপড় টানটান করে টাঙানো।

মঞ্চের পিছনের দিকে অনেকটা জেলা ঘেঁষে ছোট একটি অভিমুখে আগুন জ্বলছে। মঞ্চের এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে অবাধি ঔজ্জ্বল্যের লাল আলোর আভা। মঞ্চে বাকি অংশ জুড়ে গাঢ় অন্ধকার।

অভিমুখের চারপাশ ঘিরে বসে আছে রামখিলান, রামনিওরাস্, রামপিয়ারী, রামলাল, রামদেও, রামপ্রকাশ, রামস্বরূপ, রামস্বরূপের বউ এবং রামখিলানের বউ। এরা সবাই উত্তর বিহারের একটি অত্যন্ত ছোট্ট হরিজন পল্লির ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুর।

অভিমুখটি জ্বলছে এদের কুপড়ি থেকে খানিকটা দূরে সামনের ফাঁকা মাঠে। এদের চেহারা ও পোষাক-আশাক দেখেই বোঝা যায়, এরা অত্যন্ত গরিব।

এরা সবাই আগুন পোহাচ্ছে। অভিমুখের একপাশে রয়েছে কিছু কাঠকুটো যা দিয়ে আগুন জ্বালানো হচ্ছে। লোকগুলির পাশেই রয়েছে একটা মাটির হাঁড়ি। সেটা থেকে মাঝে মাঝে হাঁড়িয়া-মদ একটা ভেসকানে ও পুরোনো অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে গড়িয়ে নিয়ে সবাই খাচ্ছে। গল্প-গুজব করছে। হাসিঠাট্টাও চলছে।

এদের মধ্যে রামখিলানের বয়সই সব থেকে বেশি। রোগা ও একটু ভাঙা গড়নের। মাথার চুল কদমে ছেঁটে সব সাদা। এলোমেলো। গায়ের রঙ কালো। রামস্বরূপও বয়স্ক। তবে তার বয়স রামখিলানের চেয়ে বেশ কিছু কম। সে-ও রোগা এবং কালো। মাথায় চুল সাদাকালোয় মেশানো। রামলাল ও রামদেওকে দেখে মনে হয় তার বেশ কিছু পরেই যৌবন ফুরিয়ে যাবে। রামনিওরাস, রামপ্রকাশ ও রামপিয়ারী প্রৌঢ়। রামখিলানের বউ প্রবীনা। বয়স ষাটের একটু ওপরে। রামস্বরূপের বউকেও বয়স্কা বলেই মনে হয়। তবে বোঝা যায় রামখিলানের বউয়ের থেকে তার বয়স বেশ কিছু কম। দুজনের চুলেই বয়সের পাক ধরেছে। দুজনেরই রোগাটে গড়ন। গায়ের রঙ কালো।

সময় ঃ গভীর অন্ধকারে ঢাকা অল্পকনে শীতের একটি রাত।

আবহে দূর দিয়ে হুইশেল্ দিতে দিতে একটা ট্রেন ছুটে চলে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল।]

রামনিওরাস্ (আগুন পোহাতে পোহাতে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো) । শালা, আজ বহুত্ জাদা আছে। হাঁড়িয়া দিকে কি ঠান্ডা লাগ্ রহা!

রামপিয়ারী ঃ যাগ্‌রে ঝাগ্-মাগ্ বোলা কর — কল্ সাল যে ইত্না জাড়া কভি নেহি দেখা।

রামস্বরূপ ঃ হাঁ, সহি বাত্। (এরপর গায়ে জড়ানো জীর্ণ সুতির চাদরটা ভালো করে জাপটে ধরে) যেই সাল্ ঠান্ডা, তেইসান্ হাওয়া।

রামপিয়ারী ঃ ইত্না ঠান্ডা-আলু ক্যারল্তা যা কিত্না আছা। লেকিন দেখ্, সারে জমিন খালি।

রামপ্রকাশ ঃ এতো আপ্‌সোচ্ কেনো? তোর্ বাত্ শুনে মোনে হচ্ছে যেনো এসোব তোর আব্বা জমিন্ আছে! আরে, সব্ তো লালাজির। অগ্লু ও না চাহে তো কা হো গা!

রামপিয়ারী ঃ এহী কী মিঠ্টি কিন্তু খারাপ না - আলু লাগালে ভালো হোবে।

রামচরণ ঃ সে তো হোবে। সেদিন পরি। পরি কাঁহা। কিছাই না নিলে আমু তো কেলুবে না।

রামবিলাস ঃ (আক্ষেপের সুরে) ঃ লালজির তো কেনো নজরই নেই এদিকে।

রামবিলাস ঃ (অনেকটা চাপা স্বরের সুরে) ঃ আরে, লালজির কেতো দিকে কেতো নজর। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা যে কেরবে ওটাই তো সমস্যা।

[এরপর রামবিলাস হাঁড়ি থেকে এক গ্লাস হাঁড়িয়া পড়িয়ে নিয়ে চক্‌চক্ করে খায়। তারপর খায় অন্যেরা।]

[আবহ ঃ একটা গাড়ির 'কাঁচ্ কাঁচ' করে ব্রেক কষার শব্দ শোনা গেল। এই শব্দের একটু পরেই দূর থেকে শোনা গেল একপাল শেয়ালের ডাক।]

রামচরণ ঃ (একটু পরেই হঠাৎ যেন তার চোখে পড়ল এমনভাবে দূরের উঁইঢিবির দিকে তাকিয়ে) ঃ লছমী মায়, কেউ এদিকে আসছে- (সামান্যক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে) হাঁ, ইধারই তো — টর্চ জ্বালাস্ —

[মঞ্চের গাঢ় অন্ধকার অংশের একস্থানে দূর থেকে মৃদু আলো এসে পড়ে। সবাই সেই আলোর দিকে তাকায়।]

রামবিলাস (কণ্ঠস্বরে ভয় পাওয়া ভাব) ঃ কৌন্ আ রহা।

[সেই আলোর উজ্জ্বলতা কিছুটা বাড়ে। সবাই তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে সেদিকে।]

রামচরণ (সেই আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে ভয় ও বিস্ময় মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে) ঃ লাদ্‌তা হ্যায়, লালজি।

রামবিলাস (ভয় ও বিস্ময় মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে) ঃ লালজি।

রামলখন ও রামাধর (সেই আলোর দিকে তাকিয়ে ভয় ও বিস্ময় মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে প্রায় একসঙ্গে) ঃ আরে হাঁ — লালজি।

রামনিওয়াস্ (ভয় মিশ্রিত বিস্ময়ে) ঃ ইস্ অন্ধকার-বস্তিজনে কে গাঁও মেঁ! তাও আবার এতো রাতে।

রামচরণ (ভয়ে ভয়ে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো) ঃ তা জানে বাবা। ইদ্‌না বড়া আদমি। আমাদের আসার কথা কি মোদ্ কেলো। আমরা তো সব গাঁওবাসি-আদমি। মোদ তো আমাদের হদ্‌বদ্‌ই।

রামবিলাস (চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে) ঃ সে কি তো; কিন্তু তো হোবনি!

রামবিলাসের বউ (স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে) ঃ কেনো ছেলে-ছেকরা বোলাপি কেরেনি তো? দিনকাল তো খোড়া খারাপ হোয়েছে।

রামচরণের বউ (ভয়ে ভয়ে) ঃ হাঁ, আমিও তো তাই ভাবছি। আজকাল তো ছেলে-ছেকরাগুলো ছুতমাতার পাত্তা খরচা কেরে পলুয়ে যায়। কিন্তুমি শুনা গয়। চিনটি নিয়ে চুল আঁচড়ায়। মরিচের লেহেনের সামনে কেউ এরকম কিছু কেরে ফেলেনি তো?

রামবিলাসের বউ (রামচরণের বউয়ের দিকে তাকিয়ে ভীত কণ্ঠে)ঃ আমার তি ওহি ডর্ লাগ্‌রে।

[একটা ঝলমল সন্ধা টর্চ হাতে নিয়ে লালজি মঞ্চে ঢুকলেন। সঙ্গে দুজন পহেলবান অর্থাৎ পালোয়ান।]

[লালজির লম্বাচওড়া চেহারা। গায়ের রঙ কর্সা। চেহারায় জৌলুস আছে।

পহেলবানদের দেখতে গাট্টা-গোট্টা, বজ্রমার্কা। কুতকুতে চোখে এক ধরনের নির্বোধ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের পালনে ইঞ্চা লম্বা গোঁফ। কাঁধে ঝোলানো লাঠি। গায়ের ওপর দিয়ে গলির বেল্ট পৈতের মত ঝুলছে। একজনের ঘাড়ে একটা কাঠের মেকিং চেয়ার]

[সে ঘাড় থেকে সেটা নামিয়ে মঞ্চে পেতে দেয়। লালজি টর্চের আলোয় চেয়ারটি ভালো করে দেখে নিয়ে তাতে বসেন। তারপর টর্চটা নিভিয়ে দেন। পহেলবান দুজন লালজির দুপাশে এসে দাঁড়ায়]

[মঞ্চে লালজি ঢোকা মাত্রই অন্ধিসুতোর চারপাশে বসে থাকা। সবাই উঠে দাঁড়ায় জোর হাত কেরে।]

লালজি (চেয়ারে বসে হাত তুলে নেড়ে) ঃ বৈঠো, সব বৈঠ্ যাও।

[এরা সবাই জড়সড় করে বসে পড়ে।]

[লালজি টর্চ জ্বেলে এদের ওপর দিয়ে আলোটা ঘুরিয়ে দেখে নেন।]

লালজি (টর্চ নিভিয়ে দিয়ে) ঃ রামবিলাস।

[রামবিলাস ভয়ে ভয়ে বিনীতভাবে উঠে দাঁড়ায়। অন্যেরা ভয় মিশ্রিত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে থাকে লালজির দিকে।]

লালজি (ঠোঁটের ডগায় হাসি ঝুলিয়ে) ঃ তোর গাঁও তো ভিন্‌ধ আছে রামবিলাস। বহুত্ পুরাতন্‌মি।

[হাল্কা আলো এসে পড়ে রামবিলাস ও বসে থাকা মানুষগুলির মুখে। রামবিলাস ও অন্যদের চোখমুখ দেখে বোঝা যায়, তারা ভয়মুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকেরই চোখেমুখে ফুটে ওঠে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি কারণ তারা কেউই লালজির কথার মানে বুঝতে পারছে না।]

রামবিলাস (যুক্তাত জোড় কোরে কপালে ঠেকিয়ে) ঃ মালিক।

[হালকা আলোক সম্পাত হয় লালজির মুখের উপর।]

লালজি (মৃদু হেসে আবেগ মেশানো কণ্ঠস্বরে) ঃ আমি তোদের সঙ্গে কোথোনও খুটা বাত্ বোলি না রামবিলাস। আজ, তোরাই তো আমার ফসল রোপনিয়া। ফসল কাটনিয়া। তোরাই তো জঙ্গল থেকে আমদেরকি হুরুটুকি আনিস। বোঝা বোকাই করে আমার গুদামে পৌঁছে দিস। পাত্থর ভেঙে আমার লাগি ছেকাই কেরিস। তোদের সেতে আমি খুটা বাত্ বোলতে পারি। উঁহুঁ, কভি নেহি। (এরপরই একটু থেমে) সোচ্ছি সোচ্ছি, তোদের গাঁও ভিরধ্ আছে। বহুত্ পুরাতন্‌মি। সেদিন আপসোষ কি বাত্ — তোরা নিজের গাঁওকে নিজেরাই চিনিস না।

রামবিলাস (হাত কচলাতে কচলাতে) ঃ মালিক।

লালজি (রহস্যভরা চোখে) ঃ বোল্‌তো, তোদের গাঁও ভেবে কেনো পুরাতন্‌মি?

রামবিলাস (অবোধ কোনো শিশুর জবাব দিতে না পারার মত তাকিয়ে কিন্তু সবিনয়ে) ঃ মালিক, হামার গাঁও মেঁ তো কুছ্ না আছে।

লালজি (কৃত্রিম মেহের কণ্ঠস্বরে) ঃ কুছ্।

[কৌতুহল ভাব লক্ষ্য করা যায় রামবিলাসের মুখমণ্ডলে। তার দুচোখে ফুটে ওঠে বিস্ময় ও অসহায়ত্বের। যারা বসেছিল তারা সবাই তাকায় তার দিকে।]

লালজি (গর্বিত কণ্ঠস্বরে) ঃ এ তো রাম আর কেল্ গাঁয়ে আছে খোল্?

রামবিলাস (এ কথারও অর্থ বুঝতে না পেরে বোকা বোকা চাউনিতে তাকিয়ে) ঃ মলিক।

লালজি (সবাইকে শোনানোর মত করিয়ে) ঃ হুহ্ আর মেঁ এক্ তো আউর আসা রাম। (এরপর একটু থেমে) রামবিলাস, রামনিওয়াস, রামপিয়ারী, রামপ্রকাশ, রামস্বরূপ, রামলাল, রামদেও। হুহ্ আর মেঁ রাম। তো ইস্ গাঁও ভিরমে আছে না তো কি আছে? ইত্না রাম আউর কাঁহা মিলি?

[যারা বসেছিল তারা সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।]

রামবিলাস (যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে এমন করিয়ে) ঃ তো ইস্মেঁ কা, মলিক?

লালজি (মিটি হেসে) ঃ তোদের গাঁয়ে এতো রাম, তোরা রামলালার সেবা করেনি না?

[রামবিলাস লজ্জের গাঁয়ের সবার চোখেমুখে আবার অন্ধের মত ভয় ও বিস্ময়ের মিশ্র প্রভাব লক্ষ করা যায়।]

রামবিলাস (হাত কচলাতে কচলাতে) ঃ আমরা অন্ধ্যু। কি সেবা করেছে মলিক। আর তাছাড়া, আমাদের ছোট জাতের সেবা রামলালা নিবেনই বা কেনো?

[পহেলবান দু'জন একবার রামবিলাসের মুখের দিকে অন্ধচোখে তাকিয়ে নিয়ে লালজির দিকে দৃষ্টি ফেরায়।]

লালজি (মিটি হেসে) ঃ নিবেন না কেনো? রামচন্দ্রজি ওরে চন্ডালকেও গলে লাগিয়েছিলেন।

[রামবিলাস অবাক দৃষ্টিতে লালজির মুখের দিকে তাকায়।]

লালজি ঃ অযোধ্যার নাম শুনেছিস তোরা?

রামবিলাস (ঘাড় নেড়ে) ঃ জী মলিক। রামলালার জন্মস্থান।

লালজি ঃ হাঁ, ঠিক। (পরে গলা কাঁপিয়ে) অযোধ্যার রামলালার জন্মস্থানে মন্দিরের উপর মুসলমানরা মসজিদ বানিয়েছে। আমরা সে মসজিদ ভেঙে নিয়ে মন্দির বানাবো। বিশ্বরাজ বানাবো।

[রামবিলাস চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। লালজি তাকিয়ে থাকেন তার দিকে।]

লালজি (একটু পরে অধৈর্য কণ্ঠস্বরে) ঃ তোদের গাঁ থেকে তিরিশ জন জোয়ান চাই আমার। রামসেবক, অযোধ্যায় যেতে হবে। তুই তো এই গাঁয়ের মুখিয়া। তিরিশ জনকে যাবার পরিষ্কার তোরাই।

রামবিলাস (মুখ তুলে ভয়ে ভয়ে) ঃ আমরা তো অযোধ্যার রাস্তা চিনি না মলিক।

[লালজি চাপা রাগত চোখে তাকান রামবিলাসের দিকে।]

[পহেলবান দু'জন প্রথমে তাকায় লালজির মুখের দিকে। তারপর রামবিলাসের দিকে ফটমট করে তাকায়।]

পহেলবান দুজন (প্রায় একসঙ্গে) ঃ হেটেরুহ্।

লালজি (পহেলবানদের দিকে তাকিয়ে একটু চাপা গলায়) ঃ বিরহ্ রাখ্লো — বিরহ্ রাখ্লো —

[এরপর ঠোঁটের ভাঁজে আলোকদার মিটি হাসি আবার ফিরিয়ে এনে লালজি মনে মনে লোকেদের একবার চোখ বুলিয়ে নেবে নেন।]

লালজি ঃ রামবিলাস, তিরিশ জন আর শিবু একটা মেয়ে নয়া কপড়্ আর পঞ্চাশ টাকা পাবে। তিরিশ তারা লাগবে না। খাই-খরচা লাগবে না। সেবা মি মিলো — রামলালার সেবার।

[কথাগুলো বলেই লালজি মনে মনে লোকেদের উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।]

[চুপচাপ ছয়ে বসে থাকা লোকগুলি এবার একটু অস্বস্তিতে পড়ে। চকচক করে ওঠে তাদের চোখ। রামপিয়ারী, রামপ্রকাশ, রামলালা ও রামদেও আর বসে থাকতে পারে না। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়।]

এরা চারজন (প্রায় একসঙ্গে) ঃ নয়া কপড়্। পঞ্চাশ টাকা। মলিক, আমরা যাবো। জরুর যাবো।

[রামবিলাস একবার এই চারজনের দিকে তাকায় একবার লালজির দিকে তাকায়।]

রামবিলাস (কি বলবে এমন কথা খুঁজে না পাওয়ার মত ঢেঁক) ঃ মলিকের মরজি।

লালজি (আকাশের দিকে আঙুল তুলে) ঃ সোবই রামলালার সেবার জন্য।

[লালজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। যারা বসেছিল লালজিকে সম্মান জানাতে তারাও উঠে দাঁড়ায়।]

[যে পহেলবান ফোনিং চেয়ার পেতেছিল সেই সেটা গুটিয়ে নিয়ে ঘাড়ে তোলে।]

লালজি ঃ সুন্ রামবিলাস, কাল দুপুরে তিরিশ জন জোয়ান নিয়ে কাছারী বাড়িতে আসি। কপড়্ নিবো। টাকা নিবো। সেবার মোটো কি কিরতে হোবে। এ সব্ তোবে পাকাকি হোলো, ঠিক আছে? (তারপর হঠাৎ কেন যেন মনে পড়ে গেল এমন ভঙ্গিতে) আরে হাঁ, কাল তোদের ছুটি। কারকাম কোরতে হোবে না। কাছারী বাড়ির মাঠানে রামলাল হোবে। আমরা ওরজি কাল আসবেন। রামসেবকদের আরে ওরজির তাবণের বেবোস্থা কোরেছি। ওরজি বোলেন, রামায়ন পড়ো। রামলালাকে অনুসান করো। রামলালা তো শুধু অওতার ছিলেন না। তিনি ইতিহাস পুরুষ। হাস্টরিক্যাল। এই কোথাটা এতোদিন আমরা ভুলে ছিলাম বোলেই আমাদের এতো দুর্গতি।

[সবাই বোকা বোকা চাউনিতে লালজির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

[লালজি হাঁফ ছেড়ে, হাত উঁচিয়ে, রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে সময়টা দেখে নেন। তারপর হাঁফ নিঃশ্বাস ছেড়ে নেন।]

লালজি ঃ ওরজি আরও কি বোলেন জানিস্? উনি বলেন, শুধু মেডিউভি আউর বেওসা নিয়ে দিন কাটালে আর চোলবে না। সোব সময় মেনে রাখতে হোবে — পলে হুহ্ সব্ হিন্দু। উসকে বাদ্ আউর কুছ্। এই দেশের কোথা হিন্দুদেরই তো জানতে হোবে। না হোলে আর কে জানবে? (এরপর একটা হাত সামনের দিকে মেলে সবার দিকে ঘুরিয়ে) আমরা সোবাই যে হিন্দু সেই কোথাটা প্রথম কোরার সময় এসেছে। সেব হিন্দুকে এখোন একহাঁতা হোতে হোবে। হিন্দুরাজ বানাতে হোবে।

[রামবিলাসের পায়ে একটা সুড়সুড়ি। সে সুতো হাত দিয়ে

সঙ্গেরে চাপড় মেরে পেটকে মেরে ফেলে। তারপর আবার সোজা হোয়ে দাঁড়ায়।]

দালালি (এবার গলার স্বর) ঃ দেখি, ছোড়া ভালো ছেলের ওলাদি। এসের দেখা এতো সুখন মেয়ে সমুদ্দিয়ে দিলেন যে জীবনে ভুলতে পারবি না! তোরা কাল জরুর যাবি। (এরপর যেন কথাতে ভুলে গিয়েছিলেন এখন মনে পড়লো এমন ভঙ্গিতে) আরে হাঁ, আমি তোদের একদিনের রোজ পাইয়ে দিবো। (যে পহেলবানের ঘাড়ে কেন্দিয়ে তোয়ার সেই তার দিকে তাকিয়ে জানতে চায়) তুমনি খেল্ খেল্ গে, এসের একদিনের রোজ যেনো কাল পাইয়ে দেয়।

পহেলবান ঃ জী সরকার।

রামবিলাস ও তার বউ এবং রামস্বরূপের বউ ছাড়া আর সবাই (প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে) ঃ দালালি কি মেহেরবানি। দালালি কি জয়।

[উঠে গেলে দালালি ও পহেলবান দুজন মেঝিক দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল মেঝিক দিয়েই ঘর ছেড়ে চলে যায়।]

[রামবিলাস নিচের দিকে তাকিয়ে ধীর পদক্ষেপে কয়েক পা সরে আসে। মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মঞ্চের যেখানে সে এতাবে দাঁড়িয়ে থাকে সেখান থেকে খানিকটা দূরে পরস্পরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে জটলা করতে থাকে রামস্বরূপ, রামনিওয়াস, রামদেও, রামলখন, রামপিয়ারী ও রামটহল। জটলায় তারা এমনভাবে কথা বলতে থাকে যে কোলাহল ছাড়া স্পষ্ট করে কিছুই বোঝা যায় না।]

[রামবিলাসের রামস্বরূপের বউ এই সুযোগে এসে বসে অধিবৃক্ষের পাশে।]

রামবিলাস (মুখ তুলে বিরক্তির দৃষ্টিতে জটলার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে) ঃ চুপ্, চুপ্ যো সব্! জানওয়ার কা মাফিক্ চিল্লা যাত্।

[জটলার কোলাহল থেমে যায়। সবাই তাকায় রামবিলাসের দিকে।]

[রামবিলাস এবার ধীরে ধীরে পা ফেলে অধিবৃক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর অধিবৃক্ষের পাশে গিয়ে বসে। হাত দিয়ে আগুনে কাঠ ঠেলে দেয়। আগুন দপ্‌দপিয়ে জ্বলে ওঠে।]

[যারা দাঁড়িয়েছিল এবার তারা আস্তে আস্তে অধিবৃক্ষের চারপাশে এসে বসে। অধৈর্য চাউনিতে তাকায় রামবিলাসের দিকে।]

রামবিলাস (অধিবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে থেকে যেন নিজেরা উদ্দেশ্যেই বলছে এমনভাবে) ঃ জিন্দা আছে। পুরভূমি। (একটু থেমে আবার একইভাবে) হাম্ আম্ মেঁ রাম। হাম আম্ মেঁ রাম — তো কি? (এরপর গলার স্বর উঁচুতে তুলে সবার দিকে তাকিয়ে সবার কাছে জানতে চাওয়ার ভঙ্গিতে) খেল্, হাম্ আম্ মেঁ রাম — তো কি?

[কেউ কিছু বলে না পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।]

রামবিলাস (একটু পরে সবার উদ্দেশ্যে আবার প্রশ্ন রাখে) ঃ হাম্ আম্ মেঁ রাম তো ইহ্না ছুপ্ কাহে? ফিফিহ্‌নের পরিবী? ইহ্না পরিশানি কিউ? (এবার চিৎকার করে উঠে) জিন্দা। পুরভূমি। তো বোল্, ইস্ গাঁও মেঁ ছরিয়ালি কাঁহা? ইস্ গাঁওকে চারো তরফ্ ইহ্না জমিন — সেদিন, গাঁওবালো তো অন্না না কি সেহি কিউ? কাহে বোলছিতে দালাদলি নেই বেনো? কারো গায়ে আরো কাপড়া নেই — বেনো? এই গাঁয়ে মহুয়া নেই, মাহুতি নেই, পড়াই নেই, মাওয়াসাদা নেই। তবু নেই, নেই আউর নেই — সেদিন বেনো? (এরপর একটু থেমে) এই সারা জিন্দা যায়। পুরভূমির এই কি মহুয়া। এসের চাঁদা আবার মহুয়া আর কি আছে, বোলতো? বোল্না? চুপ কিউ?

[সবাই অত্যন্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে রামবিলাসের দিকে।]

[রামবিলাস এবার উঠে দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে অধিবৃক্ষের পাশ থেকে সরে চলে আসে মঞ্চের প্রায় একপ্রান্তে। সেখানে কিছুটা ঝোপঝাড়ের ভিতরে দাঁড়ায়।]

[তার চোখেমুখে হালকা ধরনের আলোকসম্পাত হয়। দেখে বোঝা যায়, সে বেশ উত্তেজিত।]

রামবিলাস (এভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় যেন গোটা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছে এমন ভঙ্গিতে ও সেইসঙ্গে আবেগময় কণ্ঠস্বরে) ঃ অনেকদিন থেকেই দেখছি দুনিয়াকে। উমর্ তো খুব্ কম্ হোলনা। কমিন পক্কাতর্। বহুত মিঠাই, পানি আউর হওয়া লাগলো এই গায়ে। এই বুঢ়া খাঁড় দেখলো ছোকরা কিনু। অনেক জিন্দেগী আউর যৌবন্। কিন্তুনা দাদা-ধারদার, খুন-পসিনা, তথাকথা, জানপ্রকাশ। সবাই আউর বাচ্চারা কে নিয়ে ছোকরা হাহাকার, মারপিট্। (এরপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) দেখে আউর শুনেই তো আমার যা কিনু শিখা। (এরপর একটু থেমে) আমার ভোকোন্ বচপন্। এই মল্লিক তো তোকোন্ প্যারদাই হোয়নি। এই গুরুটে গাঁওবুড়ার মোতো এক আদমি এসেছিল। গাঁওসুদ্ধ বৌটিরে, মাঠঘাট পেরিয়ে বহুত লোক ছুটেছিল বুড়াকে দেখতে। তার বাহ্‌চিত্ শুনতে। আমার বাপের কাঁধে চেড়ে অমিও গিয়েছিলাম। বুঁড়ো তক্ খাটো ধুতি, নাঙ্গা মাথা, চোখে গোল চশ্মা, হাথে লাঠি। আমার মেনে আছে সেই আদমি বলেছিল "হমে স্বরাজ চাহিয়ে — স্বরাজ।" লেকিন্, উস্ বচপন্ সে ইস্ উমর্ তক্ আমার সমঝমে এলো না কি স্বরাজ কাকে বোলে। ওহ্ কা হ্যায়। আজ আবার মল্লিকের মুখে শুনছি "হিন্দুরাজ চাই — হিন্দুরাজ বানাতে হোবে।" সে আবার কি জিনিস রে ভাই। ভগওয়ান্ জানে।

[অধিবৃক্ষের চারপাশে বসে থাকা সবাই অতি বিস্ময়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রামবিলাসের দিকে। রামবিলাস এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে এবার অধিবৃক্ষের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগোতে থাকে।]

রামবিলাস (এভাবে এগোতে এগোতে আপন মনে) ঃ দালালি মসিদ বানানোর কোথা বোলছেন। রামলালার মন্দির! তাও আবার কী — মন্দির্ ভেঙে। তো ইসমে হমে কা ফায়দা হ্যায়? (এরপর সে আর না এগিয়ে অধিবৃক্ষের চারপাশে বসে থাকা লোকেদের থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং একটু থেমে) আরে, রামলালার মন্দির হোলে সেই মন্দিরে উঠানাতের লোকেরা আমাদের ঘুরতে দিবে কি? পূজাপাঠ কোরতে দিবে কি? বোল্?

[বসে থাকা লোকেরা সবাই নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানায় 'না']

রামবিলাস (লোকেদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠে) ঃ তোবে। ছত্রা গাঁও কে আশপাশ তো অনেক মসিদ আছে। সেদিন,

আর তবু সেখানে আমরা পুকুরে পেয়েছি। কেউ পুকুরে নিয়েছে।

[ওদের কথা শুনে সবাই রামবিলাসের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানায় 'না'।]

রামবিলাস (অনেকটা শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মৃদুস্বরে মাথা নেড়ে যেন নিজের উদ্দেশ্যেই বলে চলে)। হিন্দুস্থান বানাতে হোবে। হিন্দুস্থান। থান্ সব্ হিন্দু হাঁয়। হিন্দু। (এরপর একটু থেমে লোকগুলির দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে) আরে, হিন্দু হাঁয় তো জানা হ্যায়। পর্দির সেমর মোশোন আমাদের গাঁয়ের কুঁয়াটা তাকিয়ে যায় তোখন অওরাদ্যাটা কেমোন মোয়? তাদ্তো। উটা জাতের লোকেরা কেউ ওদের কুঁয়া থেকে এক কুঁদ পানি নিতে চায়? শালা, আমাদের তো এদের কুঁয়া ছুঁতেই নিষেধ আছে। ছে-সব মহিলা মূত্রের পায়ছি করনা থেকে পানি আনতে মোয়। (এবার তার বউ এবং রামস্বরূপের বউয়ের দিকে তাকিয়ে) তুমহি যাতাও — আন্ ছালের রোজ-গোয়ালে ওই ওতো দূর থেকে পানি আনতে কিতনা পরিশানি। কিতনা মুসিবাত।

[রামবিলাসের বউ ও রামস্বরূপের বউ নিঃশব্দে মাথা নেড়ে রামবিলাসের কথায় সায় দেয়।]

রামবিলাস (অস্থির হয়ে উঠিয়ে উঠে)। আরে, আমরা অছুত্ — হরিজন। এতো মুসলমান নিশানের আমাদের কোনো দরকার আছে কি? বোল্।

[যারা বসেছিল তারা সবাই নিঃশব্দে মাথা নিচু করে।]

রামবিলাস (একটু পরে থোকার চঙে)। এ বাত্ ক্যাবলরা না হোলে আমাদের কোনো আপ্মি অমোহাত্ যাবে না।]

[যারা বসেছিল তারা রামবিলাসের এই কথা শুনে তার দিকে মুখ তুলে তাকায়। মুখ দেখে বোঝা যায় রামশিরারী, রামপ্রকাশ, রামনিওয়াস, রামদেও এবং রামলগন যথেষ্টই হতাশ হয়ে পড়েছে।]

রামদেও (হতাশার সুরে)। সেকিন মুখিয়া, অন্বেষা না পেলে কম্বল-রুপিয়া — কিছুই তো পাওয়া যাবে না।

রামবিলাস। হাঁ, সে তো পাওয়া যাবে না।

রামদেও (চাপা অনুনয়সূচক কণ্ঠস্বরে)। এইসন্ অন্ধারক জাড়ের দিন — মুহূতে একটা নয়া কম্বল মিল্বে — ওটা ছেড়ে দিবো? নসন্ পচান্ রুপিয়া ওতি হাতছাড়া হোয়ে যাবে?

রামবিলাস (ঘৃণা মেশানো মৃদু ধমকের সুরে)। আরে রাম! রাম রামদেও, তুই এতো লালচ্। জিন্দেগী ভর্ বিনা কম্বলে তোর জাড় দিতে গেলো, আর আজ নয়া কম্বলের নাম শুনেই তোর বিমার পড়বড় হোলো। কম্বল না পেলে তোর চোলবে না? তাজ্জব কি বাত্। পচান্ রুপিয়া না পেলে কী হোবে? পরিবী বেড়ে যাবে? আরে, মুতুবুক। ওতে হিন্দু হোয়? হোয় না।

[রামদেও বিমর্ষ মনে মাথা নিচু করে বসে হাতের আঙুল দিয়ে মাটিতে চুপচাপ আঁকিবুকি কাটতে থাকে।]

রামবিলাস (রামদেওকে এভাবে বসে থাকতে দেখে একটু পরেই দরদভরা মোলায়েম কণ্ঠস্বরে)। মুন্ রামদেও, মোনাই তো কম্বল্ পাবে না রে। পচান্ টাকাও কি মোনাইকে দিবো? মারা পাবে না ওরা ভোবে কি মোরবে? মোন খারাপ মোরিস্ না।

[রামদেও কোনো উত্তর দেয় না। আগের মতোই বসে থাকে।]

রামলগন (রামদেওকে এভাবে বসে থাকতে দেখে আমরা হয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বরে)। মহিলা এতো দান্ দিলালো। কেউ না মোলে তপ্সা হোবে না।

রামবিলাস। আরও তপ্সা হোবে। মহিলা দান্ আরবে পারে। মুখ ফিটিতে পারে, তিন চার হোপ কি আরও বেশি সমিত্রোজনার বন্ত হোবে পারে। সেকিন, মহিলা দয়া নিশানে আমার বহুত্ ডর্ লাগে।

রামলগন। ডর। ডর কাহে?

রামবিলাস। কাহে। ইয়াদ কর্, কমিন্ বন্-বেলায়া সাল পহলে মহিলা একবার আমাদের দয়া নিশানেন। গ্রামরা পাও মেঁ কুঁয়া ছিল না। মহিলা একটা কুঁয়া কাটালেন। গাঁয়ের মোবাইকে বহুত খানাপিনা খেলালেন — খসি আন্ আউর হাঁড়িয়া।

[এই সময় দেখা যায় রামস্বরূপ ও তার বউ মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছে।]

রামবিলাস (একবার রামস্বরূপ ও রামস্বরূপের বউয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে)। উসকে বাদ্, রামস্বরূপের একটি খুবসুরত্ জোওয়ান বেটি ছিলনি — বেপারা হোয়ে গেলো। (এরপর উত্তেজিত কণ্ঠে) জেনের মনে নেই, কেমোন কোরে মিঠি মিঠি বাতেঁ ভুলিয়ে ফুসলিয়ে মহিলা ছিলনিকে হাতেলিতে তুলে নিয়ে গেলো। (এরপর পরে জড়ানো চোঁয়া সৃষ্টির চামরে চোখ মুছে ধরা গলায়) কোথায় ছিলনি!

রামস্বরূপের বউ (মেয়ের স্মৃতি মনে পড়তেই বুক চাপড়ে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠে)। হায়রে মাইরে! ছিলনি — রে হায় রাম — মেরী দুলারী বিটিয়া রে — মেরী ছিলনিরে —

রামবিলাসের বউ (রামস্বরূপের বউকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে সান্ত্বনা দিতে দিতে)। চুপ্ যো যা রে — রো মাত্ — চুপ্ যো যা — চুপ্ যো যা —

[মেয়ের কথা মনে পড়তেই রামস্বরূপেরও পিতৃহৃদয় দারুণভাবে বিচলিত হয়; সে-ও আর স্থির থাকতে পারে না। আহত পশুর মত গুমরিয়ে কেঁদে ওঠে।]

রামনিওয়াস (রামস্বরূপকে জড়িয়ে ধরে ধরা গলায় সান্ত্বনা দিতে দিতে)। চুপ্ যো যা রামস্বরূপ — চুপ্ যো যা; কম করেগা — এহি হামরা তকদির। রো মাত্।

[রামবিলাস দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসিয়ে থাকে। রামপিয়ারী, রামপ্রকাশ, রামলগন ও রামদেও নিস্তব্ধ ও নিস্তুপ হয়ে থাকে বিমূঢ়ের মতো।]

[আবহ। অন্তর্দেশী কলস যেন মৃদু/রাগ মৃদু থেকে দ্রুত তীব্র হয়ে যেন উঠে আবার তা দ্রুত মৃদু হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।]

[আবহসঙ্গীত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় রামস্বরূপ ও তার বউয়ের কান্নার আবেগ থেমে গেছে। রামবিলাস মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেয়। ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়ায় অভিমুখের পাশে বসে থাকা লোকগুলোর কাছে।]

রামবিলাস (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে)। মহিলার দয়া জিনিসটা পরিবেশ

জন্য ভালো না। তবে আমি নিজে কাল্পনিতে যাবো। মল্লিকাকে বলে আসবো আমাদের কেউ অপেক্ষায় থাকবে না।

রামবিলাসের বউ (ভয়ার্ত কণ্ঠে) ঃ কী, তুমি যাবেনা যাবে? নেহি জনা, নেহি।

রামবিলাস ঃ আরে, এতো ভয়ডরের কি আছে? বাস্ তো এইটুকুই কি আমাদের কোনো আসবি যাবে না। ব্যস, আর তো কিছু না।

রামবিলাসের বউ (দুশ্চিন্তাকুলক কণ্ঠস্বরে) ঃ দেখিস্, যে জন্য তুমি মল্লিকাকে বাড়ীতে ডেকেছ কোরে? সেটা ভেবে দেখেছো?

রামবিলাস ঃ ডেকেছি ডেকেছি ব্যোস্, বারবার তো বোলবে।

রামবিলাসের বউ (উঠে দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যে আঙুল আন্দোলন রাখার ভঙ্গিতে) ঃ আরে, তোরা সব্ ভেবেছিস্ মর্দ আছিস্ রে। একটা মুরা আসবি আসবেনা যাবে? তোরা কেউ কিছু বোলবিনা না।

[সবার মুখমন্ডলের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যায় সবাই বেশ বিচলিত হয়েছে।]

রামস্বরূপ (উঠে দাঁড়িয়ে) ঃ শুন্ রামবিলাস, তোর আপেক্ষা যাওয়া ঠিক হোবে না। তোর সাথে আমরা ভি যাবো।

রামবিলাস (দৃঢ় কণ্ঠে) ঃ নেহি : স্বাধীন ইন্ গাওকে ঘুমিয়া। এটা আমরাই কাজ।

[সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রামবিলাসের দিকে।]

[মঞ্চের আলো নিভে যায়।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্চ অন্ধকার। ধীরে ধীরে তা আলোকিত হয়।

সময় ঃ গভীররাতের দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে আসছে। মঞ্চে আলোর উজ্জ্বলতা বেশি নয়।

মঞ্চের পেছনে একদিকের সর্বশেষ উইংসে থেকে আর একদিকের সর্বশেষ উইংস পর্যন্ত কালো কাপড় টানটান করে টাঙানো। মঞ্চে একদিকের উইংস থেকে একটু দূরে দুটো কাঠের কেদ্রিং চেয়ার একসারিতে পাতা রয়েছে যে সে দুটোর বসে মঞ্চের অন্যপ্রান্তের উইংসের দিকে সোজাসুজি তাকালে যাবে না। তাকাতে হলে গলাটা পেছন দিকে ঘুরে তাকাতে হবে।

এইরকম একটা চেয়ারে কল্যাণী বসে আছে। চোখ বুজে আধাটা চেয়ারের পেছনের দিকে ভর দিয়ে একটু এলিয়ে। তার পা দুটো টান্‌টান্‌ভাবে লম্বা করে অন্য চেয়ারে মেলে রাখা। এই চেয়ারে কেউ নেই।

আবহ ঃ অন্ধকার মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে সুরেলা রামনাম গান। মোটেও নয় আবার ফুতও নয়, আওয়াজটা এরকম। শুনে মনে হয় কিছুটা দূর থেকে মাইকের মাধ্যমে এই গান ছড়িয়ে পড়ছে।

রামনাম গান ঃ
জয় জয় রামসিয়া রামসিয়া রামসিয়া রাম
রামসিয়া রামসিয়া — জয় শ্রীরাম।
জয় জয় রামসিয়া রামসিয়া রামসিয়া রাম
রামসিয়া রামসিয়া — জয় শ্রীরাম।
শ্রী রাম হি আমার
জানে সন্ধ্যা সবেরা
শ্রীরাম হি আমার
জানে সন্ধ্যা সবেরা
দেখো নিল্ মেঁ বাবার
দেখো নিল্ মেঁ বাবার
দেখো নিল্ মেঁ বাবার
দেখো নিল্ মেঁ বাবার
জয় জয় রামসিয়া রামসিয়া রামসিয়া রাম
রামসিয়া রামসিয়া জয় শ্রীরাম
জয় জয় রামসিয়া রামসিয়া রামসিয়া রাম
রামসিয়া রামসিয়া জয় শ্রীরাম।

[মাইকে গান বেজে চলেছে এরকম সময় কল্যাণী মঞ্চের যে প্রান্তের আড়ালটি বসে আছে সে প্রান্তের উইংস দিয়ে মিলোচন মঞ্চে প্রবেশ করে।]

মিলোচন (কল্যাণীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে) ঃ আরে, তু এঁহা। আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান হোয়ে গেলাম।

[কল্যাণী চোখ খুলে তাকায়। পা দুটো চেয়ার থেকে সরিয়ে নিয়ে মাটিতে রেখে মিলোচনের কথায় আগ্রহ প্রকাশ করে সোজা হয়ে বসে। মিলোচন খালি চেয়ারে বসে।]

[কল্যাণী ও মিলোচন দুজনেই ষোলকলা। গায়ের রঙ কালো, দেখতে মন্দ নয়। দুজনের পরণেই কিছুটা চাপাচাপা ধরনের সাদা পায়জামা ও সাদা পাঞ্জাবী। মাথায় গেরুয়া রঙের ফেট্টি। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা।]

কল্যাণী (চেয়ারে সোজা হয়ে বসে মিলোচনের দিকে তাকিয়ে) ঃ নিন্দ থেকে উঠেনি রাত তিনটের সময়। সারাদিন তো ঘুরাই চোরদির মোতন। একপল্ কি বৈঠনে কা মৌকা নেহি মিলা।

(এরপর কোমরটা দুহাতে চেপে ধরে) কমর্ দর্দ কোরছে। তাই বাইরে বোসে থেড়া আরাম কোরছি।

মিলোচন ঃ আমার ভি পা টন্‌টন্ কোরছে। সারাদিন শালা বসতে খাটনি গেলো।

[মাইকে রামনাম গান কখনও থেমে চলে। কল্যাণী আবার আরাম করার ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে থাকে। মিলোচন চেয়ারে বসে পায়ের তালে তালে কখনও চোখ বুজে, কখনও ঠোঁট টেপে কখনও বা হাতের আঙুলে তুড়ি দিয়ে কোমর, ঘাড় ও মাথা দুলিয়ে তাল দেয়।]

[একটু পরেই গান থেমে তার আর্কাৎ শেষ হয়। তক্ষণাৎই কানে আসে লোকজনের হাততালির শব্দ।]

[এরপর মিলোচনও কল্যাণীর মত চোখ বুজে আধাটা চেয়ারের

পেছনের দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসে পায়ে আরাম করে বসিলেন।]

[নেপথ্যে ঃ মাইকে ঘোষণা হয়ে যাবার পরে ঘোষণা ঃ

"পরমে আপনারা ওনলেন ওরফে কি মূল্যবান ভাবণ ; উপরে যান হারমনিয়ম। তারপরে সে সেব তব্ পাল্টে গেছে তব্ আজির নিয়ম রাখ্‌তে ওনলে যে নিয়ে আপ্ সবলে বহুত্ বহুত্ কথাই হঁয়ার। এখোন তার হেয়ো আমাদের কথকনাম আজির পরিচালিক বিভাগ। হামারী তার সে আপ্ সবলে অনুরোধ কিয়া যা রহা হ্যায় কি কামরিতে এসে লাইন লাগাকর্ এসোন নিয়ে আন। সেহ্ বহুত্ বিনিয়ে।" এরপর মাইকে ঘোষণা শেষ হয়।]

[মাইকে ঘোষণা চলাকে এরকম সময় কন্যাণী ও মিলোচন মঞ্চের পেছিকে বসে ছিলেন তার উপরে দিক দিয়ে রামবিলাস আসছে আসে মঞ্চে প্রবেশ করে। মঞ্চের ভেতরে কয়েক পা এগিয়েই তার চোখে পড়ে চেয়ারে বসে থাকা কন্যাণী এবং মিলোচনের দিক। সে আর এগোয় না ; দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখা যায়, তার চোখেমুখে খুশিয়ে ও চাপা উত্তেজনার ছাপ। কিন্টা অবসাদও মনে হয় তাকে। হাঁটু মুড়ে সেখানেই সে বসে পড়ে।]

[রামবিলাসের প্রবেশ ও উপস্থিতি কন্যাণী ও মিলোচন কারো নজরেই পড়ে না।]

[মাইকের মাধ্যমে কানে আসে হৈ চৈ ও চেঁচামেচির শব্দ। বোঝা যায় পরিস্থিতি মূহুর্তে কাহাহিকে কন্ট্রল ও টানা হেওয়া তার হয়েছে। মাইকের মাধ্যমে কানে আসে (নেপথ্য থেকে) ঃ

"হাঁয়ে রঙ খেলা পসন্দ নেহি। কিসি আজির রঙ কা কন্ট্রল নিয়াও।"

"এতো বাছবাছির সময় নেই এখন —"

"আরে হাঁয়ে তো কাঁটা নেহি আয়ে।"

"পুলসা-উলসা নেহি। হাঁয়ে আরা খোই মুকাম হ্যায়।"]

কন্যাণী (বিরক্ত মুখে উপরের দিকে তাকিয়ে) ঃ মাইক বিটে নেহি কন্ট্রল কিয়া?

মিলোচন (উপরের দিকে তাকিয়ে হাঁক পেড়ে) ঃ আরে ওকলেও। মাইক কা সুইচ্ অন্ কর্ দে — শোর ওনাই দে রহা।

[মাইকে হৈ চৈ ও চেঁচামেচির আওয়াজ বন্ধ হয় না। চলতেই থাকে। শোনা যায় ঃ

"মুঝকো মেঁ কিল রহা তো ক্যায় হ্যায়?"

"আরে দেখা হ্যায় তো দে, নেহি তো ভাগ্ — "]

কন্যাণী (মৃদু হেসে) ঃ তোর কোথা ওকলেও ওনতেই পাচ্ছি না।

মিলোচন (বিরক্ত মুখে) ঃ ওকলেও আচ্ছা নিউসেন্স আমি সে ইয়ে সব্ কাম নেহি চলেগা — হাঁয়্ আমি নিয়ে যেখি —

[মিলোচন চেয়ার থেকে উঠে দ্রুত মঞ্চ ছেড়ে চলে যায়।

একটু পরেই বন্ধ ঘরে ভরা মাইকের শব্দ।]

[কন্যাণী পকেট থেকে ছোট্ট একটা কৌটো ও চিরুনি পকেটে রেখে করে। কৌটোর ঢাকনি খুলে আঙুল দিয়ে কৌটো থেকে চুন বের করে হাতের তালুতে নেয়। তারপর পকেট থেকে হাতের তালুতে চিরুনি চালে। ঢাকনি বন্ধ করে কৌটো এবং পকেটে ভরে পকেটে পোরে। তারপর মুড়ো আঙুল দিয়ে চুন ও চিরুনি মিশিয়ে তালুতে তলতে থাকে।]

[এরকম সময় মিলোচন মঞ্চে ঢুকে চেয়ারে বসে। সে ও কন্যাণী অনেকক্ষণ ধরে চিনি মুখে দেয়।]

কন্যাণী (মুহূর্তের তালু পরস্পর ঘষে চুন ঝেড়ে ফেলে) ঃ মিলোচন, ওরফির ভাষণ কেমোন লাগলো?

মিলোচন (চোখ বড় করে প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়ে) ঃ সহ্যমুহ্ উন্নয়নে বহুত্ আচ্ছা ভাষণ দিয়া। বহুত্ কা ভাল্ কিন্তুনা সুন্দর। বেলি কি মিঠি। আজির ব্যারা ভেব —। আরে ওরফি! বাকী যো তো আরামসা দি যো।

কন্যাণী (মিলোচনকে পূর্ণ সমর্থন জানানোর ভঙ্গে) ঃ হাঁ, পানি বহুত্ গর্ব হোয়ে গিয়েছেন। ওরফি তো এতোদিন পুলাপাট আজির ধর্মসভা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এখোন ভাল সন্দিহোহেন রাষ্ট্রনিয়ায়। আগে তো জানাই ছিলো না কি ওরফি এমোন অবহাহুত্ ভাষণ দিতে পারেন।

মিলোচন (হো হো' করে হেসে উঠে সায় জানিয়ে) ঃ অবশ্যাহ্ ওরফি ছুপা তায় রুস্তম্ ছিলেন।

কন্যাণী (মৃদু হেসে) ঃ সে তুই যাই বোল্, এরোকম ভাষণ সারা দেশে লাগলায় চালু রাখলে আর কোনো চিন্তা নেই। (এরপর গভীর হয়ে) দেখের দিকের কোথাওলো তোর মনে আছে? আওন। দেখাইকে অভিনন্দন দিয়েছে।

[রামবিলাস যখন কিছু করে চুপচাপ বসেছিল। মিলোচনের হাসির শব্দ তার কানে যেতেই সে মুখ তুলে মিলোচন ও কন্যাণীর দিকে তাকায়। এরা তার দিকে পেছন ফিরে বসে থাকায় কোন দৃষ্টি বিনিময় হয় না। একটু পরেই রামবিলাস আবার আগের মত মাথা নিচু করে বসে।]

মিলোচন। দেখিন কন্যাণী, অবোশ্যাহ্ রামমন্দির যেহে তো?

কন্যাণী (দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে) ঃ কেনো যেহে না। অবশ্য যেহে। (এরপর ঘোষকদের মত করে) দেখ্ মিলোচন, মুলাকাহ্ যেহে লোকে ছেলে 'রাম রাম'। কারো খুহ্ আহ্না চাইলে বোলে 'আপনা রামজি কৃপা করেঁ তো — 'যেহেন দুষ্কর্ম যেহে বোলে 'হায় রাম।' কিন্তু না পসন্দ যেহে অশ্বত্থা নমস্কার্ কোরলে বোলে 'আরে রাম। রাম। ছি। শবযাত্রার সময় বোলে 'রামনাম সত্য হ্যায়, রামনাম সত্য হ্যায়', এমোন কি বিদেশি হিপ্পিরাও মালা চরস্ খেয়ে বোলে 'হরে মারো হরি/বোলো সুবা শাম/ হারে কৃষ্ণ হরে রাম।' আরে শ্রীরাম কী যদিমাই খুহ্ আপন্ আছে। শ্রীরাম নিজেই তো বিদেশী। অযোধ্যা যানেই তো রামজন্মভূমি। এখোনে রামমন্দির না হোলে আর কোথায় হোবে। অবশ্যাহ্ হোবে। (এরপর একটু থেমে চোখের কণা অবস্থায় পা দুটো হালকাভাবে নাচাতে নাচাতে) হিন্দু রাজা কি হোবে। তুই দেখবি, অমন হোবে। আর এতে যারা রোহ্ লাগাবে অশ্বত্থা গন্ডগোলি কোরবে — ওরা নিশ্চিহ্ন হোহুকলো হোবে। তুই দেখে নিবি।

[কথাওলো কানে যেতেই রামবিলাস নিউরে ওঠে। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে একবার এদের দিকে তাকায়। তারপর আবার মাথা নিচু করে।]

মিলোচন (উপরোহের সঙ্গে মাথানাড়ির ভঙ্গে) ঃ ওরফির ভাষণের আসুরি আপ্ কাসেটে তুলে নিয়েছি। নিয়ে আসবো। ওনবি।

কন্যাণী (তাচ্ছিল্য করে) ঃ সাবলাল। এটা তুই একটা কামের মোতো

ভায় কেরেছিস্। যা, জল্দি আন্। ওস্তাদে।

[ত্রিলোচন মঞ্চ থেকে চলে যায়।]

[ত্রিলোচন চলে যাওয়ার পরেই দুজন লোক (যাদের পোষাক ও চেহারা দেখে মনে হয় কোন পরিব) প্রত্যেকে হাতে একটা করে নতুন কম্বল নিয়ে খুশি মনে মঞ্চের একধারে দিয়ে ঢুকে মঞ্চ ঘুরিয়ে যেতে যেতে মঞ্চের অন্য ধার দিয়ে বেরিয়ে যায়। কন্যালী একবার এদের দিকে সাধারণভাবে তাকায়।]

[রামখিলান লোক দুটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা চোখের আড়ালে চলে যায়। ফলে রামখিলান আসের নজরে পড়ে না। লোক দুটি চলে গেলে রামখিলান নিজমনে দুবার মাথা নেড়ে, গালে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে বসে। তার অভিব্যক্তি দেখে মনে হয়, সে লোক দুটির এই যোগদানের জন্য আপসোস করছে।]

[টেপ রেকর্ড চেয়ার হাতে নিয়ে ত্রিলোচন মঞ্চে ঢোকে। চেয়ারে বসে।]

ত্রিলোচন (রেকর্ড-প্লেয়ার চালু করার প্রস্তুতি নিতে নিতে)। নূতন ক্যাসেট লাগিয়েছি। আওয়াজ যা হোবে না।

রেকর্ড-প্লেয়ার চালু হয়। শোনা যায় ওজস্বি তেজী ও আবেগী ভাষণ।

ভাষণ। হম্ সব্ ভায়্ হাঁয়? হম্ ভায়া যঁ কা দুখ নেহি সিরো? ভায়্ পড়ে তো রামজন্মভূমি কে লিয়ে হম্ ভায়া খুন ম সে সকে? দুনিয়া মেঁ কেই ভায়া কাম আসনি সে নেহি হোতা হ্যায়। অযোধ্যায় আমাদের বীরের মোতো লোকতে হোবে এবং আমরা লোকবো। ভুলো মাত্ কি অযোধ্যা হামারী হ্যায়। লেকিন হামারী অযোধ্যা মেঁ রামজন্মভূমি কে উপর এক মসজিদ কিউ? অরে, ইয়ে তো সারে হিন্দুস্তাঁ কা অপমান হ্যায়, অপমান। ইয়ে তো হম্ সব কে লিয়ে এক নিলারুন অপমান হ্যায়। আজ, ইস্ অপমান কা প্রতিবাদ হম্ ন করেঁ। ইসে হম্ আজ কি মর্দ্ হুঁ। চুপ্ রহোঁ।

(সমবেত জনতার জোরালো কণ্ঠস্বর 'নেহি')

তো শুনে, অযোধ্যায় হমে খুন্ বহুকে নিশানা হ্যায়। ভবিষ্যতে আমরা যেনো সির্ উঁচা করে বোলতে পারি 'হামনে যি খুন্বাম সে ধাঁচা নিয়ারা হ্যায়।' আঁহ্মবিশ্ওয়াস্ রাখ্যো। জোর সে বলো উঁচাও আউর ছেত সে পুকারো "মাঁয় দোয়া সিহ্ কা জান্তা খুলো/খুন উসকো সুনা সমুতে যো আয়া। মাঁয় হিন্দুরাজ বান খুলো/খুন্ উসে মিটা সমুতে যো আয়া।"

(সমবেত জনতার জোর হাততালির শব্দ।)

মনে রামসেওকেঁ, তফ্রা আর্। সর্দা আগে বাড়তে রহো। 'খুন্ সিহ্-গর্জন করো কি খুনখাতে রহতে ডরে, খুনখারি জোতাদারি কি রহতে ডরে, তো মন্দির মেঁ রোজ্ লাখোকের ওহ্ জন্ম যো আয়েগা।' বোলো 'জয় শ্রীরাম। জঁন্ জঁন্ মেঁ আওয়াজ উঁচাও 'জয় শ্রীরাম।'

(সমবেত জনতার জয়ধ্বনি 'জয় শ্রীরাম' এবং সেইসঙ্গে জোর হাততালির শব্দ।)]

[কন্যালী ও ত্রিলোচন যখন ওজস্বি এই ভাষণ মন দিয়ে শুনে যাচ্ছে তখন দেখা যায় রামখিলান এদের পিছনে বসে নিঃশব্দে একবার হাই তোলে। তার চোখমুখ দেখে বোঝা যায় সে এসব কথায় উৎসাহ পাচ্ছে না। তার মনে উদ্দীপনা জাগছে না।]

[রেকর্ড-প্লেয়ারে যখন সমবেত জনতার 'জয় শ্রীরাম' ও তাততালির শব্দ শোনা যাচ্ছে সেইসময় লালজি মঞ্চে ঢুকে 'আরে ভুম্লোগ্ বহু মেঁ বৈঠে কর্ ক্যা কর্ রহে হো। আমি কোথায় কোথায় তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।' বলতে বলতে মঞ্চের বেদিকে কন্যালী ও ত্রিলোচন বসে আছে সেদিক দিয়ে মঞ্চে ঢুকেন। এদের কাছে এসে দাঁড়ান। ত্রিলোচন সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড-প্লেয়ার বন্ধ করে দেয়। কন্যালী ও ত্রিলোচন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।]

লালজি ঃ শুনো, ওজস্বি শক্তির এয়ারকন্ডিশনিং মেশিনটা খোরা গড়বড় করেছে। মেকানিক ডাকতে হোবে। (এবার অনুরোধসূচক কণ্ঠস্বরে) যে কেউ একজন গিয়ে জোনো মেকানিককে ডেকে আনো। মোটর সাইকিলে যাও। দেরি কোরো না। (এরপর ত্রিলোচনের দিকে তাকিয়ে) ত্রিলোচন, তুমিই যাও। কন্যালী বরং থাকুক। ওজস্বি জোশন কি মন্ত্রণার লাগে।

[কন্যালী ও ত্রিলোচন মঞ্চের বেদিক দিয়ে ঢুকেছিল সেদিক দিয়েই মঞ্চ ছেড়ে চলে যায়। সঙ্গে রেকর্ড-প্লেয়ারটা ত্রিলোচন নিয়ে যেতে ভোলে না।]

[লালজিকে মঞ্চে ঢুকতে দেখেই রামখিলান উঠে দাঁড়ায়। কন্যালী ও ত্রিলোচনের সঙ্গে লালজির কথাবার্তা চলাকালীন সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। লালজি অবশ্য তার উপস্থিতি খেয়ালই করেন না।]

[কন্যালী ও ত্রিলোচন মঞ্চ ছেড়ে চলে যেতেই রামখিলান লালজির দিকে এগিয়ে যায়।]

রামখিলান (লালজির কাছাকাছি এসে হাত জোড় করে)। রাম রাম, মালিক।

লালজি (রামখিলানের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিন্তু প্রতিনমস্কার না করিয়ে) ঃ তুই বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলো? ঘোর জোমজলরা জোমায়। ভাক ওদের। রলিয়া আউর কজন নিয়ে থাক। (এরপর মঞ্চমুখ ঢুঁচকে একটু পিছিয়ে এসে) বাপরে বাপ। তোর সামনে দাঁড়নো যাজনা। দিনের জেলাতেও হাঁড়িয়া পিয়েছিস।

[রামখিলান আরও নত হয়ে হাত জোড় করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।]

লালজি (বিরক্ত হয়ে)। কি ছোলো?

[রামখিলান একইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।]

লালজি (আরও বিরক্ত হয়ে)। ছোন্ রামখিলান, সারাদিন শরীরের উপর দিয়ে কাম্ বকম্ গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখোন তোর ছেদ্রা নিশার ওয়াস্ত আমার নেই। আমাকে আরাম কেরতে হোবে।

[রামখিলান তবুও কোনো কথা না বলে চুপচাপ একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।]

লালজি (ক্রুদ্ধ বিরক্তিসূচক কণ্ঠস্বরে)। আরো ফুলিস্ ছো। কি ছোলো? চুপ্ ছেরে দাঁড়িয়ে আছিস্ ছেনে?

[ভয়ে রামখিলানের শরীর কেমন কেন অবশ হয়ে আসে। হাতে পায়ে কাঁপুনি ধরে।]

রামখিলান (ভোক গিলে ভয়ে ভয়ে কোন রকমে বলার মত করে)। কোনো আপ্মি আসেনি মালিক।

লালাজি (ভয়ংকরস্বরে গর্জে উঠে)। কিউ?

রামবিলাস (ভয়ে থতমত খেয়ে অনেকটা আমতা আমতা করে)। ক্যালালা না হোলে — ক্যালকলা না হোলে ওরা — ওরা — ওরা— কেউ আসবে না —

লালাজি (ভয়ানক বিস্মিত হয়ে অত্যন্ত কড়া কণ্ঠস্বরে)। ক্যালকলা? কৌন্ সা ক্যালকলা? ফিরের ক্যালকলা?

রামবিলাস (ধমক খেয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে)। রামকলার মন্ত্রির বানলে আমাদের ঘুষ্‌তে দিবেন তো, মন্ত্রিজি?

[সভা মঞ্চে আলোর উজ্জ্বলতা অনেকখানি কমে আসে। একটি বালবের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ে লালাজির মুখমণ্ডল ও শরীরের উর্ধ্বাংশে। অতি বিস্ময় ও ক্রোধ মিলে লালাজি নির্বাক হয়ে যান। দেখা যায়, ভয়ংকর রাগে তাঁর মুখের মাংসপেশী থরথর্ করে কাঁপছে। ঘুষ্‌তের কপাট আঙুল দিয়ে একটা চেয়ারের পেছনের অংশ জোরে খাঁমচে ধরে অতি কষ্টে তিনি নিজেকে সামলে নেন।

লালাজি (ভয়ংকর রাগমিশ্রিত হিসে কণ্ঠস্বরে)। জান্ শালা সিস্‌ব্। জান্‌তামা পাঁইবেন।

[রামবিলাস ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পেছিক দিয়ে মঞ্চ ঢুকেছিল পেছিক দিয়েই 'পড়ি কি মরি' করে মঞ্চ ছেড়ে চলে যায়।]

[লালাজি আস্তে আস্তে একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাঁপাতে থাকেন।]

লালাজি (একটু পরে রামবিলাস পেছিক দিয়ে মঞ্চ ছেড়ে চলে যায় সেদিকে তাকিয়ে থেকে)। জান্‌তা হ্যায়, সেটী এই লালাদের উপকার নিয়েছে। (একপা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে) সন্ত ভূলসীদাসজি কি সাধে বোলেছেন 'ঘুষ পত, লেলাগীওয়ালা আউর নারী এ তিনো তারুনা কি অধিকারী।' (একপা একটু হেসে) তান্‌তা ভূড়া এদের উল্‌তা বোঝা যাবে না।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।]

শেষ দৃশ্য

অন্ধকার মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হয়। দেখা যায় মঞ্চের একেবারে পিছনে একদিকের উইংস থেকে আর এক দিকের উইংস বরাবর সাদা কাপড় টানটান করে টাঙানো। মঞ্চের অনেকটা পেছনের দিকে খানিকটা ফোম ফেলে একটি ছোট অতিথিভবনের চারপাশে বসে আছে রামনিহাল, রামপিয়ারী, রামলখন, রামধরাপ, রামদেও, রামচরণ, রামবিলাসের বউ এবং রামধরাপের বউ। অতিথিভবনে আওনের কোন শিখা নেই। সমস্তরাত ধরে ছেলে ধরে আগুন নিতে আসার মুখে। অতিথিভবন ধূসর হয়ে জ্বলে আছে। কাঠামোটাও শেষ।

সবারই চোখেমুখে রাত্রি জাগরণ, ভয়, উৎকণ্ঠা, মুক্তির আর আকুল প্রতীক্ষার ছাপ স্পষ্ট।

আবহ ঃ শোনা যায় দূরে কোথাও একপাল শেয়াল ডেকে ওঠার আওয়াজ।

সময় ঃ শীতের শেষ রাত। অন্ধকারের রেশ তখনও কাটেনি। সভা মঞ্চে আলো-আঁধারি পরিবেশ।]

[রামনিওয়াস সপাশে হাই তোলে। রামপিয়ারী নিঃশব্দে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙে। রামচরণ ও রামলখনের চোখে ঘুমের চুলুনি। শরীর এলিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু তারা বারেবারে শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসে থাকতে চেষ্টা করে। রামধরাপ হাঁটু মুড়ে হাঁটুর উপর হাত রেখে চুপচাপ বসে আছে। রামদেও বার দুই হাত দিয়ে মুখে চোখ রগড়ায়। রামধরাপের বউ শীতে জবুথবু হয়ে বসে চুপচাপ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। রামবিলাসের বউ মাথা নিচু করে কপালে হাত দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আছে চুপচাপ। রামধরাপ একবার জোড়ে হাঁচে।]

রামপিয়ারী (একটু পরে পাহারা চাপড় মেরে)। শালা, মরব্ মরুব্।

রামনিওয়াস (শীতার্ত স্বগতোক্তিসূচক সুরে)। আহারমান জাড়। আউর রহা নেহি যা রহা। (একপা আবার শীতার্ত স্বগতোক্তি করে) শালা, নরকৃষি ভি গরম্।

[তারপর সে অতিথিভবনে ঢোকার আগল অবধিই আছে তাতেই তার দু'হাত সেঁকে। হাতের গরম তালু গালে, কানে ও গলায় বারবার বোলাতে থাকে।]

[আবহ ঃ শোনা যায় শেয়াল ডাকার শব্দ।]

রামবিলাসের বউ (কপালে হাত দিয়ে মুক্তিপ্রার্থনাসূচক কণ্ঠস্বরে)। রাত খতম্ হোয়ে এলো। সেকিন এখ্ নাম্‌নি ওয়াপস্ আসলো না। (একটু থেমে শীর্ণকায় ছেড়ে) সারা রাত এইসান্ ভয়ানক আছে কোথায় যে থাকলো।

রামধরাপ (একটু পরে অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে)। মন্ত্রিজি মুখিয়াকে কাল্লকিতে আসিকে রাখলো নহি। ঘুষ্ তো সমঝ্ মেঁ নেহি আ রহা।

রামচরণ ঃ আশ্চর্যের কিছু নেই। কোথায় বিলাস হোলে মন্ত্রিজি তো অনায়স্ ওস্‌সা ফেলে।

রামলখন ঃ আমার তো মোটেমাই মোনে হোচ্ছেলি কামটা ঠিক হোচ্ছে না।

রামদেও ঃ মুখিয়ার মাথায় কেনো যে এরকম একটা ঘুষ্ চাপলো ভগবান জানেন।

রামপিয়ারী ঃ আরে, ছোটো জাতের এতো বাড়াবাড়ি ভালো না। এতে অমঙ্গল হোয়।

রামনিওয়াস ঃ মুখিয়া কষ্ কিস্‌নি আছে। হাঁ— ।

রামবিলাসের বউ (ছোটো ছোটো রামনিওয়াসের কণ্ঠস্বর নকল করার চেষ্টায়)। মুখিয়া কষ্ কিস্‌নি আছে। (একপা ভাঁজালো স্বরে) তোরা সোবাই তোখোন চুপ্ কোরে থাকলি কেনো? ওকে ছেড়ে দেওয়ালি না? মানা করলি না কেনো?

রামনিওয়াস ঃ আরে, মুখিয়া কোই শুনেবওয়ালা আদমি হ্যায়? সোবাইকে তো চুপ করিয়ে দিলো।

রামধরণ (রামবিলাসকে ধরে নিয়ে) ঃ চু বড়ভাই, চুপ কর্।

[রামধরণ উঠে দাঁড়ায়। তারপর ধীর পদবিক্ষেপে মঞ্চের বিপরীত কোণে ঘুরে গিয়ে পায়চারি করতে থাকে। তার চোখে মুখে গভীর ও ঘন দুশ্চিন্তার ছাপ।]

রামবিলাসের বউ (একটু পরে দুশ্চিন্তাসূচক স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে) ঃ তবিয়ত্ খারাপ হোলো নাকি। কী জানে, হয়তো সেজন্যই আসতে পারছে না।

রামধরণের বউ (সান্ত্বনা দেবার ছলে) ঃ তাহলে পাঁচ যে একটা খবর আনতো না? আসবে আসতো।

রামধরণ (পায়চারি থামিয়ে রামবিলাসের বউয়ের দিকে তাকিয়ে)ঃ আটটা বেজে গেছি। মুখিয়া ফিরে আসে কি না। সেই তো রাত্ সব্ কামলিয়ের আছে। আসবে আসবে।

[রামধরণ আবার পায়চারি করতে থাকে।]

[মঞ্চ ঃ মঞ্চের অন্ধকার-আলোর ভাব একটু বিকে হয়। আলোর উজ্জ্বলতা সামান্য বাড়ে। বোঝা যায় রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। ভোর হওয়ার আগেকার অবস্থা।]

[আবহ ঃ দু'একটা পাখির ডাক শোনা যায়। কাক ডাকে 'কা-কা-' শব্দে। একটু পরেই মঞ্চের বেদিকে বসে লোকেরা আগুন পোহাচ্ছে তার উল্টো দিকের উইংসের পাশে 'ঝপাস' করে মোটামুটি জোরালো একটা শব্দ শোনা যায়।]

[রামধরণ শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে ঘুরে দাঁড়ায়। বাকী অভিনেতারা কাছে আসেন। তারা সবাই সচকিত হয়ে সেদিকে তাকায়।]

[নেপথ্যে ঃ ঝপাস করে শব্দ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় রামবিলাসের অন্ধকারতর আর্ত কণ্ঠস্বর 'রামধরণ রামনিওয়াস— ']

রামধরণ ও বাকি পুরুষরা (প্রায় একসঙ্গে ভয়ার্ত স্বরে) ঃ আরে, মুখিয়া —

[একথা বলেই সবাই প্রায় লাফ দিয়ে উঠে ছুটে মঞ্চ থেকে চলে যায়। রামবিলাসের বউ এবং রামধরণের বউ এদের পিছু পিছু উইংসের কাছ পর্যন্ত প্রায় ছুটে চলে আসে।]

[পুরুষরা সবাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রামবিলাসকে ধরাধরি করে মঞ্চে বয়ে নিয়ে আসে। তাকে অভিনেতারা ধরাধরি করে নেয়।]

[মঞ্চ ঃ ভোরের হালকা আলো একটু একটু করে ফুটে ওঠে।]

[দেখা যায় রামবিলাসের মাথার একদিকে আঘাতের চিহ্ন। সেখান দিয়ে রক্ত ঝরছে। মাথার একপাশের সাদা চুল রক্তে লাল। সারা মুখে রক্তের ধারা চিহ্নিত হয়েছে।]

[রামবিলাসের বউ ছুটে এসে রামবিলাসের মাথার কাছে প্রায় বসেই পড়ে এবং তার মাথাটা কোলে তুলে নেয়। রামধরণের বউও প্রায় ছুটে এসে বসে পড়ে রামবিলাসের বউয়ের পাশে। পুরুষরাও সবাই রামবিলাসের চারপাশে বসে পড়ে তার দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে ভয়ার্ত স্বরে কেঁদে ওঠে —'তোরা আমাদের ছেড়ে কনা গিয়া —']

রামবিলাসের বউ ও রামধরণের বউ (প্রায় একসঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে) ঃ রে কা হল হো গিয়ারে — রে কা হল হো গিয়ারে —

রামবিলাস (সন্তর্পণে একবার চোখ খুলিয়ে চোখাটে চোখে দেখে নিয়ে অন্ধকারতর কণ্ঠস্বরে) ঃ অবেরকা মেঁ তখনক ঘুস্ আয়ার হোনেওয়ালা হায়। ঘুসনেকা মৌকা যাস্ আয় তখী খাত্‌মা হায়। খাস না। কেউ বাকি বিশেষ না, তার নিখাশেও না। (এরপর অন্ধকারতর স্বগতোক্তি) উঃ-আহ-ওহ্- (এরপর একটু থেমে) উস্ অখির মেঁ হাম্ খুব নেহি পায়েছে — তখী হাত্‌মা দেখি অখিকার নেহি (এরপর যন্ত্রণার আতুরে উঠে) উঃ-আহ- ওহো পানি — ওহ্-আহ — (এভাবে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে।)

[রামধরণের বউ মঞ্চ থেকে ছুটে চলে গিয়ে একটু পরেই একটা জোরালো পুরনো এলুমিনিয়মের জগে করে জল নিয়ে দ্রুত মঞ্চে ফিরে আসে। রামবিলাসের বউ ও রামধরণের বউ কাঁদতে কাঁদতে গ্লাস থেকে একটু একটু করে জল রামবিলাসের মুখে ঢালতে থাকে। রামবিলাস একটুখানি জল খেয়েই আর খেতে পারছে না। তার গলা থেকে কেমন এক ধরনের ঘড়্ ঘড়্ শব্দ ওঠে। মুখ থেকে জল তার গলা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়।]

[এই সময় রামবিলাসের মুখে মৃদু আলোকসম্পাত ঘটে।]

রামবিলাস (প্রবল যন্ত্রণার কাতর স্বরে তীব্র আর্তনাদ)ঃ উঃ — ওহ্ — আ —

[এই আর্তনাদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘাড় ও মাথা তার বউয়ের কোলের মধ্যেই একদিকে কাত হয়ে গিয়ে নিশ্চল হয়ে যায়।]

[রামবিলাসের বউয়ের হাত থেকে জলের গ্লাসটা তৎক্ষণাৎ পড়ে।]

রামবিলাসের বউ (বুক ফাটা কান্নার চিৎকার করে উঠে) ঃ মেরা সর্বনাশ হো গিয়ারে — মেরা সর্বনাশ হো গিয়া রে —

[কাঁদতে কাঁদতে রামবিলাসের বউ রামবিলাসকে জড়িয়ে ধরে। রামধরণের বউ রামবিলাসের বউয়ের পিঠে মাথা রেখে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।]

পুরুষরা সবাই (গভীর শোকে, তীব্র আর্তনাদে, দীর্ঘ সুরতরঙ্গে কেঁদে ওঠে)। মুখিয়া —

[এরা সবাই রামবিলাসের মৃতদেহে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদতে থাকে।]

[মঞ্চ ঃ 'মুখিয়া' বলে তীব্র আর্তনাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় মঞ্চের পেছনের সাদা পর্দায় সিলুএটে একটা ট্রেন ঝড়ঝড় শব্দে ছুটে যাচ্ছে। ট্রেনটা দেখা যাচ্ছে। কামরায় কামরায় প্রচুর লোক বসে আছে। ট্রেনের ঝড়ঝড় আওয়াজ সত্ত্বেও কানে আসে যাত্রীদের সমবেত কণ্ঠে জোরালো স্লোগানধর্মী জোরালো আওয়াজ ঃ

'অযোধ্যা তো ওহি নাম/রামলালা জনমস্থান'

'অযোধ্যা হামারী হ্যায়/রামমন্দির বানা হ্যায়'

'পুণ্যভূমি অযোধ্যা/রামমন্দির যেখানে'

একটু পরেই ট্রেনের শেষ কামরার ছাদ পর্দা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সিলুএট দৃশ্য পর্দা থেকে মুছে যায়। স্লোগানধর্মী আওয়াজও আর শোনা যায় না।]

[মঞ্চে দেখা যায় রামবিলাসের বউ তখনও স্বামীর মৃতদেহে জড়িয়ে ধরে আছে আগের মতোই কেঁদে চলেছে। রামধরণের বউ ও রামবিলাসের বউয়ের পিঠে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পুরুষরা সবাই তখনও রামবিলাসের দেহের চারপাশে বসে তার দেহে মাথা ঠেকিয়ে

নীরবে অশ্রুপাত করে চলেছে।]

[একটু পরে ওমুমার রামদেও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।]

রামদেও (দাঁড়িয়ে থেকে কান্না জড়ানো গলায়) ঃ নিজের জান দিয়ে ঘুষিয়া আমাকে ঃ সোনাইকে সফ্‌ফিয়ে দিলো — অন্ধকারের সামনে নিয়ু কুঁকলা নেই। অন্ধকারও নিয় উঁচা রাখতে পারে। তখে দাঁড়াতে পারে। (এরপর একটু থেমে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে গলায়) এক রাতকে হামে নিয়া গয়া তো আমরা যায়? অতি ভি হাম্ ইক্‌না রাম — আম্ আম্ মেঁ জিন্দা হাঁ। (এরপর আবেগময় কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে) বলিস, হু জন খুন্ আম্ তন্ সে — হামরা ইস্ গাঁও সমুহ্ হি জিন্দা আছে। ইস্ গাঁও কে হি এক আদমি আউর গাঁওবাসী হাম — কিতনা সমঝুদার আছে), কিতনা মিলনসার আউর কিতনা মহান আদমি আছে। (এরপর ভোরের দিকে) তো ইস্ গাঁও পুনরভূমি না তো কী।

[যারা আগে নিচু করে বসেছিল তারা সবাই আগে মুখে অন্তর্পূর্ণ চোখে রামদেওয়ের মুখের দিকে তাকায়।]

[অন্ধকার পেছনের সরানো পর্দার ফাঁক দিয়ে দূরে দিগন্তের কিনারায় লাল আভায় মত সূর্য উঁকি দিচ্ছে। ভোর আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে লালিমা। অন্ধকার মুখে এসে পড়ে প্রতিদিন আলোর আভা।]

[আবহসঙ্গীত বেজে চলে। পর্দা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়।]

স মা প্ত

ভারতবর্ষকে পোলিও মুক্ত করতে নেওয়া হয়েছে

পালস্ পোলিও টিকাকরণ প্রকল্প

আপনার শিশুর বয়স তিন বছর পর্যন্ত হলে, ইতিমধ্যে পোলিও টিকা খেয়ে থাকুক বা না থাকুক, শিশুকে ১৯ ডিসেম্বর '৯৫ ও ২০শে জানুয়ারি '৯৬ একমাত্র করে পালস্ পোলিও টিকা অবশ্যই খাওয়ান।

শিশুর স্বার্থে ও দেশের স্বার্থে পোলিও রোগ উচ্ছেদ করুন

বিশদ বিবরণের জন্য আপনার নিকটবর্তী হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে যোগাযোগ করুন

আই ই সি ডিভিশন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

বিজ্ঞাপন সংখ্যা আই ই সি / এফ ডব্লউ /৬৫/৯৫-৯৬

By Courtesy

Central Excise & Customs Employees' Co-operative Credit Society Ltd.

Custom House, Calcutta- 700 001

The Bankura District
Central Co-operative Bank Limited

Regd. Head Office : Machantala, Bankura
West Bengal

Adjudged the best Central Co-operative Bank of the State by the
West Bengal State Co-operative Bank Limited for the Year 1993-94

The Bank at a glance (Rs. in lacs) as on 31.3.95

❑ Owned Fund	505.31
❑ Working Capital	5065.91
❑ Deposit	3204.14
❑ Loans and advances	1537.30
❑ Net Profit (estimated)	57.05
❑ No. of Branches	15 (including Main Branch)

Save with us and earn more

Rate of Interest on Deposits :

A.	Savings Bank a/c	5.5% P.A.
B.	Term Deposit for :	
i)	21 days to 45 days	3% P.A.
ii)	46 days to 179 days	9.50% P.A.
iii)	180 days to 364 days	10.25% P.A.
iv)	1 year to below 2 years	11.25% P.A.
v)	2 years and above	12.25% P.A.
vi)	Monthly Income Scheme	12.50% P.A.

A Bank
of the People
for the people
by the people
of Bankura District

DEDICATED TO THE SERVICE OF THE DISTRICT SINCE 1922

Your deposits with us are fully safe like that of Nationalised Banks and
are covered under Deposit Insurance Scheme.

We pay 1½% Higher rate of interest at every stage
on deposits than that of other Bank.

I. Bhattacharyya
Chief Executive Officer

A.K. Ganguly
Chairman

বি ক তা

শহিদ বেদির পদতলে

কৃষ্ণ ধর

আমাদের জন্য কি কিছু অশ্রু আছে?
সমস্ত আকাশ চৌচির করে কী ফলি
এই তো তুমি আছো ধূলিতে শোণিতে
আমাদের প্রত্যহিক জীবনযাপনে
নিজেরাই নিঃস্বাস হয়ে না।

ঘরে শুধু আলোবাতাস তাড়া করে
নিয়ে আসে সভ্যতার সভ্যিকথা
ইতিহাস ভেঙেচুরে ওরা স্বাধীনতায়
ইমারত গড়েছে নিজের খেয়ালে
সেখানে কি তুমি ঘরে থাকো?
তোর তাকাও কোনদিন ইচ্ছা হলে?

বেরিকেডালোর ঢেলা কাঁকরে
ফুটে ওঠে তোমার নাম প্রতিদিন
শহরের অলিতে গলিতে
সে তো মিথ্যা করে বলা

চারিদিকে অবরোধের ভেতরে
তুমি স্পর্ধায় একা, তবু একা নও
আমাদের সব কিছুর মেরুবিন্দু খুঁজে পেতে
হলে যেতে হয় তোমারই কাছে

সভায়-মিছিলে শহিদ বেদিতে তুমি একা
তবু তুমি নও অসহায়।

□

আজও দেখছি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পুলিসের তাড়া খেয়ে
একটা রাত্তিরের জন্যে যে-লোকটা এখানে
লুকিয়েছিল,
জঙ্গলমহলের সিসীমারায় এখন আর তাকে
দেখা যায় না।
অথচ এই ঘন-বাবলায়
গোধার ঘরের আগুনও দেখছি
সাতদিন-না-কামলেও তার মুখের হাসিটা আজও
আটকে আছে।

মাথার উপরে আকাশটা এখন আর
দেখতে পাই না। অথচ
আজ সকালেও
পুকুরে নিশ্চই আকাশ ভেঙে উঠেছে
ছোঁড়া মেঘের ছবি।

□

এই সব খন্ড ছিন্ন ...

আনন্দ ঘোষ হাজরা

এই সব খন্ড ছিন্ন ভগ্ন অংশগুলি
তাদের হাত ছোঁয়া ছক এই সব বিন্দু বিন্দু রক্তকণাগুলি
চতুর্দিকে উঠে আসে সংযোগবিহীন _
এ কেমন হা হা ঘুম অতি-পরিচিত ঘরে ফেরা
বাতাস গন্ধকবর্ণ বন্ধুরত ধানমান ওড়ে ছিন্নভিন্ন
যে সকল বৈজ্ঞানিক
এ কেমন বিশ্লেষণে ভেঙেছে আমার সত্তা
দেহ মন প্রাণ।

মুছবে কেবল
আমার ললাটে ভাসে বিস্তীর্ণতে, আমার স্পন্দন
ছড়াবে খুঁজে ফেরে যোগসূত্রেরা।
আনো শুদ্ধ সংযোগের মন্ত্র বাঁধো সমূহ আঘাতে
সমস্তরা, প্রকৃত উদ্ধারে ফিরে এসো।।

□

সুভগা

বিকাশশঙ্কর মৈত্র

ফোটাতে পেরেছি কি কোনো কথার কলি,
জ্বালাতে পেরেছি শপথের আলো
বিভাসিত করে মোর গানের রেশ থেকে
মাখায় ফুল, উদাসে কথা দেয় পরিজাত-গন্ধ।
মৃদালতি করে আনে নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।

জাগাতে পেরেছি কি কোনো শব-সত্তম
ফেড়ে নেবে শাশ্বী সবিকল, বিষাদ বিকেল
ঘুমে ঢল-ঢাল আদুত আহোরাত্র
ধূসর পাহাড়ী ঝোরা বুকের ভিতরে,
নীরার নিথরে জাগায় সহস্র ফুলুল —

জাগাতে পেরেছি কি কোনো শব-সুভগা?

□

পড়ন্ত রোদুর

অপরাজিতা গোস্বামী

পড়ন্ত রোদুর হাঁটতে হাঁটতে
কখন সূর্য নিয়েছে অস্তাচলে
জানতে পারেনি কেউ —
পড়ন্ত রোদুরে হাঁটতে হাঁটতে
সময়ের অবগুনে পৃথিবীটা
কখন ছুঁয়েছে গীমানা বুঝতে পারেনি
নদীর ঢেউ বাতাসের উৎস থেকে
কেবলি ভেসে ভেসে
নিত্য নতুন ভাসে নিজেকে ভেসে
সময়ের সীমানা পারেনি
তাকে বেঁধে রাখতে —
এমনি করে প্রতিদিন
পড়ন্ত রোদুর আর নদীর স্রোত
জীবন থেকে জীবনকে নিয়েছে
ছিনিয়ে, কখন কেমন করে
কেউ তা পারেনি জানতে।
তবু নিত্য নতুন প্রত্যাশার আলো
জীবনকে ভেসে ভেসে
সাগরের উত্তাল স্রোতে
নিয়েছে টেনে
অনন্ত-অসীমপানে
সত্যমের সন্ধানে।

□

নিজের প্রহরী

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

সব রাস্তার শেষে একজন করে দাঁড়িয়ে আছে
পথ আগলে
পথ আটকে
এড়ানো যাচ্ছে না
তোমার কাছে আমার যাওয়ার দরকার ছিল
তুমি কেন হাওয়ার ভরসে ভাসো ঘুর্ণি হাওয়া
তোমার পাওয়ার জন্যে
আমার হাত বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল

অনেক সময় পথে নদী থাকলে নৌকো থাকে
ফুল গন্ধ থাকলে ফুলের সময় পেরোয়
সূর্যের আলো চন্দ্রকিরণ থাকে মাঝে
আয়নার হাত বাড়ায়

কিন্তু পথ আগলে আছে এক একজন
গলিপথ সুড়িপথ রাজপথ
কোনভাবেই পেরোতে পারছি না
সে কিবো তারা এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে

তুমিও তো উল্টোদিক থেকে আসতে পারতে
সে খবরটাও পৌঁছে দেওয়া যায়নি
তোমার গরজই কী যা
তুমিই বা কেমন করে জানবে আমার মনোবাসনা

পথ আগলানো লোকগুলো কিছুতেই সরে দাঁড়াচ্ছে না
তাদের পিঠে রক্তমাখা দেয়ালগুলি

তুমি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছো
না হলে কে যেন কেন বলে গেল
প্রত্যেক পথের মুখে আমিই দাঁড়িয়ে
একা একা পা টুকছি
একা একা নিজের প্রহরী —

□

কষ্টের কথা যদি বলো

প্রত্যুষসুন্দর ঘোষ

অনেক রোদপুড়ছিটি এই রাত
চারে তোমাকে অনেক ভরসা দিয়েছে তবে নিয়ে
আমার প্রেমিক ভালোমন্দ বিষাদখুশি সমান অসমান
সব তবে আমাকে পবিত্র করে। কলস ফেলল গহে
সব কিছুতেই আনন্দ, সকলকে কাছে টানা
স্বপ্ন কল্পনার গল্প — মৃগতৃষ্ণে মায়াবাড়ী
চোখের মণিতে জলে. সেই জলে ডুবে মরি —
আর শান্তি আর স্বস্তি. ফলত অন্ধকারে টুকরো
মর্মবিদারী যন্ত্রণা সব কিছু পেরিয়ে এই দুরীর
অবস্থায় কেটে গেছে দু এক বছর — আর কোন
বৃষ্টি নেই, যন্ত্রণাত দুর্যোগ নেই। মেঘহীন
শ্বেতপাথরের টানা বারান্দার মতো সুখের সকাল।
দুপুর সন্ধে রাত্রি বলে কিছু নেই, চিরদিন
কলস পুলেছে।

একদিন শত সৌজন্য রাতি
দাঁতে কাটতে গিয়ে ভেঙে যায় সূর্যাস্তের কাঁচ
অন্ধকার ঘনাতে কেটে সন্ধেবেলার টুলি খুলে ফেলি
আমাকে পরীক্ষা টানে নীল বিদ্যুতের সাপ
কষ্টের চাদুক আমার দেহ, গায় ভেঙে পড়ে
পাখি মন্ত্র
স্মৃতি তীব্র হলাহল গোপনে অক্ষয়,
পুরোটাই কষ্ট, কষ্টের কথা যদি বলো,
তবে সুখে আছি —

□

আলো

মধুছন্দা দাশগুপ্ত

ততটুকু অন্ধকার চাই
যতটা তমের কাছে লাগে
যতটুকু সৃষ্টির উৎসারে

তারপর ঝলমলে সময়
আসে চাই আলো
এমন কি মধ্যরাতে সূর্যের কলার যেন দেখা যায়
যেমনটি দেখেনো দেখেনো দেশ দেখতে পায় ...

প্রতিদিন ভোরবেলা অন্ধকারসুদের কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে আরত্ত করবী
আর গান মনে আসে আলাইয়া বিলাবল এবং ভৈরবী ...

বিসর্জন নিয়ের মত দেখে থাক মেঘ ও কুয়াশা
আমাদের আনন্দাসে
এভাবে অন্ধকার তুমি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে আসো
আলো আরো আলো
টুপটুপ বৃষ্টি ফোঁটা দেখতে পাই রোদ্দুরে মিলায়ে

□

ভারত নাট্যম

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

সে এখান থেকে হেঁটে গেলে
পায়ের তলায় নেচে ওঠে ভারত নাট্যম
ঘুঙুরের ঝমঝম শব্দে বুকের ভিতরে বৃষ্টি নামে
সেই বৃষ্টির জল ঘুরে নেবে শরীরের ক্লেদ
অকাল সবুজ হয়ে ভাসিয়ে দেয় বাড়ি ঘর
শুধু তার পায়ের চিহ্ন স্থির থাকে কষিপাথরের মতো।

তোমাকেই বেসেছিলাম ভালো
কতদূর থেকে পাখির উড়ন্ত ছুটির মতো প্রেম
অবহেলে নেমে আসে এইখানে বুকের ওপর।
আর দুটি বাড়িয়ে রাখো এইদিকে
মাঝখানে চিলার ফাঁক দিয়ে ছোটে জলস্রোত
উষ্ণ প্রস্রবনে ঘুয়ে যাও ধুলো মলল, সন্দেহ।
সন্দেহ মনেই পাথরে একটু একটু করে কল নামা,
আমি পাথর হতে চাই না কখনও
চোখের বৃষ্টিতে শুধু ঘুরে মেরে অলোকিত শরীর
এখানেই কষিপাথরের মতো চিহ্ন স্থির হয়ে আছে পায়ের ছবি
তুমি হেঁটে এলেই শুরু হবে ভারত নাট্যম।

□

সেদিন

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

এক বুক রক্ত ছড়িয়ে পড়েছিল তোমার চিবুকে
পড়ন্ত আলোয় মায়াবী হয়ে উঠেছিল তোমার মুখ
উদ্ভাসিত চাহনিতে তুমি বিদ্ধ করেছিলে
আর দুটি চোখ —
সমুদ্র প্রহর পলে পলে উদ্বিগ্ন হয়েছিল সময়ের আবর্তনায় ;

নদী কি স্বভাবের বাইরে চলে যায়
নাকি কোনোদের পাল নাকি হাওয়া নাকি সমুদ্রের স্রোত
কারে টানে, তুমি জানো —

সেদিন সমুদ্র প্রহর পলে পলে উদ্বিগ্ন হয়েছিল
সেদিন এক বুক দুঃখ নিয়ে সেনালী কদম
একবার আকাশ আর অন্তরবর্তী মাতৃজঠরে
মুক্তির ইচ্ছার প্রার্থনা জানিয়েছিল
সেদিন ভিতর ঝড় মেঘ ভাঙলো
এক বুক রক্ত ছড়িয়ে পড়েছিল তোমার চিবুকে
সেদিন পড়ন্ত আলোয় মায়াবী হয়ে উঠেছিল তোমার মুখ
সেদিন মেঘে মেঘে পাহাড় এঁকেছিলে তুমি
আমি এঁকেছিলাম সীমাহীন বৃষ্টি
সমুদ্র প্রহর মন্থরিত হয়েছিল সময়ের আবর্তনায় ;

তারপর এক সময় উদ্ভাসিত চোখে বৃত্ত পার হয়ে
তুমি মেঘ ছুঁতেই বৃষ্টি ঝরে পড়েছিল সেদিন
ঝমঝম্ ঝমঝম্
বৃষ্টিও এক সময় তার স্বভাবের বাইরে চলে যায়
যেমন করে যায় নদী, কিংবা সময়
কিংবা প্রেমের ফুসীলব।

□

এখানে দাঁড়াও

নারায়ণ সেন

এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াও
দাঁড়ালেই দেখতে পাবে তুমি
অন্ধকারে কি হয়।

এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াও
দাঁড়ালেই দেখতে পাবে তুমি
কিভাবে নষ্ট হয় বিশেষী শরীর।

এখানে সারারাত ঘুরে বেড়ায় নরনেকড়ের পাল
এখানে সারারাত প্রহর গোনায় হরিণশাবক।

□

ফুল ফুটছে

বীরেন সাহা

অঘ্রানি পেঁয়াজের টবে
অনাদরে তোরাজে সাজানো সন্ধ্যায়
ঝলমল করছে রঙীন স্বাগতম,
তুলসীতলায় শঙ্খচিলের আলো মেখেনি —
তবু সে ফুটে উঠছে — ছড়াতে চাইছে পদ্মের মত
সুবাস দরদ আলো স্পর্শ করছে অলিকের
রাগবৈভব
ওকে ছড়াতে দাও — ও ফুল হয়ে উঠুক —

সংবৃত মাটির ভেতর
চাপল দানের দুঃখ মুছে ফেলে
কোটার ইতিহাস চরাচরে বিস্তৃতা তবু
পলে পলে সৌদ্ভিতে শেষ হয়,
চেনা হলো অনাদর সূর্যের করুণার
মাটির ভেতর আলোরেখা সত্ত্ব অন্ধ রাখে
মেয়ে গেড়া শরীর,
তবু বুকে জেগে ওঠে সমুদ্র দামাল

চেনা ঘাই থেকে চরে যেতে যেতে
রূপময় জলের মত ঝলমল নিকষিত ভাষা,
ফুল ফুটছে কোজাগরী রাতে
এই ফুলে ভালবেসে কেউ মুক্তি চেয়েছে।

□

মুখ

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখের আদল ভেঙে উঠে আসে মুখ
দর্পণে আলোর ছায়া বিচিত্র শরীর
ওই মুখ কবি হয় ভিখারি আর মাটি
কখনও উত্তর বায়ু তীব্র হাতছানি।
দামাল স্নিগ্ধ দিন তারারা যেমন
ওই মুখ জেগে থাকে আলোর ভিতর
এবং জীবন বিন্দু মেঘময় রাতে
মুখের আদল ভাঙে অবিকল মুখে।

□

দিনগুলি

গৌতম হাজরা

পুরানো সূর্যের কাছে মেলা হলো তোমার আদর।
সেইসব কথাগুলো আজ বড় নতুন মনে হয়
মনে হয়, এই মরা ঘুঁটে মাখি তোমাদের যে প্রিয় মানুষ
সমস্ত আকাশ ভুলে জেগে থাকার ইচ্ছে নিয়ে দারুণ
ভালোবাসায়।

আমি কি ঢুকে যাচ্ছি সেইসব দিনগুলির সঙ্গে?
টানের বাতাস বিদ্ধ তোর, সূর্যের মিঠে আলো
তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?
যত অভিযোগ গান তোমাকে আজও ভুলিনি, ভুলিনি
সেই গোপন আস্তানা থেকে উঠে আসা নতুন প্রেমপত্র
হে প্রিয়তমা, আমি আজও খুঁজে যাচ্ছি পরাণের মধ্যে
সেই কবী চাঁদ।

ধবধবে আকাশ প্রতীন ঢোকের মতো দুলছে
ছুটে আসছে একদল নিটুর ঘোড়সওয়ার
আর আমরা উঁচিয়ে পড়ছি দুরন্ত নদীর জলে
নীল জোৎস্নার সাদা আলো মরুসর্গে কেন আজ।

সেদি হালুম বাঘের পিঠে চড়ে চলে যাচ্ছে দিনগুলি
পেছনে ভিটের দিকে আবার।

□

নগরীর কাছে কিছু নেই

অসিতবরণ নাথ

নগরীর কাছে কিছু আর নেই
চেনা আছে সমুদ্রের রঙ,
এই বাতাস, ঘাস কড়িং, ঘোড়সওয়ার নারী
নিখর নিস্তব্ধ গ্রাম কানাচের কাছে
তবু পৃথিবীটা পুরাতন,
পুরনো জেনেই তাকে অবগাহন-নীল
সমুদ্র প্রণয় মনে হয় অবেলায়
যেখানে কিছু শ্যাওলার সাথে কিনুকের ঘর
ওধারে আমের গাছ, বকুল শেফালি
এখানে একখানতি চাঁদ রহিমের জল

নগরীর কাছে কিছু আর নেই
কংক্রীট, সিমেন্ট বালি আকাশ ধাঁধানো
যাদের প্রেমের সখী যাদব বাহিনী
— চেনা থেকে যায় তবু
দূরে সেই সমুদ্রের কাছে।

□

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণে

সুনীত বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ত নিশ্চিত নয় কিছুই এখানে
কখনও কখনও —মেঘে মেঘে খেলে যেতে হয়
হাত ধরে ভালোবাসা নিয়ে যায়
'অহেতু' ভাসা করে মেরে

কিন্তু কি কোথাও আছে আয়ত্তিক কলা যার বলে
জলস্রোতে বুকের ভরসে — প্রতিদিন কলস প্রভায়
ভেসে যায় — নিশ্চল প্রেমে

কবরীর চোখের কোটরে শুধু কত কথা হয় —
কত কথা রয়ে যায় জলে
চলে গেলে সব কথা আলো হয়ে ফোটে।

কোলকাতা তোমার শরীরে — বিষ্ণু জড়ুল হয়ে
জন্মাবধি আছে —
পিচঢালা পথে তোমার দু'পাশে
হেঁটে যায় কবি ও কবিতা
নীরবে কখন মৃত্যু সন্ধা পড়ি এসে থামে হঠাৎ
সে সময় ভালোবাসা নেই
যে সময় প্রেম হয় — নিষ্প্রাণ বীণ
যে সময় কিছুই এখানে — থাকে না নিশ্চিত
সে সময় বরফেই ওরে থাকা ভালো।।

□

এই তো কিছুক্ষণ আগে

ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়

এইতো কিছুক্ষণ আগে ছিল নীলাকাশ
চোখ ফেরাতেই দেখি মেঘে ঢাকা
জীবনটা ছিল যেন সহজ-সরল
সহসা কেন যে আঁধারাকা

এইতো কিছুক্ষণ আগে
সকলের মুখে ছিল হাসি
কিন্তু দেখি নেই আর হাসি নেই
সমবেত ওরা এক দুর্যোগের প্রত্যাশী

এইতো কিছুক্ষণ আগে
কলমলে রোদ্দুরে দিন
গান ও গানে মশগুল হয়ে
অবাক চোখেতে দেখি
কিছুই আর না দেখা
দৃষ্টিটা আজ বড় ক্ষীণ

এইতো কিছুক্ষণ আগে
জীবনের সমস্ত সকল নিয়ে
স্নেহ ছিল ভালবাসা তাও ছিল
শুধু যে বুঝি না কেন ছিল কিছু ফাঁকা
মিছে শুধু হয় নাকি
সন্তানের মা কিংবা বাবা বলে ডাকা।।

□

চৈত্রের বাগান

অজিত বাইরী

চৈত্রের বাগান থেকে পাতা এসে পড়ছে উঠোনে। একটির পর একটি। স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে পাতা — শান্ত, নিরুচ্চার। কিছু বলবো ব'লে আসিনি। কিছু শুনবো বলেও না। শুধু চুপচাপ ব'সে থাকবো আর দেখবো পাতার ঝরোঝরি।

চৈত্র শেষ হয়ে এলো। এমনি করেই একটি একটি ক'রে যাবে চৈত্র, ঝরন্ত পাতার মতো। পাতার পরতে-পরতে রয়ে যাবে বর্ষস্মৃতি।

কি-বা বলার ছিলো? কিছুই কি ছিলো না বলার? উঠোন সমেত একরাশি ঝরাপাতার মুখোমুখি হেঁটে যাবে সহস্র প্রহর। হয়তো দু'একবার কেঁপে উঠবে ঠোঁট। হয়তো বিকিত অন্তরতরে কাপ্‌সা হবে চোখ। হয়তো ক্ষণিক মেহেড়াবে ছায়ার কৈশোরানো পাতার মতো।

কিছু বলবে ব'লে আসিনি। কিছু শুনবে বলেও না। পাতা ঝ'রে ঝ'রে চৈত্রের বাগান শূন্য হয়ে এলো।

□

সময় বিলম্বিত

সুস্মিত হালদার

একেকদিন ব্রোয়াকে পা ঝুলিয়ে
মনে হয় পুরনো সময়ের সাথে গল্প করি,
দীর্ঘ সময়ের অবিরাম আলাপন
অথচ, সম্রাট চেতনা আমাকে নিদারুণ শাসায়
প্রতিদিন পরমায়ু কেড়ে নেবে একটি ঘড়ির মত
তবে শরীর ওটিয়ে নিয়ে
আমি আদের মত নির্বিকার হাঁটি।
যৌবনে যেদিন সময়কে কমলার কোয়ার মত
পলকে পলকে বিতাজন করতুম;
শরীরের প্রতিটি ভাজে ঘাম প্রকম্পনে
সযত্নে পোষ মানাতে পেরেছিলাম
সেই সাহসী বালকদল আমাকে নির্মম ভ্যাল করে।
পরাগত পরমায়ু আজও বিলম্বিত প্রেরণা আনে
— প্রিয়তমা কিংবা পত্নীসমা কোন নারীতে;
অথচ এক্ষেত্রেও সম্রাট চেতনা
আমাকে তখনি ভুলে
তালিয়ের ব্রোয়ার মত চর্মসার শরীরের গন্ধ
আমূলের তলা দিয়ে খুঁটে খেয়ে নিয়ে
নির্বল হৃদয়ের এক ঠোঁট অনর্থক পণ করে
আমার তিক্তিরী ভাবনাটা আরেকবার অনুভব হয়।।

□

কোনদিকে

প্রণব মাইতি

আমাদের চারপাশে বান,কেউ জল,
আমাকে জড়িয়ে রাখে — কলোমতি গান
গানতো সকলে গায়, দুঃখে আর সুখে
মানুষের বড় কষ্ট — গানে গানে এবং অসুখে।

বিষয় তালকানা জন — সন্ধিয়ে বাজান
গানগুলা মুখ বুজি — পরিবেশ মাপ,
জলমোতে ভুবে যায় — এজীবন ভুল পড়া পাতা
হাঁটতে চলতে ভাবি, কত ভুলে জীবনের খাতা ...

লাল রঙ — লাল সিঁথি — গৃহিনীর গলাও ভোলাল
আমি গান লিখি না — মুখের ভাষাল,
আর সেই লাল নিয়ে — রক্ত পতাকা,
আমার বন্ধু নেই — মিলিয়ে নিয়েছে ওরা একা,

আমাকে বাঁচায় সুখে — বলে যাও কেন্ পথে যাবো
লাল কার্পেট মুখ — বলো কাকে কিভাবে ভোলাবো।
গৃহিনীর লাল ঠোঁটে জীবনের গান,
আমি শুনি গান আর — বিশ্ব উজান। □

চলো যাই

বাসুদেব চ্যাটার্জী

চলো যাই —
শহরের কোলাহল ছড়িয়ে
মাঠ প্রান্তর, নদনদী, পাহাড় পর্বত মড়িয়ে —

সাগরের ঢেউ ছুঁয়ে,
উটের পিঠে চড়ে, মরু পেরিয়ে —,
গভীর অরণ্যানির হাত ছুনিয়ে —
মুক্তির স্বাদ নিই।

কি পেয়েছি?
নকল সভ্যতার বাঁতা কলে পিষ্ট হয়ে,
ভেজে এনেছি কালব্যাধি, ক্ষয় আর ক্ষয়।
হত্যা করেছি মানবিকতা,
সভ্যতাকে নিঃশেষ করে, ক্রুর হাসি হেসে
মুনাফার পাহাড়ে বসে।

আর নয়।
এবার বন্ধমুষ্টি তুলে,
সমর্পে ঘোষণা করবো
যে কোন মূল্যে ফিরিয়ে আনবো
সভ্যতার পাশাপাশি প্রকৃতিকে —
অলিঙ্গন করবে জোছনা —,
ধূলিকে করবো মধুময়।
সোচ্চারে বলবো — চলো যাই —
যেখানে নিস্তব্ধ নিশেথে অসীম নীরিমায়।

□

এক □ দুধসর ধানের মমতায়

দেবাশিস প্রধান

মেহেদী মুনালী যে অঙ্গে আর
আলতা আলোর, দুর্বিনীত চুল
নিত হাসা অলকায়, ক্ষণিক ছল —

সবাই হারালি ঘরে অপেক্ষমান সন্ধ্যা গড়ায়
নিরালা আলো নামে সকালে পায়ধ্বনি পথে
মুকুল ধানের মমতায়।
কীর হয়ে পাকে পরিণতি, প্রতিটি মুহূর্ত।

দুই □ ছবি

ভেজে আকাশ আমির ঘরে তেলে
কখন ঘরে মনোরমা মেয়ে
একলা একা উদাস হাওয়ার মতো —

ভাবতে ভাবতে সময় ফুরোমুরি
পুবের দরজা পশ্চিমেতে ঘরে
ছবির মেয়ে উঠছে বারোমাস —
বাতাসের নীল ছায়ায় মেলে।

আবার পরির সময় ছবির খেলা
সাজাত চলার ভঙ্গিতে মুক্তো ফেলে
ছবিতে নিজে আসল আলো চায়।
আবছায়ের মেয়ে, স্পর্শ সুখের সবটা
নূতন সাজে উঠো পাছে
ছবির মতন পাখপাখালি ইসটি কাটে ঘরে
উঠানটা আবছা পাতুর গাছের পাতীর মেয়ে নাচে।

□

শারীরিক

দেবাশিস বাগচী

শরীরের নেশা তবে মেয়ের পায়ের
নিয়ে খেলা

আমি আমি অবলা মেয়ের শীতল
কখনও আঙুল তুলে মোরগোপ
আমেলি মোরগে

কিং ব্রেভে নিয়েছিল পরীক্ষিৎ পায়ের মেয়ে
তখন সে পরীর মেয়ের মেয়েদের
উদাসের ঘরীরা হয়ে উঠেছে
তুমি বলেছিলে — 'আমি কি পাথর?'
আমি আমি মেয়ের পায়ের তল
শরীরে নেশা
এখন আবার।
মাঠ ফুড়ে বৃষ্টি হল খুব। □

ঝড় উঠলে শব্দ শুনতে পাই

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

সেই রাতে বাইরে যখন ঝড় উঠেছিল
বন্ধ কাঁচা ঘরে শুধুমাত্র শুনেছিলাম নূপুরের শব্দ,
হিংস্র নখর আকাশকে ছিন্নভিন্ন করে
ঝরিয়েছিল অশ্রু
বাড়ালটন ভেঙে পড়েছিল,
অন্ধকারে বুকের মধ্যে সযত্নে মেখেছিল
আতঙ্কের মুখটি :
নিজেকেই লুকিয়ে রেখেছিলাম,
কারো সঙ্গে আলাপ করা সম্ভব হয়নি তখন।

গত রাতেও প্রচণ্ড ঝড় ঘরে গায়ে,
বুকের মধ্যে দলিত্রে বেড়িয়েছে পরম আতঙ্ক,
ঘূর্ণি বাতাস চারপাশে তাণ্ডব করে
ভেঙেছিল আয়োজন,
ইলেকট্রিক, টেলিফোন পোস্ট উপড়ে পড়েছিল
অন্ধকারে মুখ দেখা, মাথা গোঁজারও উপায় ছিল না,
অশান্তির ঝিমিঝিমি আগুন
নিজের মধ্যেই ঘরে রেখেছিলাম,
মুক্তের খবর নেয়াও সম্ভব নয় এখন।
এখন ঝড় উঠলে, বাইরে ভেতরে
নূপুরের বদলে হৃদয় তাণ্ডবের শব্দ শুনতে পাই।

□

ঝড়কুটো

প্রবীরকুমার সামন্ত

যে ফুলের নয় আঁখি নিত্য আজন্মেই
প্রাণের গোপন শত্রু পাতা অজান্তেই
এসেছে নতুন বেশে যে বীশের রাণী
পরিজন পরিবৃত তন্ত্র আনমনি।

ভুলে আনা ঝড়কুটো নিম্নু বা সকল
প্রবাহিত স্রোতধারা শুধু জল নয়
পলাতকি মৃত্তিকার আবাস নির্জন
পায়ের একটু মাটি সংযোগ প্রণয়।

একটু সমানুভূতি পরিবেশ হলে
ফসলের অভিজাত্য প্রীষ্মের প্রাক্কালে
ফলাবোগ সতর্কতা সবুজের অবিতে
কাঁটাগাছ নির্মূলিত প্রাণের মাটিতে।

□

ক্ষুদ্র চাষিদের সেবায় জেলার বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস

কৃষ্ণনগর ■ নদীয়া

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫ টি শাখা আছে

কৃষিতে লগ্নি	৯৯০.০০ লক্ষ টাকা
আমানত	২৭৮৬.৪২ লক্ষ টাকা
শেয়ার	২৩০.৮৫ লক্ষ টাকা
গ্রামীণ শিল্পে লগ্নি	৪৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা

নূতন হারে আকর্ষণীয় সুদ, অন্যান্য ব্যাঙ্ক-এর তুলনায় ১/২ শতাংশ বেশি
সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা আছে।

● আপনার টাকা ভারত সরকারের আমানত বিমা প্রকল্পের অধীন ●

(কেন্দ্রীয় সরকারের সুসংহত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্পের (আই সি ডি পি) মাধ্যমে
জেলার সমবায় সমিতির ও তাদের সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্রতী এই ব্যাঙ্ক)

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important in village life.

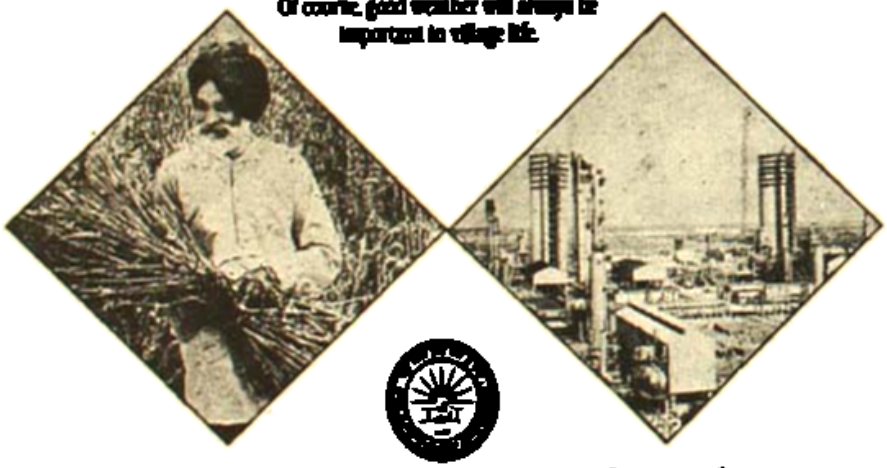

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

ক্রীড়াজগৎ

ভদ্রজনের খেলায় অভব্য উৎপাত

অজয় বসু

কালে কালে ক্রিকেটের কী হালই না হচ্ছে। ছিল ভদ্রজনের খেলা। কিন্তু অল্প ঘষিতঘষি আর ঘুমবল লোভীদের উগ্র চাপাচাপে পাঁয়তারা এবং লেপাপোর নামান চলাচলের টান ক্রিকেটকে তার স্বস্থানে থাকতে দিচ্ছে কই। এত সব কাতকারখানার ফের মেটাতে গিয়ে ক্রিকেট আজ বেসামাল। তার আদর্শগত অস্তিত্ব এখন সংকটের মুখে। মৌল মূল্যবোধ রীতিমত বিপন্ন।

একদাকালে ক্রিকেট পরিচিত ছিল শালীন, সদাচরণের প্রতীক হিসেবে। তখন 'ইট্স জাস্ট নট ক্রিকেট' বললে যার উদ্দেশে বলাটি বর্ষণ করা হোত তার মুখমণ্ডল রাঙা হয়ে উঠত। কারণ যে দেশ থেকে খেলা ক্রিকেট বিশ্বের অন্য প্রান্তে ছড়িয়েছে সেই ইংল্যান্ডের মূল্যবোধের মাপকাঠিতে 'ইহা ক্রিকেট নহে' এই বাক্যটির চেয়ে বড় গালাগাল তখন আর কিছুই ছিল না। অস্তিত্বানে থেকে থাকুক বা না থেকে থাকুক, যে ক্রিকেট-এর অর্থই ছিল সোজা পথে চলো, বাঁকা চলন বর্জনীয়। সুস্থ জীবনচর্যায় অবাধী হয়ে থেকে ক্রিকেট কাল থেকে কালান্তরে ঘাত ও তার বাইরে সার্থক পথ পরিক্রমণে উৎসাহ যুগিয়ে এসেছে। এই বহমান ঐতিহ্য যথার্থ ক্রিকেট প্রেমীদের মানসলোককে সমৃদ্ধ করেছে, উত্তরণ ঘটিয়েছে অন্তরতর স্তরে।

যে কালের কথা বলছি সেইকালে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে ব্যাটসম্যানেরা সব ক্ষেত্রেই যে হাউচিত্তে সাদরে নিয়তেন অথবা সব ফিল্ডসম্যানই সর্বদাই সন্তুষ্ট হতেন, তা নয়। ক্ষোভ, অসন্তুষ্টিও তখনও কাউকে ভুগতে হোত। কিন্তু ক্ষোভের বহ্নিকে প্রকাশ ঘটিয়ে অশালীন ভূমিকায় অবতির্ণ হতে চাইতেন না কেউ। মনের দুঃখ মনে কেপে লুকিয়ে রাখতে হোত সবাইকেই। ক্ষুব্ধ মনকে সংযমের পরিসরায় বেঁধে রাখার অভ্যস্ত ক্রিকেটাররা এই শালীন খেলাটির সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখতে জানতেন।

পেশাদারী প্রথা চালু থাকা সত্ত্বেও আম্পায়ারিংয়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে [illegible] শব্দটি করার উপায় ছিল না কারুরই। অবশ্যত পেশাদারেরাও শুধু যে তাঁদের পেশার বৈধিক তাৎপর্যের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন তাই নয়, দায়বদ্ধ ছিলেন মূল খেলাটির আদর্শগত পবিত্রতার প্রতিও। তাঁরাও দামের অংশটা অবশ্যই করতেন। কিন্তু শুধু জীবিকার সংস্থানই নয়, সেই সঙ্গে জীবনের সম্মানও তাঁরা পেতে চাইতেন। যা কিছু শোভন ও শালীন তার প্রতিই তাঁদের মন ছিল। যা কিছু অনৈতিক নিষেধিকা তা মান্য করাই ছিল সেকালের ক্রিকেটারদের ধর্ম। মনে মনে আম্পায়ারিংয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিও বা চলত, মুখ ফুটে কথা বা প্রকাশ্য অসন্তুষ্টিতে তার জ্ঞাপন দেওয়ার উপায় ছিল না।

ছয়ের ক্রিকেটের সেইসব দিন শেষ হোয়ার। তে হি নো কিংবদন্তী। কেনই বা হারিয়ে যেতেন মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধ ক্রিকেটাররা। সেইকালে যাঁরা খেলতেন, যাঁরা ক্রিকেটের সম্ভ্রান্ত সজ্জার মর্যাদা ও শিষ্টাচারকে আগলে রাখার স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদে দায়ভারিত্ব পালন করে গেছেন তাঁরা সবাই কি সন্ন্যাসত ছিলেন? তা তো নয়। তাঁদের মন পড়ে থাকত বাস্তবের দিকে। হার-জিৎ, সফলতা-ব্যর্থতার ওজন তাঁরাও বুঝতেন। তাঁরা ছিলেন একালের ক্রিকেটারদের পূর্বসূরী। একালের মত সেকালেরও অনেকে ছিলেন পেশাদার খেলোয়াড়। কিন্তু পূর্ব আর উত্তরসূরীদের মূল্য মানসিকতায় বড় রকমের বিভেদ ঘটে গেছে। সেই বিভেদের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটে আজ উত্তরসূরীদের আচার আচরণে। কালে ছাওয়া লক্ষণগুলি ক্রিকেটী আদর্শে সুলক্ষণ নয়। তাই দিনে দিনে ভদ্রজনের খেলাটির সংকটও ঘনিয়ে আসছে।

পূর্বসূরীরাও গলার নিচ ঘুলিয়ে হাউজ দ্যাট্ বাঁক তুলেই ফিরে তাকাতেন আম্পায়ারের পানে। আম্পায়ার আঙুল না তুললে ওই মুহূর্তেই বলের ওপর মমতিম মেলে আসত। লাঠি ঘুরে যেত তখনই। কিন্তু উত্তরসূরীরা কি করছেন? তাঁরা কি এতো সহজে ক্যাপারটার ফয়সালায় রাজি হচ্ছেন? না, হচ্ছেন না। হাউজ দ্যাট্ আবেদনে সাড়া জাগি না মেলে তাহলে কি আর আম্পায়ারের হুকে আসে? বোলার ও সাঙ্গপাঙ্গরা তখনই শুরু করে দেন অশোভন ঘষিতঘষি। ধমক, রক্তচক্ষু, কৌতুকোক্তানী, উদ্ধত অঙ্গভঙ্গি, লোকদেখানো আস্ফালন, কিছুই বুঝি বাদ পড়ে না। কখনো সখনো মনের কাল মেটাতে স্বয়ং বোলার এক দুটকল কিকে বেল উড়িয়ে দিন কয়িতে পড়া উইকেটের আয়াশলতলা দুমদার করে দেন।

আর কলনায়ক কি শুধু বোলাররাই? ব্যাটসম্যানরাও এ ব্যাপারে কম যান না। তাঁদের কেউ কেউও অবশ্য এইসব কিলবুটে কালের পরিক মনে করছেন। এল বি ডব্লিউ হওয়ার পর ব্যাটে হাত দাগিয়ে তিনি বোঝাতে চান যে বল পায়ে নয় লেগেছিল ব্যাটে অথবা কই বিহাইণ্ড হওয়া যে ব্যাটসম্যান বাস্তব উর্ধ্বাংশে দেখিয়ে কলতে চান বল ব্যাট নয় ছুঁয়েছিল তাঁর শরীর। তাঁরাও তো ক্ষুব্ধ বোলারদেরই সমগোত্রীয় — এক পালকেরই পাখি।

বোলার, ব্যাটসম্যান ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের লোকদেখানো অঙ্গভঙ্গী, যা প্ররোচনামূলক অঙ্গকর্মেরই নামান্তর। এসব দীর্ঘদিন মুখ বুঁজে সহ্য করা হয়েছিল। খেলাটিকে আইনমতে শাসন করার ভার যাঁদের তাঁরা ভাবতেন যে ক্রিকেটের শালীন চরিত্র বজায় রাখার দায়িত্ব ক্রিকেটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উপলব্ধি করবেন। এই ধারণাবশেই ক্রিকেটের নিয়ম প্রণেতারা এক সময় সুতো ছেড়ে ছেড়ে খেলোয়াড়দের বোধবুদ্ধির ওপর বিশ্বাস রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বেয়ারা চরিত্রের খেলোয়াড়েরা সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেননি। এইসব দুর্বিনীত খেলোয়াড় শুধু যে আম্পায়ারিংয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাই নয়, মাঝে মাঝে আস্তিন গুটিয়ে পরস্পরের দিকে তেড়ে গেছেন। কখনো আবার স্টাম্প আর হাতের ব্যাটটিকে হাতিয়ার বানাতেও তাঁরা দ্বিধা করেননি। এমন বেয়াদপিতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা ক্রিকেট খেলে সব

খেলাটাই শাশ্বত আদর্শের প্রেক্ষিতে বেমানান। তাঁদের উপস্থিতিই ক্রিকেট মাঠের পবিত্রতা নষ্ট করে দিচ্ছে। জল যে ভাবে নিচে গড়ায়, তা বুঝে নিয়ন্ত্রণ প্রশাসকরা অবশ্য নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছেন। ছোট্ট দেওয়া হাতের মুঠো ওটিয়ে নিয়ে এবার তাঁরা আইনী শাসন প্রয়োগে কল দিয়েছেন বাধ্য হয়েই। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধের অসন্তোষ ফাটিয়ে দিয়ে মুষ্টিমেয় ক্রিকেটারেরা (পড়ুন অ-ক্রিকেটারেরা) আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন বিক্ষোভ প্রকাশে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, অন্যদিকে চড়া মেজাজের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অহেতুক ওটিয়ে বাই-স্ট্যান্ডারে দাঁড়িয়ে থাকার পরামর্শের পানে ছেড়ে তাকাচ্ছেন। যাঁরা ক্রিকেট মাঠে এখন সব বেয়াদপি করছেন তাঁরা বলে যান তাঁরা ক্রিকেটী তথা খেলাধুলোর মূল প্রেক্ষিতে রীতিমত ফুলঝরি উপকরণ। মোদ্দা টানে তাকাতে তাকাতে এইসব উপকরণ যে সব ছুঁয়ে খেলায় সেইগুলিই হয়ে পড়ছে অপরিচয়।

ইংল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভারত উপমহাদেশে, যেখানেই ক্রিকেট আসর পাতা হোক, এই পলাশ ছোঁয়া শৌখিন মেজাজ সেই অক্ষত্রেই। অক্ষত্রগুলিকে মূলমুক্ত করতে আইনী শাসনকে আরও জোরদার করে মুষ্টিমেয় খেলোয়াড়দের মাঠ থেকে ওটিয়ে ফেরার ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে আম্পায়ারদের হাতে। ভারতের মাটিতে সদ্যোদিত এই নিয়মের বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে এক আম্পায়ার টেস্ট খেলোয়াড় মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনকে একদিন মাঠ থেকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়েছেন। ফুটবলে, হকিতে যেরকম খেলোয়াড়দের মাঠের বাইরে পাঠানোর প্রেক্ষাগৃহ ছিল, আছে। ছিল না ক্রিকেটে। এখন থেকে ক্রিকেটেও এই ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। মেপে ওজন করতে ইচ্ছে হয় যে অজহারের খেলা হিসেবে প্রচারিত খেলা ক্রিকেটের আজ চরিত্রের অন্তর্নিহিত বা অবশিষ্ট রইল?

একজনের একজন টেস্ট ক্রিকেটার (সম্ভার মজহারের) অযোক্তন মতন করার অপরাধে মাঠ থেকে বিতাড়িত হলেন। তার আগে নামী নামী খেলোয়াড়েরা (মিয়াদাদ-সিদ্ধু-বোর্ডে-লাম্বা-প্যাটেল) যারমুখী ভঙ্গিতে অন্যদের দিকে তেড়ে গেলেন। এক জাতীয় দলের অধিনায়ক (দক্ষিণ আফ্রিকার কেপলার ওয়েসেলস) ইচ্ছে করে অম্পিল দেবের পায়ে বাট দিয়ে আঘাত হানলেন। কী যে কিলুটে ঘটনা সব। এর পর কি ক্রিকেট 'নোবল' খেল হিসেবে তার চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যের দাবি জানাতে চাইবে? কোন মুখে চাইবে। চাইলেই বা সে দাবিতে কল পাতা হবে কেন?

ক্রিকেট খেলার নামে ইডেনে মাঠে ময়দানে কত রকমের নেংরামি যে প্রকাশ পাচ্ছে তার হিসেব দাখিল করতে গেলে একখানি মোটা মহাভারতই লেখা হয়ে যাবে। দু-একটা ঘটনা ও সেগুলির প্রাসঙ্গিক তাৎপর্যের বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

ফাস্টবোলারের মনসংযোগে চিড় ধরানোর সংকল্পে ব্যাটসম্যানি দাঁড়ানো ফিল্ডসম্যানেরা মুখে মুখে ব্যাড-অ্যাড মন্তব্য ছুঁড়ে দেন। ক্রিকেটী পরিভাষায় এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'স্লেজিং'। অস্ট্রেলিয়ার ইয়ান চ্যাপেল থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিভ রিচার্ডসের সময় পর্যন্ত এই 'স্লেজিং' সবাইকে প্রচুর পেয়ে এসেছে। অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক স্লেজিং-এর নামে এমন সব 'পবিত্র' ভাষা ব্যবহার করতেন তা শুনে তাঁর আত্ম-আইনেরও ঘুমভঙ্গ আরও আরক হয়ে উঠত সন্ধ্যায়। শেষ পর্যন্ত ওইসব পবিত্র শব্দ যাতে বর্ষিবিষে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য টিভি-ক্যামেরার ব্যবহারযোগ্য মাইক্রোফোনগুলি মাঠ থেকে দূরে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

স্লেজিং শব্দটির আভিধানিক অর্থ যাই হোক না কেন, ক্রিকেট মাঠের স্লেজিং কিন্তু নিতান্তই নিম্নরুচির পরিচায়ক। খেলায় মনযোগ করতে না পেরে অন্য অপকৌশলে প্রতিপক্ষকে বিপদে ফেলার চেষ্টাকে 'খেলার অংশ' বলে না। পাক দিয়ে যেমন মাছ ধরা যায় না তেমনি স্লেজিং শব্দটি ব্যবহার করে ক্রিকেটকে, অথেলোয়াড়ী ও নীতিবিরুদ্ধ অপকর্মকে আড়াল করা যায় না। তবু এই অপকর্মটি চলিত নথিভুক্ত হয়ে গেছে। স্লেজিং নামক অভদ্র আচরণকে মাঠ থেকে উৎখাত করার জন্য যে আইনী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা সেটাই অপকর্ম।

বল বিকৃত করার চেষ্টা ক্রিকেটী ঐতিহ্যের পরিপন্থী আর একটি অপকর্ম। নখ দিয়ে আঁচড় কেটে কিছু (ইমরানের মত ভেতরের দিকে দিয়ে) সাধারণ বলের সেলাই উঁচু দিকে তুলে বল বিকৃত করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, বিকৃত বল নিয়ে বাড়তি বা বকলম সুইং করানো। বলের পলিশ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে মুখ দিয়ে চুষিয়ে যাকে, ভেসলিন বা ওই জাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ ব্যবহার করার কথা অতীতেও শোনা গেছে। ভারতের বিশেষ সিং বেদি, ইংল্যান্ডের গেস যেদার জন লিভারের বিরুদ্ধে ভেসলিন ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছিলেন প্রকাশ্যে। সে ঘটনার বহুর মূল পত্র আবার বল বিকৃত করার অভিযোগ উঠেছে। পাকিস্তানী ইমরান খান মাঠ থেকে অবসর নেওয়ার পর নিজের মুখেই তাঁর অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন। আর হাল আমলে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক মাইক এথারটন তো বল বিকৃত করতে গিয়ে টিভি ক্যামেরার দেখে ধরাও পড়ে গেছেন। টিভি ক্যামেরা অনেকেরই মুখোশ আলগা করে দিচ্ছে।

তবে বল বিকৃত করা হোক অথবা। তবে প্রযুক্তিগত অভিসন্ধীর সন্ধানতা পাওয়া যেত না বলে প্রাক্ টিভি পর্বে আম্পায়ারেরা হাতেনাতে ধরা পড়তেন না। মুক্তোর-ভিনের দশকেও বল বিকৃত করা হোত বলে ওই প্রজন্মের বিখ্যাত অস্ট্রেলীয় স্পিনার আর্থার মেইলি অভিযোগ তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'টেন ফর নিনটি-নিন অ্যান্ড অল দ্যাট'-এ। মেইলি লিখেছেন তাঁদের আমলেও কেউ কেউ বলের এক পিঠের মসৃণতা বজায় রাখার জন্য তৈলাক্ত পদার্থ ব্যবহার করতেন। কেউ বা বলের সেলাই তোলার চেষ্টা করতেন। একদিন সিডনি মাঠে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক মে তদ্বিষ্ট এই অভিযোগ মেইলির বিরুদ্ধে হাতে রঙ্গক মাখার অভিযোগ তুললে মেইলিও ভলভাসের বিরুদ্ধে নখ দিয়ে বলের সেলাই তুলে ফেলার পালটা অভিযোগে সোচ্চার হন।

আর্থার মেইলির বক্তব্য অনুসারে গত বাট-সত্তর বছর ধরে মাঠে ময়দানে বল বিকৃত করার চেষ্টা চলে আসছে। অনুন কেউ কেউ বল বিকৃতিকরণের চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করার বারনা তুলেছে। এই বারনার কান পাতলে ক্রিকেটী মূল্যবোধও খেলাটির সব, সুন্দ চরিত্রের আরও অবাপতন ঘটানো হবে। বল বিকৃতির বিষয়টির ওপর আইনগত সম্মতির সিলমোহরের ছাপ পড়লেই গোপন চৌর্যবৃত্তিকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেওয়া হবে। আর ছুরি বিদ্যেকেই যদি মাথার তুলে

মতামতটি করার ক্ষমতা পাল করে দেওয়া হয় তাহলে আর ক্রিকেট খেলা কেন? খেলার পরী তুলে মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্তটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার উপদেশ দেওয়াই তো ভাল।

তবে ক্রিকেট জগৎ সম্পর্কিত কেউ কেউ এই কাঁকে ক্রিকেটী মূল্যবোধকে নিজের তুলে রেখে সিদ্ধান্তটিকে যে হাতে তুলে নেননি, হলফ করে তাও কি বলা যায়? টেলিফোন তলার টাকার অভিযোগ ও হাত ও হাত করার চক্রান্তে ক্রিকেটাররা যে জড়িয়ে পড়ছেন, এমন অভিযোগ তো অহরহই কানে আসছে। পাকিস্তানী অধিনায়ক সেলিম মালিক ম্যাচের ফলাফল আগেভাগে ঠিক করে (মরদানী ভাষায় গড়াপেটা) রাখার জন্যে মোটা টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন বলে অস্ট্রেলীয় স্পোন ওয়ার্নে, মার্ক ওয়াঘ, টিম মেডটেরা অভিযোগ তোলেন। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সাত দিনের জন্যে সেলিমকে সাসপেণ্ডও করা হয়। কেন এই দন্ড? সেলিম মালিক কি সত্যিই অপরাধী? যদি তাই হয় তাহলে সাত দিন বাদেই সে দণ্ডাজ্ঞা তুলেই বা নেওয়া হল কেন?

এইসব কেন্দ্র সদুত্তর পাওয়া যায়নি। পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তবে অভিযোগের পর আরও অভিযোগ উঠতে থাকায় ব্যবস্থাগুলি ক্রমশই নেতিবাচক হয়ে উঠছে। ক্রিকেট ম্যাচের জন্য বিশ্বে ঘুষ দেওয়া নেওয়া চলে, যদি বলা হয় ইতালি মন্তব্যে বাজার আরও গরম করে নিয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল এবং পাকিস্তানের আমির সহেল, খলিল আলি, জাহিদ আবাসি, সরফরাজ নওয়াজ প্রমুখেরা। বর্তার তো বলেই বসলেন যে ম্যাচ ফেড়ে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের মুক্তাক মহম্মদ তাঁকে মোটা টাকা ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন।

এইসব অভিযোগের সত্য মিথ্যা যাচাই হোক বা না হোক ঐ ছাঁটোপের ভেতর মনে হচ্ছে যে বেশ্চত্তে নানা ধরনের দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে। অর্থাৎ যাঁরা পরমার্থ ঈশ্বরান, দানের অর্থটা যাঁরা আগেভাগে মুঠে নেন। তাঁরা খেলার ক্রিকেটকে আর ধর্মবর্ণায়, স্বস্থানে থাকতে দেবেন না বলে ধরেছেন। ক্রিকেটের চরিত্র হনন করে অবৈধ তাঁরা লাভ হবেন। তাঁরা টাকার কারবার। খেলাধুলোর মূল আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি তাঁদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। ফেক পাচার কারবার করি ছাড়া অন্য কোন কিছুতেই তাঁরা ধার ধারেন না। বিবেক, নীতি, আদর্শ ইত্যাদি শব্দগুলি তাদের কিতাবে শুধু কথারই কথা। ওঁরা থাকতে ক্রিকেটের কোন ভবিষ্যৎ নেই। ওঁদের প্রীহস্তের স্পর্শে অল্পজনের খেলা ক্রিকেটকে শুধুমাত্র অতীত ঐতিহ্যের স্নোটোটাপে যে আটকে থাকতে হবে, সেই দিকেই বর্তমান তর্জনী নির্দেশ করছে। কারণ পেশাদারী প্রথার কারবারীদের কিতাবে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে তার হস্তলেপন বা তার ইতস্ট্রিলিত ব্যবস্থাপনায়।

ইতস্ট্রির স্বার্থ আগলাতে ক্রিকেট ঘিরে বণিকদের কাপকতা কখনই বাড়বে। প্রাক্তের ঘন্টা বাজিয়ে এক ধরনের ক্রমপ্লেক্সকে বড় জনের ক্রীড়ানুষ্ঠান বলে বাজার চলু করার চেষ্টায় দু'হাতে ঘুষবল মোটা হচ্ছে। সে সব খেলা পাড়ার অলিগলিতে বালখিল্যের দল খেলে থাকে, সেই জাতীয় কিছু খেলাকে পাড়ারা, হাকে, কলকাতা এবং মফস্বল অঞ্চলের বিত্তবান মাঠে-মাঠানে টেনে এনে ক্রিকেটী ঐতিহ্যের গলা-মারার পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। এই জাতীয় খেলাকে বলা হয় 'কলা মাচ'।

দেশি-বিদেশি কিছু প্রবীণ এবং বর্তমান ক্রিকেটের অনেক জনকে নিয়ে দল গড়ে কলা মাচ খেলানো হচ্ছে। কেন? ছয়ের খেলা, আসলে খেলে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান কি না, কে কোথায় কার সঙ্গে, সবচেয়ে খেলার বাস বা খেলবার আছে কিনা, লাভ উঠিয়ে এসব ভক্ত বাচাইয়ের বালাই নেই। ছোর মাঠের গরম পেলেই হল। তাহলেই মাঠের ঘরে লোক জমবে ঘরে এবং সব ভর্তিয়ে স্পনসরও যোগাড় করা যাবে। এইভাবেই চলছে কলা মাচের রমরমা। এক একটি মাচের এক দলের নামকরণ করা হয় 'ওয়ার্ল্ড ইলেভেন' বলে। সেই দলে খেলেন যাঁরা তাঁদের খেলির জন্যই দল-বাচ্চা বহু আগে খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা ইতিহাস হয় দাঁড়িয়ে। এইসব প্রবীণের চলুমজ্জাগত বালাই নেই, নেই ফিটনেস ও ফর্মের তাড়িনও। খেলার নামে মাঠে নেমে নিজনীয়ি অভিনেতার ভঙ্গে খেলার ভান করে হাত পা ছুঁড়ে থলি ভর্তি করে টাকা নিয়ে চলে আসেন। মজা এই যে এইসব বিগত যৌবন ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব হাতে কলমে সুযোগ পেলেই তরুণদের ক্রমসুনেই উপদেশাবলী অঞ্চলের উদ্দেশ্যে বিতরণ করে চলেন। কিন্তু নিজেদের আচার আচরণে সুক্রিয় পরিচয় রাখা গেল কিনা তা তলিয়ে দেখতে চান না। দানের তত্ত্ব নিজেদের গায়ে তুলতে পারলেই তাঁরা খুশি।

সবচেয়ে বিসদৃশ ঠেকে মজলা ম্যাচ ঘিরে ভাবত্ব ধারকন ক্রিকেটারদের ভাষ্যকারের ভূমিকা। দূরদর্শন বা বেতার ভাষ্যকার হিসেবে মুখ খুলে তাঁরা মজলা ম্যাচ সম্পর্কে সেইসব কথাই বলেন যেসব কথা টেস্টম্যাচ বা ওই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খেলা সম্পর্কে প্রযোজ্য। কেন দেখানো, পানি পড়ানো বুলি। বুলির চটক ও চমকে কি টেস্টম্যাচ, কি মজলা ম্যাচ, সবই অতিত। শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনে বাহুল্যের নেই। টেকনিক্যাল তত্ত্ব বিশ্লেষণে যেরকের নেই, শতীন ভেন্তুলকরের মত চলতি প্রজন্মের ক্রিকেটারের খেলা যেভাবে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেন ঠিক সেইভাবেই শতীনের পিতৃব্যর বয়সী কোন মূর অতীতের তারকার খেলার কথা বলেন। ভঙ্গিতে, মেজাজে, নিজস্ব শৈলীতে সব ভাষ্যকারই একই ধরনের। টেস্ট ম্যাচ আর মজলা ম্যাচ সম্পর্কে তাঁদের বলার ধরনে কোন ইতর বিশেষ নেই।

ক্রিকেট খেলতে নেমে অমূল্য যাঁরা আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে ফুঁসিয়ে উঠছেন, বল বিকৃত করছেন, খেলার ফলাফল আগেভাগে গড়াপেটার চক্রান্ত আঁটছেন, তাঁরা ক্রিকেটারকুলে কুলাঙ্গার উপকরণ। চরিত্রের দৃঢ়তায়, শোভন, শালীন আচরণে যেসব পূর্বসূরী ক্রিকেটের মন্দিরে শূন্যের উপচার সন্নিবেশে খেলাটির বাহ্যিক সৌন্দর্য ও আন্তরিক ঐশ্বর্যকে পরীপক করে গেছেন উত্তরসূরীর কেউ কেউ সেই ভূমিকার প্রেক্ষিতে কড়াই দেখছেন। ঐতিহ্য বিস্মৃত এইসব উত্তরসূরীর কৃতকর্মের পরীপ্রেক্ষিতে সুস্থ খেলা ক্রিকেটের ওপর এসে পড়েছে অসুখের ছায়াসম্পাত।

ক্রিকেট শুধু যে নিয়মমাফিক তাই নয়, নিশ্চিতার সম্ভাবনায় এক খেলাও বটে। এই তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী ও মূল্যবান, ক্রিকেট তাঁদেরই জন্যে। ব্যবসার জন্যে অন্য মাঠে অন্য খেলার ব্যবস্থা আছে। আলোচনার কথা, ক্রিকেটের অভিনায় ইদানিং ব্যবসার আনাগোনা শুরু হয়ে

শারদীয়া ও দীপাবলীর অভেচ্ছা জানাই

বাঁকুড়া জেলার মহিলা সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রয়াসে
অগ্রণী মহিলা সমবায়গুলির একমাত্র নিজস্ব প্রতিষ্ঠান
শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ও শুধুমাত্র মহিলা পরিচালিত
সমবায় ব্যাঙ্কিং সুবিধাযুক্ত প্রতিষ্ঠান

বাঁকুড়া মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

পি সি দরিপা ভবন (তিন তলা), বাঁকুড়া

সন্ধ্যা গঙ্গুলি — সভানেত্রী
তপতী মুখার্জি — সম্পাদিকা
বীণা ঘোষাল — কোষাধ্যক্ষ
কল্পনা দত্ত — অফিস সহায়ক
কল্পনা দত্ত — ম্যানেজার

(কলমে চাষ সহায়ীন, আসবে চাষির সুদিন)

কৃষি ও কৃষকের সেবায়ঃ
১৯৯৩-৯৪ বর্ষে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী

বাঁশী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম ঃ বাঁশী, পোঃ - রাজগ্রাম, বাঁকুড়া

সার, কীটনাশক, ঔষধ, কাপড়, তোলপত্র, উন্নত মানের হাইব্রীড বীজ, সমবায় সমিতির ব্যাগ বই, লোন লেজার প্রভৃতি সুলভে বিক্রয় করে।

বিক্রয়কেন্দ্র ঃ
নূতনচটী, যোগেশপল্লী
বাঁকুড়া

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ (১৯৪৪-৪৫ — ১৯৯৪-৯৫)
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সমবায় শীল্ড বিজয়ী
সকলের ভালবাসা, সহযোগিতা নিয়ে
বৎসরের অধিক জনগণের সেবায়

রাজগ্রাম কো-অপারেটিভ উইভার্স সোসাইটি লিঃ

(স্থাপিত ঃ ১৯৪৪ সাল)

হেড অফিস, রং ডায়িং ও উৎপাদনকেন্দ্র ঃ
পোঃ অঃ রাজগ্রাম, বাঁকুড়া
ফোন ঃ ৫০৯৫১ (বাঁকুড়া)

বিক্রয়কেন্দ্র ঃ রাজগ্রাম (বাঁকুড়া), বাঁকুড়া (সুভাষ রোড), দুর্গাপুর (বেনাচিতি), কাপুর মার্কেট, পুরুলিয়া (চাইবাসা রোড), সোনামুখী (পৌর বাজার)

অশোককুমার দে — সভাপতি
বিপিনকুমার দে — সহ-সভাপতি
সুধাময়চন্দ্র দত্ত (টিপকু) — সম্পাদক
গোপালচন্দ্র দাস — ম্যানেজার

সাবধান —
নকল থেকে সাবধান —

ডি ভি কুন্ডু অ্যান্ড ব্রাদার্স কৃত
বাঁকুড়া নিউ ২২২ নং বিড়ি

সমবায় সমিতি, দোলতলা, সতীঘাট, বাঁকুড়া৯

২২২ নং ফটো বিড়ি

জরুরকলে সেবেদে ও পাকিং-এ দোলতলা, সতীঘাট এবং রেজি নং ১১/ ডি জি পি / ২৪০৪-০৯/৯০ দেখিয়া লইবেন

নিমাই ঘাস — সভাপতি
পরীক্ষিত শীট — ম্যানেজার
বিকাশ রায় — সম্পাদক

য র শে চ বি নাকাল না

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বেশ কিছুদিন আগে ছোটদের একটি পত্রিকায় একটা গল্প লিখেছিলাম, 'নির্বাচন কমিশন'। একদিন খুব সকালে এক ভদ্রলোক বাড়িতে এসে হাজির। কোথা থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করেছিলেন কিছুতে পারব না। বেশ রাগী রাগী চেহারা। দরজায় খুব ধাক্কাচ্ছে প্রথম ভদ্রলোক — আপনিই কী সেই?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। তা ভেতরে আসুন। কোথা থেকে আসছেন আপনি?

আপ্যায়নে একটুও খুশি না হয়ে বললেন — দুর্গাপুর।

— কী সৌভাগ্য আমার।

— আপনার সৌভাগ্য, আমার দুর্ভাগ্য! তখুন বলাই, হাসির গল্প লিখছিলেন, সেই তো বেশ ভাল ছিল। হঠাৎ এই ভীমরতি কেন।

— তার মানে?

— আপনার নির্বাচন কমিশন পড়ে আমার ছেলে সাতদিন দাদাতের কেঁদেছে। বার্থডে প্রেজেন্টটা হয়ে গেছে। এই একমাস হয়ে গেল ভাল করে খাচ্ছে না। এক কেজি ওজন কমে গেছে। অ্যাটর্নিকে বলে আপনার এগেনস্টে ক্ষতিপূরণের মামলা করছুম। একটা ছেলের ভবিষ্যৎ আপনি ঝাঁঝরে দিয়েছেন।

রাগরাগ চোখ, দাঁতে দাঁত চাপা। চোয়ালের হাড় দুটো শক্ত। পারলে ভস্ম করে দেন। মেঘ গর্জনের গলায় বললেন, — ওয়ান আয়ারভাইস, পারলে হাসির গল্প লিখবেন, না পারেন লিখবেন না, কান্নার গল্প লিখে দেশের সিচুয়েশন নষ্ট করতে কেউ আপনাকে বলেনি। আচ্ছা চলি। চলে যাওয়া ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললুম, — আপনার ছেলে কী সারা জীবন শুধুই হাসবে।

— ঠাট্টা করবে। পরস্ত পরশু করে কাঁদতে যাবে কেন মুখে।

হয়ত তাই। মুখে ত আমরা এমনিই পাব। যা মুফতে পাওয়া যাবে তার জন্যে অর্থ ব্যয় করার কি দরকার। গলদের আওনে একটি কড়া। মশলা মাখান মনে কথা যাচ্ছে। লোভনীয় সুবাসে আমোদিত চারপাশ। পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু মুখোশের, ফাঁকির। জীবহত্যা। কিন্তু আগেই যে প্রাণীটি নির্বোধের মতো কাঁপাতা চিবচ্ছিল, এখন খণ্ডবিখণ্ড, তৈলসিক্ত। পাকা রাঁধুনীর হাতের কারসাজি ওলটপালট। কড়াটা বসে আছে আগুনে। যে বস্তুটি তৈরি হচ্ছে, সেটি হল আমাদের রসনার আনন্দ। যন্ত্রণার পাক হচ্ছে সুস্বাদু ভোজ্য।

পৃথিবীতে মানুষের প্রবেশ পথও ত্রে যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে। মায়ের যন্ত্রণা। গর্ভযন্ত্রণার চেয়ে তীব্র যন্ত্রণা আর কী আছে। অতএব পণ্ডিতের কথাই ঠিক; যৌন যে পথেই আসুন সারা জীবন নজাত পায় সেই। মায়ের আগে মানুষের মুখ থেকে নিষ্কৃতি কোথায়।

এই মুখের পৃথিবীতে হাসতে হবে, হাসতে হবে। প্রশ্ন হল, কী ভাবে? মানুষ কেন হাসবে। জীবনের অসঙ্গতি দেখে হাসবে। মানুষের বোকামি, ভণ্ডামি, অহংকার, ভয়ের পাকপ্রণালি হাসির উপাদান। একজন নিপাতে পড়বে, তাকে দেখে হবে, সেই দেখে আর একজন হাসবে। অসহায় মানুষের অক্ষমতা দেখে যৌবন হাসবে। জীর্ণ অসমর্থতা দেখে তরুণরা হাসবে। কবরে, শ্মশানঘাটে ভেসে যায় জীবন, যৌবন, ধনমান। লোভীর ভুচ্ছ বস্তুর প্রতি লোভ দেখে, নির্লোভ বৈরাগী হাসবে। যৌবনের দম্ভ দেখে প্রবীন হাসবে। অর্থাৎ সত্য, যাকে আমরা মুখ বলি, সেই সত্য এই অসার সংসারের দিকে তাকিয়ে সারাই হেসে চলেছে, নিরন্তর হাসি। সত্যসন্ধী একদিন বলে গিয়েছেন একটি মহাবাক্যের মাধ্যমে যে মুখকে কি মুখর করে/রসনা বিষ্ণু অষ্টাদশ জীবে কি জানিতে পারে/ বিল করে তুলি পাতে বীন প্রবেশ করে তাতে/গজাল্লতের পথ আছে তবু বীন পালাতে মাত্রে/ মানবিকের হাসি বন্ধ থাকল। সবেতেই হাসির উপাদান খুঁজে পাবেন। মুখ কোথাও নেই। মানুষ খেলেও মরবে, না খেলেও মরবে। ট্রামাতে যে আছে সেও মরবে, পর্ণমুটিরে যে আছে সেও মরবে। চিরকাল হেসে যাবে ততকাল। এর মধ্যে একজন জীবন প্রেমিক ঢুকে পড়লে তার আলো বেরিয়ে আসবে, যেমন গালিব। তিনি বললেন বৈরাগিদের মায়াবাদ, বৈতবাদীর অসারত্ব, মুক্তের নির্বাসনে আমার প্রয়োজন নেই। আমার জন্য একগো ভাল সত্য। আমি খুজেছি,

গম-এ হস্তী-কা, অসল, কিস-সে যো খুজ মন্‌ইলাজ,
শমা হর রঙ্গ-মে জলতী হৈ সহর হোনে তক।।

মৃত্যু ছাড়া জীবনযন্ত্রণার আর কী বড়ুধ থাকতে পারে ; কিন্তু আমার জীবনপ্রদীপকে তো জ্বলতেই হবে। কত ভাবে জ্বলা যায়। কখনো উজ্জ্বল, কখনো ঝিমিত, কখনো স্থির, কখনো চঞ্চল। জ্বলতেই হবে সেই ভোর হওয়া পর্যন্ত -শমা হর রঙ্গ-মে জলতী হৈ সহর হোনে তক।

এই জীবনের রহস্য জানলে জীবন নিয়ে গভীর উচ্চাসের রসিকতা করা যায়। রসিকতা করা মানে হাসান নয়। রসিকতার ইংরেজি হল, হিউমর। মানুষ হা হা করে হাসবে না হয়ত কিন্তু মজা পাবে। একটা বড়ো গাওয়ার মজা। নিজেকে সঠিক পটভূমিতে অবিষ্কারের আনন্দ। বুদ্ধিজীবকে যদি জিজ্ঞেস করেছিলেন, বার্তা কী। তা হ বার্তা। চিরকালের সংবাদপত্রে হেডলাইনটা কী হওয়া উচিত। সুন্দর উত্তর বুদ্ধিজীবের ঃ

পৃথিবীর এই মোহময় কড়াতে সূর্যরূপ অগ্নিজ্বালা, নিবারাত্রি রাগ করে
ছারা,
মরণ কড়ুরূপ হাতাখরা ধরিটারা 'কাল' জীবনরসকে পাক করিতেছে,
ইহাই বার্তা।

বক তখন প্রশ্ন করলেন, কিমাশ্চর্যং। বুদ্ধিজীব বললেন। অহরহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্‌, প্রতিদিন জীবকুল মরিতেছে, অথচ অবশিষ্ট সকলে অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, ইহা অপেক্ষা আর কী আশ্চর্য।

আমরা আমরা, বলে যারা চিৎকার করছে, তাদের নিয়ে রসিকতা করা যায়। যারা ভাবছে যৌবনকে চিরকাল ধরে রাখা যায় তারাও হাসির পাত্র। শেকসপিয়ার তাঁর নাটকের অনেক গালমিক কথা নির্বোধের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। তাঁদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। 'আজ ইউ লাইক ইট'-এ আছে, A fool, a fool I met a fool, বলের মধ্যে পাচ্ছে

তলায় সেই মূর্খ বসে আছে। নিশ্চিত নিশ্চেষ্ট। 'সমস্যার মূর্খ।'

লোকটির প্রতিবাদ, 'মূর্খ বলবে না যতক্ষণ না ঈশ্বর আমাকে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করছেন।'

এরপর সে একটা ঘড়ি বের করে দেখছে আর বিড় বিড় করে বলছে : 'দশটা বাজল। জগৎ কী ভাবে চলছে। এক ঘন্টা আগে নটা ছিল। এক ঘন্টা পরে এগারোটা হয়ে যাবে। বিস্ময়কর।' এরপরই তার সেই বিখ্যাত উক্তি। শেক্সপিয়রের ইংরেজিতে না বললে জমবে না।

And so, from hour to hour, we ripe and ripe,
And then, from hour to hour, we rot and rot;
And thereby hangs a tale.

সমস্যাকর্মের প্রতিধ্বনি : অমর শশীকর শশিকর মুকুর, কলঙ্কবিহিন তাহার মুকুতম। সময় ফুরোয় , যৌবন চলেছে জরার দিকে। সব গলে গলে পড়ছে। "একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর সাজাহান/কাল স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।" রবীন্দ্রনাথ থেকে শেক্সপিয়রে ফিরি : পৃথিবীটা রঙ্গমঞ্চ। নরনারী হল অভিনেতা। একদিক দিয়ে ঢুকছে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ভিতরে। একটা মানুষ তার জীবনকালে অনেক ভূমিকায় অভিনয় করে। তার সাতটা দশা। সাত বয়সে সাত অবস্থা। প্রথমে শিশু। ধাত্রীর কোলে ওঁয়া ওঁয়া করা, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা। এরপর স্কুল বালক। বইয়ের ব্যাগ। উজ্জ্বল মুখ। ভোরের আকাশ। শামুকের মতো গুটিগুটি চলেছে স্কুলে। ইচ্ছে নেই, তবু চলেছে। এরপর সে প্রেমিক। হাপরের মতো দীর্ঘশ্বাস। প্রেমিকার বাঁকা ভুরুর আকর্ষণে, করুণ সঙ্গীত। আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি। অতঃপর একজন সৈনিক। জীবনমুখে দাড়ো বাঁশ। মুখে চাপ দাড়ি। মনে অদ্ভুত অদ্ভুত সব শপথ। সম্মান খোঁজা, উদগ্র যেজাজ, কথায় কথায় কলহ, প্রতিষ্ঠা, হাতুড়ি। কামানের মুখে দাঁড়িয়ে স্যাতি ছিনিয়ে আনতেও পিছপা নয়। অবশেষে বিচারক। মস্তবাজের পরিধিতে ভুঁড়ি। জমকাল পোশাক। চোখের নিচে তাকাতে ভয় করবে। পদমর্যাদা অনুযায়ী হাঁটা দাঁড়ি। কথায় কথায় জ্ঞানের ঝলক আর আধুনিক উদাহরণ। আর এইভাবেই তার ভূমিকা পালন। এইবার সে প্রবেশ করছে তার শেষ বয়সে। অকাল, কৃশ দেহ, ঝলমলে প্যাটালুন। নাকের ডগায় চশমা, চোখের ডগায় 'পাউচ'। আমার শশীকর শশিকর মুকুর। কোথায় সেই পুরন্দরী কণ্ঠস্বর। দ্বিতীয় শৈশবে প্রবেশ। ক্ষীণকণ্ঠ, শিশুর গলার মতো কম্পিত, মেয়ের বাঁদরী আসে প্রস্থানে। শেষ দৃশ্যে নায়ক অনায়াসে অবতীর্ণ। শেক্সপিয়রের সেই বিখ্যাত দুটি লাইন -

Is second childishness and mere oblivion/sansteeth, sanseyes,sanstaste, sans everything।। ইংরেজ সমস্যাকর্ম।

সমস্ত জীবন নিয়ে তত্ত্বকথী বহুপ্রকার মজা করতে পারেন। মানুষের দশ দশার যাবতীয় ব্যাখ্যা। যা থাকবে না, থাকে না, তাই নিয়ে মানুষের মাতামাতি। আবার সেই অন্তরীণও রসিকতার লক্ষ্য। যেমন রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তাঁর 'হাস্যকৌতুক'-এ। 'ওরাকল' থেকে সামান্য উদ্ধৃতি। অপেরা মানব একটি চরিত্র বলছে — 'আর এবং আপনারই মধ্যে যে ভেদ, সমস্তমুহূর্তে পূর্বে সেটা একরকম ঠাউরেছিলুম কিন্তু ওরাকলের কথা শুনে বুঝলুম যে পূর্বে কিছুই বুঝিনি এবং তিনি যা বললেন তাও কিছুই বুঝলুম না।'

ডৈলোক্যর পায়, না পায়ক্যর ডৈলো। নৈয়ায়িকদের এই তর্ক নিয়ে অবতারদের রসিকতা। পিপা পিপা মদ খায় উঁড়িয়া। রবীন্দ্রনাথ এদের নিয়ে চুড়ান্ত রসিকতা করে গেছেন। 'কাল কলসী ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ মনে একটা তর্ক এল যে, এত লোক থাকতে ভটচায্যি কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে মারা পড়ল। ভটচায্যি যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে মারা তার অর্থ কী, এবং তার তাৎপর্যই বা কী? এর মধ্যে যদি কোনো রূপক থাকে তবে তাই বা কী? যদি কোনো অর্থ না থাকে তাই বা কেন?' 'বিষয়টা শক্ত বটে। শিরোমণি মশায় আসুন।'

তিনি এলেন। ব্যাপারটা আরো জটিল হল। শিরোমণি বললেন, 'বলো তো, অস্ত্রাঘাতেই বা ভটচায্যির মৃত্যু হল কেন, রক্তপিত্ত রোগেই বা না মরে কেন? রাবণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ হল কেন, ভস্মলোচনের সঙ্গেই বা না হল কেন? অত কথার কাজ কী, ভটচায্যিই বা মরে কেন, রাবণ মরেই বা ক্ষতি কী ছিল?'

কৌতুকের সঙ্গে ক্লেশও আছে। বিশিষ্টি পণ্ডিতরা কিছু না বললে সমস্যার সমাধান হয় কী করে। 'তোমাদের রত্নো সাহেব কী লেখেন? তোমাদের টিভালই বা কী বলেন। হক্সলি সাহেব কী মীমাংসে করেন শুনি'

এরপর শিরোমণি দিলেন ফাইন্যাল সলিউসান : 'নিয়তিং কেন বাধ্যতে। যদি বল নিয়তিকে কে বাধা দিতে পারে — এ কথার অর্থ কী, তবে সরল করে বুঝিয়ে দিই। নিয়তস্যই যদ্যে নিয়তির গুণ এবং নিয়তের গুণই হচ্ছে নিয়তি।,তা যদি হয় তবে নিয়তকালবর্তী যে নিয়তি তাকে পুনশ্চ নিয়ত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এমন দ্বিতীয় নিয়তির সন্ধানের কৃত্য। ফালন কি না , নিত্য তাহা তাহাই নিয়ত এবং তাহাই নিয়ত, অতএব রাবণের সঙ্গেই যে ভটচায্যির যুদ্ধ হবে এ আর বিচিত্র কী।'

সুকুমার রায়ও এই ধরনের রসিকতায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর চলচ্চিত্র চক্রবর্তী স্রেফ উদাহরণ। ঘাটাচায্যির ছেলেরা পুরনো রথ তলের দুটি ঘোড়াই খেয়েছে, মূল এবং সুদ। নিরঞ্জন চক্রবর্তীর মতো তিনিও কথা নিয়ে 'পান' করছেন। কথার খেলা। একটি উদাহরণ : পুরনো রেডিও অফিসের সামনে একজন গায়ক দাঁড়িয়ে আছেন, ঘাটাচায্যি জিজ্ঞেস করছেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে। কী তব ভূমি।'

'আমি গাই।'

'অ, তা নিজে ক'সের যাও।'

ইংরেজিতে একে বলে 'পুইণ'-যার ভো একটু মোটা দাগের, তা হোক। বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তরে' যা করেছেন, তা হল 'সোফাল সাটায়ার'। একটা মূলের যাবতীয় তত্ত্বথিকে খাড়া করা। ফুইনসির, 'অন্তকোলন অফ আন ইংলিশ ওপিয়াম ইটার'-এর কথা মনে পড়ে যায়। জোভোস, জোভোস ক্লাপকার হিউমারও অবিস্মরণীয়। একটি অল্প বইয়ের অনেই অনন্য-'হি কেম টেন এ মোর্ড'। তেমনও ভুলনাহীন। হাসির অন্তে ভাল ভাল সিচ্যুয়েশন তৈরি করতে হয়। শেখক এই ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

মানুষকে হাসতে হবে তাবলেই আমরা ভাঁড়ামি করতে চাই। নাটকে, চলচ্চিত্রে যা দেখি সবই ' স্লাপস্টিক কমেডি'। অল-তলি, হাত পা ভাঙা, ভোতলামি। ভোজবাজিকরা মানুষকে অপদস্থ করে আনন্দ দেওয়া। কিন্তু

টাইপ চরিত্র তৈরি করে হাসাবার চেষ্টা। ভোলা মনের মানুষ, রাগী, খিটখিটে মানুষ, গোঁড়া আদর্শবাদী মানুষ, চালিয়াত, ফেল কাঁপাইন, এই সব হল উপাদান। গোপাল তাঁদের ট্রাডিশন। এই হাসির পরিসর খুব ছোট। পারম্যুটেশান, কম্বিনেশানে একই স্কিমারেশন বারে বারে ফিরে আসে। হিউমরিস্ট, স্যাটায়ারিস্ট সূক্ষ্মে বিচরণ করেন। সেই কারণে তাঁদের জগৎ অনেক বড়, তাঁরা অনেক দূর যেতে পারেন। মুখ দেখার জন্যে আয়না চাই, জগৎ দেখার জন্যে মন চাই। আর সৃষ্টির কারণটা মনেই করে। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বলতেন, যার চোখে যে রঙের চশমা, জগতের রঙ তার চোখে সেই রকম। ঠিক রঙটা কেমন, কে বলবে। তাড়া বেঁধে খুব উঁচুতে একজন রঙের কারবার করছে। নীচে রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে। একজন তাকিয়েই ভাবছে, নির্ঘাত পড়বে। সে হল সিনিক। একজন ভাবছে দেখো ভগবান, কেন পড়ে না যায়। বাড়িতে বউ, ছেলে, মেয়ে আছে, কে দেখবে তাদের এই বাজারে। একজন ভাবছে, যদি পড়ে যায়। তারপর মনে মনে বলছে, পড়বে কেন। এইজন্যেই তো সে অভ্যস্থ। পড়লেই হল। আর কম্পিশটার এদের মানুষ বলবে, পড়ে যেতেই পারে, মরে যেতেই পারে, সে মোরাল। ক্যাটস ইল বি গেম। বিদেশ হলে ইনসিওরেন্স থাকত। ওদেশের ফুটবল প্লেয়ারদের পা ইনসিওরেন্স করা থাকে। স্বামী হঠাৎ মারা গেছে। তা কী হয়েছে, ইনসিওরেন্স তো আছে। আর যৌবন যদি থাকে অবশ্যে একটা কেন, দশটা স্বামী পাওয়া যাবে। এইরকম একটা বৈষয়িক মূল্যে জীবন একটা মস্ত তামাশা। সব তালগোল পাকিয়ে অবশেষে কেন হাসির মহলা চলছে। নেতাতে জনতাতে, শিক্ষকে শিক্ষার্থীতে, ত্যাগীতে ভোগীতে, প্রাচীনে নবীনে, নীতিতে দুর্নীতিতে, বক্তাতে শ্রোতাতে চটকাচটকি ব্যাপার। প্রিয়জন মারা গেছে। চোখ ওকনো। কালো, ডিহাইড্রেশান হয়ে গেছে।

কেন ডিহাইড্রেশান।

ওই যে জল কম খায়।

কেন কম খায়।

জলেই তো যত জীবাণু, তাই লেক চায়ের ওপর আছে।

চা অল্প চলা, চটি আর চাটি এই হল মূল। হাসিও নেই কান্নাও নেই। আছে, বেঁচে থাকা। বাঁচাতে বাঁচাতে মরে যাও। এক দেলা কর্পূরের মতো উবে যাও। জীব জীবনের দিকে তাকিয়ে মহাজীবন হাসছে, হাউ আর ইউ? ও কাঁদিস। ভেতরটা শুকোলে কী হবে, বাইরে ময়েশ্চারাইজার লাগছি। রোদে বেরোচ্ছি, সান স্ক্রিন লোশান মেখে। সব ঠোঁটেই লিপস্টিকের মতো মৃদু হাসি, ভুরুর হাসি, দুঃখের হাসি। সাজান বাগান শুকিয়ে যাওয়ার হাসি। শমা হুর রূপ-মে জলতী হৈ। আমাদের বাইরে হাসি ভেতরে কান্না। কান্নাটাকে হাসির ফ্রেমিং-এ পরিবেশন করতে পারলেই চার্লি চ্যাপলিন। অবিস্মরণীয় একটা কিছু।

▲▲▲

দীঘা সমুদ্র সৈকতে
ক'টা দিন নিরিবিলিতে অবসর যাপনের জন্য
আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি

সেটকো হলিডে হোম

পরিচালনায়

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেটেলমেন্ট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

জীবন পালের বাগান, হুগলি

ফোন। ৮০ - ২৮৩৩

অবসর বিনোদনের জন্য চলে আসুন
পুরীতে

মনোরম পরিবেশে বাথরুম সংলগ্ন
দুই, চার ও ছয় শয্যা-বিশিষ্ট ঘর পাওয়া যায়
সমুদ্র থেকে দু'মিনিটের পথ
(স্বর্গদ্বারের পাশে)

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

কলিকাতা ডক লেবার বোর্ড স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

২০বি, আবদুল হামিদ স্ট্রিট (ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট)
(দ্বিতীয় তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

শারদীয়া ও দীপাবলীর প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই

বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় তাঁতশিল্প উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গে অদ্বিতীয়)

প্রযত্নে : বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ
মাচানতলা, ডাকঘর ও জেলা : বাঁকুড়া (৭২২১০১)

● বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি সারা বছর ন্যায্যমূল্যে উৎকৃষ্টমানের সুতা সরবরাহ করে চলেছে।

ফুড ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-এর পরিচালনায় পুরীর স্বর্গদ্বারে অনন্তশয়ন মন্দিরের সংলগ্ন "সৈকতাবাস" নামক বাড়িতে দুইটি কক্ষ সংরক্ষিত আছে। এই স্থান হইতে সমুদ্র স্নান, সমুদ্র দর্শন ও যাবতীয় কেনা-কাটার বিশেষ সুবিধা। কক্ষ হইতে সমুদ্রের দূরত্ব মাত্র এক মিনিটের হাঁটা পথ।

যোগাযোগ করুন :

ফুড ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

১১/এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৮৭
ফোন নং : ২৪৪-৩৪২১
এক্সটেনশন : ৮৮

With best compliments from

The Burdwan Co-op. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Old Court Compound
Burdwan

Having
Branch Office At :
Seharabazar, Burdwan
&
Sub Office At:
4/5, Udayshankar Bithi
City Centre, Durgapur - 16

প্রবন্ধ

বিজ্ঞানী যোসেফ নীড্‌হাম

ভোলানাথ দত্ত

পৃথিবীতে বহু বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটেছে কিন্তু আমরা সাধারণত খুবই কম বিজ্ঞানীদের স্মৃতিচারণা করে থাকি কেননা তাঁরা তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে হাজির হয়ে পড়েন আর অনেকেই নিজেদের অন্বেষণালয়ের গণ্ডিতে ওটিয়ে রাখেন। বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়ে গেছে মনে হয়, অনেকটা মনে হতে পারে অবতারদের আবির্ভাবের মত। আসল ব্যাপারটা হল মানুষ হিসাবে জন্ম আগে তারপর মেধা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা বিজ্ঞানী হওয়া।

আজ বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তি কথাটা এসে পড়ছে। বিজ্ঞান প্রযুক্তির মধ্য দিয়েই সমাজে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুরূপে আসে এবং মানুষের কল্যাণে লাগে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি মানুষ বা সমাজ নিরপেক্ষ না কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমাজ বা মানুষের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটছে। এর উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের অন্তর্গতি ঘটে মানুষের যৌথ কার্যকলাপ ও প্রচেষ্টার ভেতর দিয়েসেখানে ব্যক্তি মানুষের একক সার্থক ভূমিকার গুরুত্বও অপরিসীম কেননা সমাজ অগ্রগতি ও বিকাশের নিয়মগুলি ব্যক্তি মানুষ বোঝে এবং বস্তুর পরিস্থিতি আর্থসামাজিক সম্পর্ক সমূহ ব্যাখ্যা করে যেমনে নীড্‌হাম হলেন এমনি একজন সমাজ বিজ্ঞানী ও মানবিক যিনি সাধারণ মানুষের খুবই কাছে এসেছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বিজ্ঞানীদের অতীতে স্বাধীনতা থাকলেও বর্তমানে বিজ্ঞানীরা পণ্য সামগ্রী অর্থাৎ পুঁজির অধীনে কাজকর্ম করে থাকেন।

লেনিন বলেছিলেন বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে সমাজের ঘটনাবলীতে একীভূত হয়ে পড়ছে এবং সমাজের সর্বস্তরের সমস্ত কার্যাবলীর অংশ হয়ে পড়ছে। কার্ল মার্কস বিজ্ঞান ও উৎপাদন সম্পর্ক নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণাকে মুখ্য চালিকা শক্তি হিসাবে স্থির করে গেছেন। এঙ্গেলস তাঁর Dilectics of Nature গ্রন্থে বলেছেন হাতের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে বাধ্য করা যায় এবং প্রকৃতির ঘটনাবলী ও তার বৈচিত্র্য সমূহের মধ্যে অধিক বস্তুবান বিরাজমান। বস্তুবাদী বিজ্ঞানীরা তাই প্রকৃতিকে অধিক বস্তুবাদের নিরিখে ব্যাখ্যা করেছেন আর ফলে বহু মূল্যবান জিনিস সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সীমানায় বন্দি হয়েছে। মানুষ আগে প্রকৃতিকে রহস্যময়ী হিসাবে ভাবতো, এখন মানুষ ক্রমে ক্রমে মূর্তি ও বস্তুর অভিজ্ঞতার দ্বারা বহু রহস্যের ব্যাখ্যা পেয়েছেন তাই প্রকৃতি প্রায়ই মানুষের করায়ত্ত।

পৃথিবীতে যুক্তিবাদী ও বাস্তববাদী বিজ্ঞানী হিসাবে যাঁরা আজও চিহ্নিত এবং মার্কসীয় দর্শন দিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক্‌ ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টার ব্রতী ছিলেন তাঁরা হলেন জে বি এস হলডেন। জে বি এস হলডেন, লেভী, আর হলডেন ও যোসেফ নীডহ্যাম।

জে বি এস হলডেন যেমন ভারতে এসে এদেশের বিজ্ঞান জগতে উজ্জ্বল মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছিলেন এবং এই দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনকে এদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত করেছিলেন তেমনি অন্যতম যোসেফ নীডহ্যাম চিনদেশকে নিজের অন্যতম কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই দেশে কাটিয়ে গেছেন। ১৯৪২ সালে তিনি চিনে যান এবং চিন সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত নীতি নির্ধারণের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের অবসানের পরে জাতিসংঘ গঠনে তিনি মুখ্য ভূমিকা নেন এবং জাতি সংঘের শিক্ষা কৃষ্টি সংস্থার নামের সাথে বিজ্ঞানকে সংযুক্ত করে "ইউনেসকো" গঠন করেন। ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময়ে যে সাতজন বিদেশি বিজ্ঞানী আমেরিকার জীবাণুযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিলেন যোসেফ নীডহ্যাম তাদের মধ্যে অন্যতম। এর জন্য তাঁকে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিদ্রূপভাজন হতে হয় এবং তাঁদের কাছে নীড্‌হামের কথা কমে যায়।

চিনদেশের সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে তাত্ত্বিকের হিসাবে নীডহ্যাম একজন সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব। ১৪ খণ্ডে চিনের বিজ্ঞান ও সভ্যতা (Science and civilization in China) লিখে গেছেন। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এশিয়ানের অবদান সম্পর্কে তিনিই উপলব্ধি যোগ্য করে গেছেন বলে পশ্চিম ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা তার প্রতি ক্ষুব্ধ। এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ভারত সম্পর্কে চিন্তা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে মার্কসপ্রসারের ঘনিষ্ঠতা যেমন হেগেলি নীডহ্যাম হলেন চিনের ক্ষেত্রে। নীডহ্যাম চিন ভাষা রপ্ত করেছিলেন এবং চিনা সমাজের তৃণমূলে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবরণসমূহ নিরীক্ষণ ও অনুধাবন করেছিলেন। প্রাচ্যের বিজ্ঞানের ইতিহাস আধুনিক নামী বিজ্ঞানী বা বৈজ্ঞানিক কাজের দ্বারা সমৃদ্ধ না হলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ইতিহাস রচনায় অপারগতের নয়। উল্লেখ্য বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান যুগেও আমরা নিওলিথিক যুগের যাঁতা পাথর প্রযুক্তি এখনও ব্যবহার করে থাকি।

মানবিক হিসাবে নীডহ্যামের স্বীকৃতি বিতর্কিত। দুই ধরনের মানবিক সাধারণভাবে স্বীকৃত। প্রথম পর্যায়ে হল গ্রীক্‌ চিন্তাবিদ্‌ হিসাবে যারা পণ্য, যেমন প্লেটো, আরিস্টটল, ডিমক্রিটাস, হিরোডোটাস, হোমের, মার্কস বা পাশ্চাত্য দেশের অনুরূপ ব্যক্তিত্ব আর প্রাচ্যের মধ্যে বিশেষত ভারতের কপিল, পতঞ্জলি,

কলম, নৌতম, জয়ধিনিস, মুহু, মাসার্মুস, শত্রু, হ্রাসমুহ, এই আরবিক প্রমুখ। অপর পর্যায়ে আছেন তাত্ত্বিক বলবিদ্যারা যারা প্রতিষ্ঠানে বসে শিক্ষা দিয়ে থাকেন ও কর্মীদের ব্যাখ্যা, আলোচনা ও তত্ত্বধারা সমৃদ্ধ করে থাকেন। ধর্ম সম্পর্কে নীডহামের পূর্বক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় তখন জনমানসে বিজ্ঞান সম্পর্কে বিরূপতা সৃষ্টি হয়। ধর্মের উপর যে বিজ্ঞানীর স্পর্শকাতরতা লক্ষ্য করা গেছে, যুগ যুগ ধরে পরিপার্শ্বিকতা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা অনেকেরই হয়নি যদিও বোলেক নীডহাম ধর্ম সম্পর্কে তার এক দৃষ্টিভঙ্গি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন বলে যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির তাকধারা আঘাত পেয়েছে। তাঁর প্রধান বিবেচনা ছিল নৈতিকতাবোধ যেটা সব ধরনের অভিজ্ঞতার অতীত, এ এন হোয়াইট হেডের প্রভাবে 'জৈব গঠন দর্শনে' তাঁর বিশ্বাস ছিল। সর্বস্তরের জটিলতা ও গঠনতন্ত্রের মূলগত অনুসন্ধান ছিল জীবকুলের নিয়মানুবর্তিতা অর্থহীন। ধর্মকে নৃতত্ত্বের অতিত্ব হিসাবে ধরা রেখে নীডহাম সার্বজনীন ধর্মীয় পূজার জন্য নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে চলেছিলেন তার প্রতি তার অবজ্ঞা ছিল। মানবমনের আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তাকধারা তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এশিয়ার মানুষের কাছে তাঁর ঋণের কারণ এই তত্ত্বে যে তিনি বলেছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এশিয়ার দান কম নয় বিশেষ করে চিন সভ্যতার। ইউরোপীয়দের একটা ভ্রান্তিগত গর্ব ছিল যে বিজ্ঞানের প্রসূতিকের হল ইউরোপ কিন্তু তথ্য ও ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে দু'হাজার বছর আগেই চিন সভ্যতার বিকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্মেষের ফলে ঘটেছিল।

নীডহামের তাকধারায় উৎসাহিত হয়ে দেবেন্দ্র লাহা, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আবদুল রহিম প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর ব্রিটেনে বোলেক টেরেন্স মন্টাগোবারীর নীডহামের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম বোলেক নীডহাম তিনি প্রখ্যাত আইনজীবিক্ট ছিলেন এবং মা আলিসিয়া অ্যাডিলেট মন্টাগোবারী ছিলেন শিক্ষানবেষক ও সুরকার। নীডহাম নর্থাম্পটনশায়ারের আইওল স্কুলে লেখা পড়া শুরু করেন এবং পরবর্তী সময়ে কীস্ কলেজে ভর্তি হন। ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করলেও তিনি ডাক্তার হননি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়নের উপর তিনি গবেষণা করেন। ১৯২৪ সালে জৈব রসায়নের তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ঐ বছরই নীডহাম আর এক জৈব রসায়নবিদ ডরোথী মেরী মরেলকে বিয়ে করেন। নীডহাম ও তাঁর পত্নী আধুনিক জীবন বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ স্যার ফ্রেডরিক গোল্যান্ড হপকিন্সের চির ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন। নীডহামের প্রথম গবেষণা ছিল দেহের মধ্যে সাইটোক্রোমের রাসায়নিক পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। এই কাজের মধ্য দিয়ে তিনি ভ্রূণের বিকাশের জৈব রসায়নের বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তিনি ১৯৩১ সালে তিন খণ্ডে Chemical Embryology বই প্রকাশ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি Biochemistry and Morphogenesis বই লেখেন। ১৯৩৭ সালে ডেভিড গ্রীনের সঙ্গে নীডহাম Perspectives in Biochemistsy বই লেখেন যাতে হপকিন্সের উল্লেখ আছে।

বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব নীডহামের উপর বিশেষভাবে পড়েছিল এবং ভুল জীবন থেকেই শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তার এক আন্তরিক যোগ সূচিত হয় যা পরবর্তীকালে কর্মবিধ ঘটনাবলীতে প্রকাশ পায়।

১৯৩১ সালে ব্রিটেনে বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় এবং সেই সম্মেলনে সোভিয়েত বিজ্ঞানী বোরিস হেসেনের মূল্যবান ভাষণ শুনে নীডহাম মুগ্ধ হন। পরবর্তী সময়ে সেই ভাষণটিকে গ্রন্থিত করে Science at the cross Roads গ্রন্থটি সংকলন করেন। তিনি রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় যুক্ত হয়ে পড়েন এবং লেবার পার্টির টাউন শাখার অংশগ্রহণ করেন। বার্লিনের Association of Scientific Workers সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।

সেন সি চ্যাং, তাজাই ইলাই এবং লু মুই ফেন — এই তিন চিন বিজ্ঞানী ব্রিটেনে এসে নীডহামের সঙ্গে পরিচয় হয়, আলোচনার মধ্য দিয়ে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং চিন দেশের প্রতি নীডহামের ভালোবাসা হয়।

ভারতের এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৬২ সালে তাকে তার কাজের স্বীকৃতি হিসাবে উইলিয়াম জোনস্ মেমোরিয়াল পদক প্রদান করেন।

নীডহাম মনে করতেন প্রকৃত ধর্ম আর প্রকৃত সমাজতন্ত্র একই জিনিস তাই ধর্মের প্রতি তার স্পর্শকাতরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাই নীডহামের কাছে বিজ্ঞান ও ধর্ম কোন বিরোধের বিষয় ছিল না।

তথু অসাধারণ মনের পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদই ছিলেন না নীডহাম, তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে ছিলেন একজন মহৎ উদার মানুষ। ২৩শে মার্চ ১৯৯৫-তে তিনি প্রয়াত হন। তাঁর প্রয়াণে একই সঙ্গে আমরা ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক, বৈজ্ঞানিক, গবেষক, সমাজবিদ এবং সর্বোপরি মানব দরদী এক মানুষকে হারিয়েছি। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদিত হল।

▲▲▲

"শোনরে মাণিক, শোনরে মজুতদার।
তোদের প্রসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড় —
হিসাব দিবি তার?"

□ সুকান্ত ভট্টাচার্য

জন্ম : ১৬ আগস্ট, ১৯২৬ □ মৃত্যু : ১২ মে ১৯৪৭

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে চরণ তোমার বাজে
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।।"

□ গীতাঞ্জলী — রবীন্দ্রনাথ

ক্রীড়াঙ্গন

এক গণ্ডা মজার ক্রিকেট

শ্যামসুন্দর ঘোষ

মজা খেলায়, খেলার মজা। কোন খেলার জন্য, আমার কোন খেলা নেই। স্পোর্টস কুইজের আসরে যদি প্রশ্ন করা হয় কোন্ খেলাতে মজা নেই। তাহলে সমস্বরে সবাই বলে উঠবে ক্রিকেট। ক্রিকেট। ক্রিকেট।

কোন সন্দেহ নেই ক্রিকেটে যত মজার ঘটনা আছে। অন্য খেলার সে মজার ঘটনা নেই তা নয়। তবে, ক্রিকেটের মত মজার ঘটনা কিন্তু অন্য কোন জনপ্রিয় খেলায় নেই। আসল কথা হল, ক্রিকেটের মজার ঘটনাকে অনেকক্ষণ উপভোগ করা যায়।

আবার বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে। এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসরের দায়িত্ব ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে গ্রহণ করবে।

বিগত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অন্য না মজার ঘটনা ঘটে গেছে। এই মজার কাণ্ড ঘটার কারণ বিশ্বকাপের নতুন আইনের সঙ্গে ক্রিকেটাররা তেমন সড়গড় না হয়েই খেলার অঙ্গে নিয়ে থাকেন।

আচ্ছা একি অঘটন। খেলার ফলাফল দেখে শুনে অনেক ক্রীড়া সাংবাদিক বন্ধুদেরও চোখ বড় হয়ে যায়। আমার অন্যান্য সাংবাদিক বন্ধুদের মত আমিও যে কম অবাক হয়েছি তা কিন্তু নয়।

জানি, আমার কথা শুনে আমার পাঠকরাও মুচকি মুচকি হাসছেন। দাঁড়ান! এত হাসাহাসি বা কী আছে। ধরুন আপনি যদি দেখেন ভারতীয় কোন বোলার দিনের শেষে খেলার এক উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে শেষ দুই ওভার বল করে দুটি মেডেন নিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসেন তাহলে একজন ক্রিকেট অনুরাগী হিসাবে আপনি ঐ সময় কী করবেন? নিশ্চয় নিজের সিটটি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন।

মজার ঘটনাটিতো এইখানেই। ঐ বিশ্বকাপের নতুন আইনটি বোলারের জানা ছিল না বলেইতো ঘটনাটি মজার হয়ে উঠেছিল।

হয়তো মনে মনে ভাবছেন এমন কোন বোলার কি নতুন আইনটি জানেন না। না, বোলারকে আন্তর্জাতীয় কার্টসোড়ার দাঁড় করানোর চেষ্টা করবেন না। বোলারই শুধু নয়, আইনটি দলের কোন ক্রিকেটারেরই জানা ছিল না। কোন ক্রিকেটারের আইনটি জানা থাকলে তো বিশ্বকাপে এমন মজার কাণ্ডই ঘটত না।

বোলারটির নাম? কপিল দেব। ঐ খেলাটি বৃষ্টির জন্য প্রায় তিন ওভারের মত খেলা হয়নি। তাই নতুন আইন অনুযায়ী ঐ দিন ওভারের পর রানের উপর খেলাটির ভাগ্য ঝুলে ছিল। কপিল দেব যদি যেমন ওভারের পরিবর্তে দুটি ওভারে পড়ে দুটি মেডেনও রান দিতেন তাহলে তাহলে তার হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যেত না। সেই খেলার ভাগ্যকে শেষ পর্যন্ত এক রানে ঝুলতে হয়েছিল।

এমনই আরেকটি মজার ঘটনা ঘটেছিল হায়দ্রাবাদে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে। এই খেলাটিতে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছিল কোন দলের কম উইকেটের পতন হয়েছে তাই দিয়ে।

কী? ঘটনা লাগছে। কম উইকেট হারিয়ে প্রতিপক্ষের চেয়ে যদি কম রান হয় তা হলে কী সেই দলকে জয়ী বলে ঘোষণা করা হবে? তা কিন্তু মোটেই নয়। শেষ পর্যন্ত খেলাটি যদি টাই হয়, সেই ক্ষেত্রেই একমাত্র ঐ আইন প্রয়োগ হতে পারে।

এখানেই মজার। আইনটি ভাল করেই জানা ছিল পাকিস্তানের ব্যাটসম্যান ওয়াসিমের। পাকিস্তান কম উইকেট হারিয়ে ভারতের রানটি প্রায় ধরে ফেলেছে। শেষ বলে জয়ের জন্য প্রয়োজন দুটি রানের আর ম্যাচ টাইয়ের জন্য এক রানের প্রয়োজন, ওয়াসিম প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কিংকর্তব্য পরিচয় দিলেন। দু রানের ঝুঁকি না নিয়ে এক রান করে ম্যাচটিকে টাই করলেন। আর আইনে স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচটিই পাকিস্তানের অনুকূলে গেল।

জানি না, আসন্ন বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য এবার আবার নতুন কোন আইন হবে কিনা।

ক্রিকেটের প্রায় এইরকমই এক মজার ঘটনার সঙ্গে আমিও প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলাম। তবে দূর, বিশ্বকাপে নয়, কলকাতার অন্যান্য একটি ক্রিকেট ম্যাচে।

আমি তখন স্টার স্পোর্টিং-এ ক্রিকেট খেলি। সবে মাত্র স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছি। খেলাটি ছিল সালকিয়ার সঙ্গে ওদের মাঠেই। সৌমেন নামে আমার এক বন্ধু ছিল। সেও আমাদের ক্লাবে খেলে। স্যাট ও বল দুটিই করতে পারে। তবে, ঐ খেলায় ওর নাম ছিল অতিরিক্ত খেলোয়াড়ের তালিকায়। সৌমেন স্পীন চালাক ও ডানহিটে ছেলে।

কোন কারণ নেই, দুম করে হঠাৎ বলে বসলো, আরে, অতো ভাবছিস কেন? পাঁচ-ছয় রানের দরকার হলে আমিই ব্যবস্থা করে দেব।

আমি আর আমার অন্য বন্ধুরা তো ওর কথা শুনে সকলেই অবাক। ঐ ম্যাচে আম্পায়ার ছিলেন গোপাল মুখার্জি। স্টীফেন কন্যা। আমরা সবাই ভাবছি হয়তো ছোর বোর্ডের দায়িত্বে থাকবে, তখন কোন চুপিসারে রান বাড়িয়ে নেবে।

আমাদের ভাবনার দৌড়টি ঐ পর্যন্তই ছিল। ভাবনার দৌড়ে অন্যদের চেয়ে সৌমেন অনেক দূরে এগিয়ে ছিল।

সালকিয়ার ২১২ রানে ইনিংস শেষ হয়ে যায়। আমাদের জয়ের জন্য শেষ ওভারে ছয় রানের প্রয়োজন। হঠাৎ সৌমেনের চিৎকার, সাবধানে পা বাড়িয়ে যেতে এক রান নে। হঠাৎ দেখা গেল একটি অ্যালসেশিয়ান কুকুর মাঠে ঢুকে কলটি মুখে নিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। কুকুরের দৌড় আর আম্পায়ারকে উদ্দেশ্য করে 'লস্ট বল', 'লস্ট বল' বলে সৌমেনের চিৎকার। ক্রিকেটের আইনে লস্ট বলে ৬ রান যোগ হয় সৌমেনের জানা ছিল। সৌমেনের এই চালাকিতেই

সেইদিন আমরা জিতেছিলাম। ক্রিকেটের আইনের ২০ ধারায় এটির উল্লেখ রয়েছে।

ক্রিকেটে আর একটি মজার ঘটনারও সাক্ষী ছিলাম আমি। মজার ঘটনাটি ঘটেছিল ক্রিকেটের শহর বোম্বেতে।

বোম্বেতে গিয়েছিলাম বিশেষ একটি কাজে। ক্রিকেটের এই শহরে আমার ভায়ে থাকে। আমি যে ক্রিকেট খেলি তা ও জানে। আমার ভায়েও ক্রিকেট খেলে ও ক্রিকেটের উপর অনুরাগটাই ওর বেশি।

বোম্বেতে এসেই ভায়ে বেশ ক্রিকেট খেলে দেখব না তা হতেই পারে না। তাই রুল রোডের পার্শের মাঠে গিয়ে হাজির হলাম। হঠাৎ সেই খেলার আম্পায়ার অসুস্থ হয়ে মাঠ ছেড়ে চলে গেল। আম্পায়ারের জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। আগেই বলেছি, আমি ক্রিকেট খেলি আমার ভায়ের জানা ছিল। ও আমার কাছে দৌড়ে এসে আমাকেই ঐ ম্যাচটিতে আম্পায়ার হওয়ার অনুরোধ করল। আমিও ভায়ের কথা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে পারলাম না।

অগত্যা আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করতেই হল। হঠাৎ একটি বল আমার ভায়ের প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানের প্যাডে ঢুকে যায়, আর আমার ভায়ের দলের ফিল্ডাররা ঐ বলটি শেষ পর্যন্ত ভালু করলেও আমি ওদের আউটের আবেদন মানুক করে দি।

এরপর আমার ভায়ের দলের ব্যাটিং-এর সময় ওদের একজনের ব্যাটসম্যানের প্যাডে বল ঢুকে যায়, বলটি উইকেটরক্ষক ক্যাচ নেয়। আমি আউট দিলে আমার ভায়ে খুব মনক্ষুণ্ণ হয়।

ক্রিকেটের ২০ ধারায় স্পষ্ট কী লেখা আছে আলাদা করে বুঝিয়ে দিলেও ভায়ের অভিমান ভাঙাতে পারিনি। অবশ্য ম্যাচটিতে যে আমার ভায়ের দল হেরে গিয়েছিল।

খুব মজা লাগছে, তাই না। দুটি ক্ষেত্রেই বল ব্যাটসম্যানের প্যাডে ফিল্ডার ক্যাচ ধরার নট আউট। উইকেট কীপার ক্যাচ ধরলে আউট।

খেলার রাজা ক্রিকেট। মজার খেলা ক্রিকেট। মজার মজার ঘটনার মেড়া ক্রিকেট। ▲▲▲

"বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয়, একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না।"

(বিজ্ঞানের সাহিত্য : জগদীশচন্দ্র বসু)

অবসর বিনোদনের জন্য

আমাদের আরামদায়ক দীঘা ✪ রাজগীর ✪ দার্জিলিং ✪ পুরী

হলিডে হোমগুলিতে জানাই সাদর আমন্ত্রণ

বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন :

ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

৪৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৩

ফোন : ২৭-১২১২

এক্সটেনশন : ৪০/৪৬

বুকিংয়ের দিন : সোম/বুধ/শুক্রবার

বুকিংয়ের সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা।

❀ ❀ ❀

শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন

❀ ❀ ❀

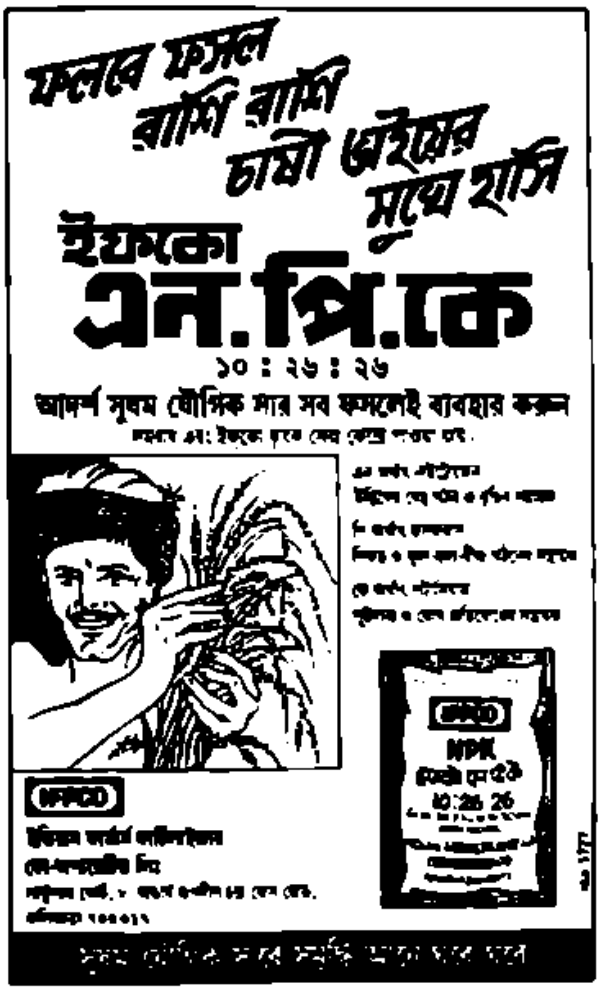

Creating a majestic symphony in steel
CENTRAL MARKETING ORGANISATION
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
Building industry through trust
TCP/SAIL /94

রসরচনা

আমার কাণ্ডজ্ঞান

তারাপদ রায়

সবারই কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, আমারও নেই।

মূর্খের মতন অনেক অসমুল্য মিনতলি ইয়ার্কি দিয়ে ফেলে আমার। কি কুক্ষণে যে রসিকতার ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছিল তখনও ওকে ঝাঁকি দিয়ে ঠেলে দিতে পারি নি, সে আমাকে আরো জড়িয়ে ধরে।

মনে হচ্ছে, আর পরিত্রাণ নেই। এ ভূতের হাত থেকে এ জন্মে আর পরিত্রাণ পাব না, কোনদিন আমার কাণ্ডজ্ঞান হবে না।

রসিকতার মহত্ত্ব সম্পর্কে কত বড় বড় কথাই যে এ যাবৎ শুনেছি। সেই এক দার্শনিক বলেছিলেন 'যার রসবোধ নেই, সে মানুষই নয়। মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের পার্থক্য এইখানে যে, জানোয়ার রসিকতা করতে জানে না।'

দার্শনিক মহোদয়ের এই আপ্তবাক্য অবশ্য আমার কাছে সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নয়। সুরসিক দু-একটি কুকুর, বাঁদর, ওওক এমনকি কুকুর বিড়ালের কথা আমরা জানি, ছোট কুকুর ছানার লেজ টেনে দিয়ে টেনে পালিয়ে যায় এমন দরদিল কাণ্ড অনেক দেখেছি। জীবজন্তুর রসিকতা বিষয়ে কথা বাড়ানোর মত কাণ্ডজ্ঞান আমার নেই, আমি আপাতত রসিকতার স্বভাবচরিত্র নিয়ে সামান্য দু-একটা কথা নিবেদন করতে চাই।

রসিকতা ও হাসির গল্পের স্বভাব লক্ষণ হল এই যে, এইসব গল্পগুলো মহাকালের ধূমকেতুর মতো অনেকদিন পরপর ঘুরে ফিরে আসে। কিছুদিন ধরে কোন একটা রসিকতা বৃত্তাকারের ঘুরপাক খায় হাটে-বাজারে, অফিস-কাছারিতে, ট্রামে-বাসে-এগুলো লোকমুখে চলতে চলতে তারপর একদিন হারিয়ে যায়। কেউ আর মনে রাখে না। অনেকে একটা হাসির গল্প আজ হয়তো শুনলো, তারপর তারা সেই গল্পটা কাল অন্যদের বললো। তারপর সেই অন্যরা পরশু দিন আরো অন্যদের বললো। সবাই খুব হাসাহাসি করলো, তারপর ব্যাপারটি একদিন ভুলে গেল।

যদি কেউ অনেক দিন বেঁচে থাকে, যদি তার কাণ্ডজ্ঞান প্রখর হয় সে হয়তো দেখবে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরে সেই গল্পটা আবার ঘুরে এসেছে। লোকের মুখে মুখে ঘুরছে। সেই গল্প লোকেরা বলছে, লোকেরা শুনছে। শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

তিন চার দশক আগের কোনো বিলিতি ম্যাগাজিন খুলি খুলি — এমনকি আমাদের পুরনো ইয়ার্নাং বা অচলপত্র বিশ্বার সংকলনে অবিকল অবয়ব একখানা সবচেয়ে বাজার চালু গল্প সেইখানে ছাপা হয়েছে। এমন কি আমার এই অপাঠ্য রচনাতেও হয়তো পাঠকরা খুঁজে পাবেন সে সব সরল আখ্যান।

একটা রসিকতার পরমায়ু পাঁচ-ছয় মাস, বড়জোর এক বছর। হয়তো নিউইয়র্কে সেটা শোনা গেল যেদিন তার তিন দিনের মাথায় সেটা উড়ে এল লন্ডনে। সেখান থেকে অন্য আখ্যায় অন্য ভাষায় পৌঁছলো দিল্লি, দিল্লি থেকে কলকাতায়, এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে সেই রসিকতা হনুমান হয়ে যাওয়া গাঁয়ের পাতার মতো উড়ে গেল মহাকালের হাওয়ায়। কিন্তু একদিন সেই রসিকতা আবার ফোঁপরা ফুরিয়ে গেলো সমুদ্রতা, হরিণ আতা, ঘরে ঘরে চরকার আসরে, বয়স লাইব্রেরির আলো ফোটা পরা উঠিলেরা, সলা আহ্লাদ পরা, সলা মুখোশে নাক ঢাকা, সলা চিকিৎসকমূল সকলেই আবার অবসরে বলতে লাগলেন, শুনেছেন। সেদিন ভারতমাতা জরতারা হোটেলে।

ভারতমাতা জরতারা হোটেলের গল্পটা মর্মান্তিক হাসির গল্প। বিস্তারিত বলা প্রয়োজন।

এক ভদ্রলোক ভারতমাতা জরতারা হোটেলে খেতে গিয়েছেন। জরতারা হোটেলের স্পেশাল হলো পাঁঠার মাংস। সেদিন বাসা থেকে খেয়ে তাঁর হোটেলে খেতে খেতে রাত সাড়ে দশটা হয়ে যায়, পিত্তে পিত্তি টেবিলে বসে ভদ্রলোক বেয়ারাকে বলেন, 'ভাত মাংস'।

বেয়ারা পুরনো খদ্দেরকে দুঃখিত করতে চায়নি, তবু বাধ্য হয়ে বললো, 'স্যার, মাংস ফুরিয়ে গেছে।'

এই কথা শুনে ভদ্রলোক উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বেয়ারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বললো, 'স্যার উঠবেন না, আমি দেখছি কি করা যায়। একটু চেষ্টা করে দেখছি।'

এই বলে বেয়ারা হোটেলের রান্নাঘরের দিকে গেল। রান্নাঘরে মরজার কাছেই ওয়েছিল একটা কুকুর। অন্যমনস্কভাবে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে বেয়ারাটি কুকুরের পা মাড়িয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা চিৎকার করে কেঁউ কেঁউ করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেলো।

এদিকে হয়েছে কি শহরের মেয়র মহোদয় আদেশ জারী করেছেন যে তাঁর শহরে পাঁঠার মাংসের বদলে যাবেলাই কুকুরের মাংস চালানো হবে। মেয়র সাহেবের ওই উক্তি পল্লবিত হয়ে প্রতিদিন কাগজে কাগজে বেরোচ্ছে।

সুতরাং কুকুরের আর্তনাদ শোনামাত্র ভদ্রলোক বুঝলেন এখনই তাকে মাংস মেয়র জন্য একটা কুকুর কাটা হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোজনালয় থেকে তিনি পলায়ন করলেন। কিছুক্ষণ পর বেয়ারা মাংসের ডেকচিটার তলা কুড়ানো অল্পেক টুকরো হাড়, চর্বিসমেত একটু শুকনো ঝোল একটা প্লেটে নিয়ে এসে দেখে মাননীয় খদ্দের উধাও।

এই গল্প এখন কলকাতা শহরের বাজারে চলছে। কিন্তু তিরিশ বছর আগেও আরেকবার এ গল্প লোকমুখে ফিরেছে। তারও বহু আগে লন্ডনের স্ট্রান্ড ম্যাগাজিনে এ গল্প ছাপা হয়েছিল। আরো পিছিয়ে গেলে হয়তো নরসিংদিনে অথবা মার্ক টোয়েনে এ গল্প পাওয়া যেতে পারে।

অতঃপর রসিকতার বিপজ্জনক দিকটি বলি। এটাও কাণ্ডজ্ঞানেরই ব্যাপার। আমাদের এক বন্ধুর মতো মজার গল্প দুতারতে কখনো আইকে বলতে শুনিনি। আমাদের চেনাজানা সব হাসির গল্প তাঁর নিজস্ব অনুভবশীল ভাষণভঙ্গিতে অনবদ্য হয়ে ওঠে। এই বহু বছর আগে

একবার হুলিকলা বিষয়ে এই ভয়ানক গল্পটি বলেছিলেন।

তিনি একটি সরকারি অফিসে কাজ করতেন। সেই অফিসের এক বড়বাবুর বদ অভ্যাস ছিল হুলির গল্প বলা। তিনি যে খুব ভালো হুলিকলা করতে পারতেন তা নয়। কিন্তু প্রতিদিন দুপুরে টিফিনের সময় জমিয়ে আড্ডাটা বা আরও বেশি সময়, টিফিনের সময় অতিক্রান্ত করে তিনি তার যোগাভ্যাস অনুযায়ী হুলির গল্প সবাইকে শোনাতেন। যারা শুনতেন তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর অধস্তন কর্মচারী, তারা বিরক্তিই বোধ করতেন, তাদের এসব গল্প শুনে, কোন কোন গল্প বারবার শুনে মর্মান্তিক হতেন। আমাদের বন্ধুটি কোনোরকম অসুবিধা নিজেও বড়বাবুর এই আড্ডায় নিয়মিত যোগ দিতেন। এই সময় অফিসের নিয়মানুযায়ী এই সুরসিক বড়বাবুর দপ্তর থেকে আমাদের বন্ধু অন্য দপ্তরে কাজে চলে যেতেন। সবাই করে নিরেছিল সম্ভবত তিনি অন্যত্রও এই মজাদার আড্ডায় আসবেন না। কিন্তু পুরনো জায়গায় অসুখেই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক পক্ষের দিন বেলা দুটোয় টিফিন হওয়া মাত্র তিনি পাঁচতলায় তার নতুন শাখা থেকে নেমে চারতলায় পুরনো শাখায় এলেন।

আর বড়বাবু কেন জমিয়ে বসেছেন। গতকাল সন্ধ্যাতেই তিনি বাড়ি ফেরার পথে একটা ইংরেজি পকেট বুক কুইনসের দোকান থেকে দশ টাকা দিয়ে কিনেছেন। আজ তার মনে মনে হুলিকলার বড় বড় বুদবুদ উঠছে। টিফিনের সময় সেই সব রঙিন বুদবুদ একটার পর একটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন তিনি, অনুগত শ্রোতারা হাততালি দিয়ে হো হো করে হাসতে লাগলেন।

কিন্তু আমাদের বন্ধুটি নির্বিকার। ভাবলেশহীন গম্ভীর মুখে একটার পর একটা হুলির গল্প শুনে চলেন তিনি। সকলেরই নজরে পড়লো, বিশেষ করে হুলিক বড়বাবুর। তিনি অবশেষে রেগে হুলেই চেয়ে করলেন, কি হলো, ব্যাপার কি? ভোবরা হলোটা কি: এই রকম সব মজার গল্প একবারও হাসছে না!

ঠিক গম্ভীরতর স্বরে বন্ধুবর উত্তর দিলেন যারা হাসবার তারা হাসছে। আমি হাসবো কেন: আমি তো এখন আর আপনার দপ্তরে কাজ করি না।

যে কোন কাজের সম্পর্ক লোকের এই গল্পের মর্মার্থটি মনে রাখা উচিত। ▲▲▲

"বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গালায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্য কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।" — রবীন্দ্রনাথ

সি আই ডব্লিউ টি সি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

৪নং কেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা - ৭০০ ০০১

আমাদের আতিথেয়তায় শান্তিনিকেতনে ও পুরীতে বেড়িয়ে আসুন হুলিভে হোম : 'আনন্দমেলা'

শান্তিনিকেতন : ৪ শয্যা বিশিষ্ট ২ খানি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘর (রান্নার সুব্যবস্থা আছে)।
৩ শয্যা বিশিষ্ট ৩ খানি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘর (রান্নার সুব্যবস্থা আছে)।
২৫ শয্যা বিশিষ্ট একটি ডরমিটরি (রান্না করিবার স্থান আছে)।

স্কুল ছাত্রছাত্রীদের কনসেশনের ব্যবস্থা আছে।
স্থান : শান্তিনিকেতন, শ্যামবাটী, পোয়ালপাড়া রাস্তার ধারে (ডিয়ার পার্কের নিকট)

পুরী : ভিক্টোরিয়া ক্লাব হাউস হোটেলের পাশে আমাদের 'আনন্দমেলা' হুলিভে হোম আছে।
১টি ঘর আছে : ৬ শয্যা বিশিষ্ট ৫ খানি ঘর আছে।
৩ শয্যা বিশিষ্ট ৩ খানি ঘর আছে।
৪ শয্যা বিশিষ্ট একটি ঘর আছে।

যোগাযোগ কেন্দ্র :

সি আই ডব্লিউ টি সি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
৪নং কেয়ারলি প্লেস, তৃতীয় তল, কোন। ২২০-২৩২১

বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী অনিমেষ মুখার্জি প্রবীণ মজুমদার

ট্রামওয়ে কর্মচারিদের সমবায় ঋণদান সমিতি

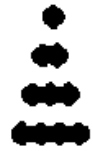

১২, আর এন মুখার্জি, কলিকাতা ঃ ৭০০ ০০১

পরিচালিত

পুরীতে স্বর্গদ্বারের নিকট
বিলাসবহুল আট কামরা হলিডে হোমে আপনি স্বাগত।

Enjoy your Holiday
at
Our Holiday Home at

(Sargwdar opposite Bharat : Puri Sevagram Sangha)

For Banking Contact :

Secretary
The Post and Telegraphs Accounts Cooperative Credit Society Ltd.

Yogayog Bhavan (12th floor)
P-36, C. R. Avenue
Calcutta - 700 012
Phone : 20-6351/20-6352/20-6353

With Best Compliments From

Everest Staff Co-operative Credit Society Ltd.

4, Government Place North
Calcutta - 700 001
Phone : 248-6295/97, 248-7945
Telex : 021-7581 & 021-2236
Fax : 91-33-2489583

বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার জনসাধারণের
সেবায় বৎসরের অধিক কর্মরত

দি খাতড়া পিপ্‌ল্‌স্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

পোঃ অঃ খাতড়া, বাঁকুড়া

অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেশি সুদ, সঞ্চয়ের, বন্ধকি ঋণের সুবিধা,
ঋণের কল, স্থায়ীর ডিপোজিট ভিন্ন, লিফ্‌ট্ চেক ও
চেক কালেকশনের সুবিধা।
বহু ক্ষেত্রে টাকা বিতরণ ও আরো অনেক সুযোগ।
সকলের আন্তরিকতা ও সহযোগিতাই ব্যাঙ্কের মূলধন।

ভাটপাড়া-নেহাটী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৩ নং মুখার্জি পাড়া রোড, ভাটপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

শাখা ঃ ১৭/এ, পূর্ব জেবপাড়া রোড, শ্যামনগর
২০, হরিদাস জেব রোড, নৈহাটি

- ☐ ১৯২৬ সাল থেকে জনগণের সেবায় নিয়োজিত।
- ☐ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার লাইসেন্স প্রাপ্ত।
- ☐ ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স অফ ইণ্ডিয়া কর্তৃক সুরক্ষিত।
- ☐ স্থায়ী আমানতের উপর সুদের হার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ২৫% থেকে ৫০% বেশি।
- ☐ পুরী, দার্জিলিং ও দিঘা হলিডে হোমে অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা।
- ☐ সেভিংস ব্যাঙ্ক আমানতের উপর সুদের হার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা শতকরা ১% বেশি।

শারদীয়ার অভিনন্দন জানাই

মহাপ্রভু তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম ঃ বিদ্যাসাগর
পোঃ বিদ্যাসাগর, জেলা ঃ বর্ধমান

সহযোগিতা আর সহমর্মিতার আশ্বাস নিয়েই
সাধারণ মানুষের সাথে এগিয়ে চলেছে সমবায়

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক

জয়তু সমবায়

সমিতি পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে ঃ
বিনোদবিহারী দেবনাথ

Authentic Tutorial College

Office :
58/B, Patuatola Lane
Calcutta - 700 009
Phone : 241-6025
M.A/B.A/Madhyamik/H.S/Notes
and
Suggestion Available Here.

Free Library and Coaching Class

With Best Wishes :

Gladstone Lyall Employees' Industrial Co-operative Society Ltd.

4, Fairlie Place (5th Floor)
Calcutta - 700 001
Phone : Office : 220-3782 / 220-0390
Factory : 557-3495

Manufacturers of :
Glason Bituminous Waterproofing Felts
IS : 1322/82
And
Various Allied Products i. E., "Gladex Expansion Joint Board, Gladsantico, Anticorrosive Paint Etc.

Specialist in :
Roof Waterproofing Treatment
Pest Control Anti Termite Treatment

A House of Quality for Century

গল্প

খোঁজ

দীপ ভট্টাচার্য

বাজারের স্টেপেজে বাস থেকে নেমেই হকচকিয়ে গেল নীলাঞ্জন। পনেরো বছর আগের ফেলে যাওয়া চেনা পরিবেশ আর নেই। ঘুম আর প্রয়োজনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পালটে গেছে পুরো ছবিটা।

আগে ছোট্ট পাঁচ-ছয় মোকানের পাতলা কিরকিরে বাজার ছিল। এখন সেখানে পাকা দেকের ওপর বাঁধা চালার সার সার মোকানের বিশাল বাজার। নিজস্বিত লোকের টুকরো কথাবার্তার কান ঝালাপালা করা ভনভনে আওয়াজ বাজারের আশপাশের বাতাসে পাক মারছে।

চেনা ছবির অনিবার্য পরিবর্তনে নীলাঞ্জনের বুকের গোপনে একটা আবছা ব্যথার ছায়া। পনেরো বছর আগের ফেলে যাওয়া স্মৃতি সেখানে উঁকি মেরে খুঁজতে চাইছে সেদিনের দারিদ্র্য আর অসহায় জীবনের ইতিহাসকে।

সেদিন ঠিক এইখান থেকে কেউ বাজারের ভিড়ে চোখ রাখলে দেখতে পেত রোগাটোগা কর্মা একটা ছেলেকে। অজস্র সেলাই আর তুলিমারা আসমানি পাঞ্জাবির ওপর ছাপটা হ্যান্ডলুমের একটা পাঞ্জাবী চড়িয়ে বাজারের এপাশ-ওপাশ চষে বেড়াচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা। মায়ের দেওয়া দুটো টাকায় ন'জন মানুষের দুবেলার ভরপেটের আনাজ জোগাড় করতে সেদিন সে হিমসিম খেয়েছে।

তবু ও হাল্লেনি। আর তার জন্য ওকে ঘুরে ঘুরে কম পয়সায় সেই দরকারের জিনিসটা খুঁজতে হয়েছে অনেক বেলা পর্যন্ত। বাজার করতে করতে ঘুরেফিরে বারবার দেখা হয়ে গেছে চেনা চেনা মুখের সঙ্গে। তারা জানত নীলাঞ্জনদের অবস্থার কথা। তাই চোখা-চোখিতে পাশে ও লজ্জা পেয়ে যায় তাই কেউকেউ অহিলায় তারা মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ায় অন্যদিকে।

শুধু ভালবাসাই নয়, কিছুটা মায়াবিহিত সহানুভূতিতে অনেকেই কিছু না বলালেও বলেছে শুধু একজন। নন্তবাবু। ঋণ-ভারাক্রান্ত রেখে যাওয়া সম্পত্তি আর ভকের দুকান ঘাটানো দু-নম্বরী পারলার গয়নে যার কাছ থেকে উপন্যাস-ভরিতার ওর অহংকারী কথা ছাড়া আর কোনকিছুই কেউ কোনদিন পায়নি।

পাশাপাশি পাড়ায় বাড়ি। তাই অনেক বড় বাড়িতে জন্মালেও শুধুমাত্র নীলাঞ্জনদের দারিদ্র্যের কথা তার অজানা ছিল না। তবু অনুভবের অসহ্যতাকে উপন্যাস করে আসল পাওয়ার নিষ্ঠুর উল্লাসে কথাবার্তা ঘুরেফিরে ওর সঙ্গে নন্তবাবুই তখনবারই দাঁত বের করে খিল্লে বলেছে : কি হে নীলুবাবু, — সস্তা বাজারটাই কি কিনে নেবে নাকি হে? — আরে অফিসের মতন গরিব ওয়েলফেয়ার একটা কিছু কিনতে কিনতে যাও!...

গা-জ্বালানো কথা। অন্তত ষোল-সতেরোর এমন বয়ঃসন্ধির দুটো হতে কেউ তা সহ্যও করে না। নীলাঞ্জন তবু সেদিন কিছু বলতে পারেনি। বরং বোকাবোকাভাবে দাঁত বের করে মাথা নিচু করে সামনে থেকে সরে গেছে। কেননা কিকেরেই ওকে নন্তবাবুদের বাড়িতে যেতে হয়েছে পড়াতে।

মাসে সাকুল্যে মইনের চাকরি। অভাবের সংসারে সেদিন টিউশনির পঞ্চাশটা টাকা অমন কালচু সেটিমেন্টের থেকে অনেক বেশি দরকারি ছিল। আবার সেই টিউশনিতেও ছিল অনিশ্চয়তার ভয়। কেননা একজন সহ মাধ্যমিক পাশ করা ছেলেকে কেউ সহজে ক্লাস সেভেনের এক ছেলেকে পড়তে দেয় না। কিন্তু নীলাঞ্জনকে দিয়েছে। তার কারণটা ছিল অরিতার জেদ।

অরিতা নন্তবাড়ির কেউ নয়। সম্পর্কে মাসির বাড়ি। ওদের অবস্থা ভাল। কিন্তু আছে গাঁয়ে বাড়ি বলে এখানে থেকে পড়াশোনা করেছে। সে জানত নীলাঞ্জনকে। মাধ্যমিকে স্টার পাওয়া অসাধারণ পড়ুয়া নীলাঞ্জনকে পেলে যে তার সুবিধেই হবে এটা সে বুঝেছিল। আর বুঝেছিল বলেই পড়ানোর ব্যবস্থাটা নিজেই করে নিয়েছিল।

নন্তবাবুর অপমানের খোঁচায় আহত নীলাঞ্জন টিউশনিটা ছাড়তে হবে বলে মুখে কিছু বলতে পারেনি সত্যি। কিন্তু ষোল-সতেরো বছরের উনসনে রক্ত মাঝে মাঝে সাহসের বাঁধন ভেঁড়ারও উপক্রম করেছে। তখন মরোনশী অরিতা অসহায় মুটো চোখ তুলে করুণ মিনতি করেছে : প্লিজ নীলুদা, তুমি চলে গেলে আমার খুব খারাপ হবে জেবেই। আমার মুখ চেয়ে তুমি এইটুকুন অন্তত সহ্য করে নাও।

কোন ভালবাসাটাসা থেকে নয়। শুধু অরিতার প্রতি দায়িত্ববোধ আর মানুষের অসহায়তার ওপর গভীর সহানুভূতি থাকায় জন্যেই ও সেদিন সব অপমান সহ্য করে নিয়েছিল। নাহলে যে সময়ের কথা তখন ওর মনে 'প্রেম' শব্দটার আলাদা কোন উপলব্ধিই জন্মায়নি। কিংবা জন্মালেও হয়তো অসচেতনভাবেও কখনোতে প্রশ্রয় দেয়নি। কেননা ও জানত ভালবাসা-টাসা পরিবেশের জন্য নয়। অনুভবের মতন বেঁচে থাকবার আর ভাতকে পড়ে থাকবার লড়াইয়ে দিন রাত যাদের জীবনের কথা-ক্রম আর প্রেমের মূল্য দিতে হয় — প্রেম তাদের কাছে শুধু বিলাসিতাই নয়, রীতিমতন স্পর্ধার।

তবু প্রেম অমোঘ। দুর্নিবার। সবার অলোচরে এমন কি নিজের অজান্তেও সে নিঃশব্দে ছায়া ফেলে মনের গভীরে। ইন্দিতাও বুঝতে পারেনি। ঘুনাক্ষরেও টের পায়নি কখন সে নীলাঞ্জনকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। কিংবা বুঝতে পারলেও হয়তো তার গভীরতা আর অকল্পনীয় পরিণতির ছবি তেমন করে মনের পরতে ফুটে ওঠেনি।

ইন্দিতা নন্তবাবুর ছোট্ট মেয়ে। বয়সে অরিতার চেয়ে বছর চারেকের বড়। মাধ্যমিক পাশ করেছে নীলাঞ্জনের পরের বছর। অবার মতনই সে মেধাবী। কথাবার্তায় বাপের মতনই তুঙ্গ-তারিল্য আর উপন্যাস। পাড়াসুত্র সম্পর্কে নীলাঞ্জনের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই তার কথাবার্তা ছিল। শুধু লেখাপড়াতেই নয়, তার সঙ্গে নাটক-আবৃত্তি আর খেলাধুলোতেও

নীলাঞ্জনের পড়া বোঝার ইনিতাকে টেনেছে একটু অন্যভাবে। আর সেই অন্যভাবে টানাটা যে কীভাবে ধীরে ধীরে তার মুখের গভীরে স্পষ্ট ছায়া এঁকে দিয়েছিল তা বুঝতে পারেনি সে। কিন্তু পরিস্থিতিক অভিঘাত। অর্থনৈতিক কারণ। আর সহজ আলাপের প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্যেই কোনদিন মনের কথা হাসবার্তাও বোঝাবার সুযোগ হয়নি ইনিতার।

সন্ধের দিকে অরিত্রকে পড়ানোর ফাঁকে সময়মতন জলখাবার দেবার অছিলায় প্রায়ই সে ঢুকত ওদের পড়ার ঘরে। তখন হয়তো চোখবোজা নীলাঞ্জন পড়া বোঝাতে বোঝাতে তন্ময় হয়ে গেছে। টেবিলের ওপর খাবারের প্লেটটা রাখবার সময় ইচ্ছে করে ঠুকে শব্দ করেছে ওর তন্ময়তা কাটাবার জন্যে।

সন্ধ্যা ঘোর কাটা অবস্থায় ল্যাম্পশেডে চোখে ইনিতার দিকে চাইলেই সে মুচকি হেসে উপহাস করেছে ঃ কিগো নীলুদা, অরিত্রকে পড়াতে পড়াতে এদিকে দেখছি তোমার ঘোর লেগে যায়! আমার অন্য সময় সামনে বই খুলে রেখে অরিত্রও সেদি ঘোরে থাকে। ব্যাপার কিগো? তোমাদের দুজনের ঘোড়া রোগ-টোগ ধরল না তো?

এ কথার উত্তরে নীলাঞ্জনও মুচকি হেসেছে। সে হাসি কষ্টের। কেলাস। বুকের গোপনে কৌটা কৌটা অন্যায় রক্ত ঝরার শব্দ প্রকাশ না পাবার মিথ্যে চেষ্টা। ওর সহজ সরল জীবনে চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপে অনেক বিদ্রূপ, অনেক উপহাস আর তাচ্ছিল্যকে এড়িয়ে যেতে গিয়েও পৌরুষের আত্মকোরে প্রতিঘাত ঘুঁসে উঠেছে। কিন্তু দারিদ্র্য আর মনুষ্যের সহজাত কোমল বৃত্তির ওপর এমন খোঁচাটাকে সেদিন প্রাণপণ চেষ্টায় সহ্য করে নিতে হয়েছে শুধু অরিত্রা আর দরিদ্র বাবা-মায়ের সামান্য সুবিধের জন্যে।

ইনিতার সেদিনের ছলনাহীন ব্যবহার নীলাঞ্জনের কাছে তার স্বভাব অনুযায়ী স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু ও একবারও ভাবেনি এই তাচ্ছিল্য আর উপহাসের পেছনে ছিল নীলাঞ্জনের প্রতি তার গোপন দুর্বলতার অসহ্য যন্ত্রণা। অরিত্রকে জন্ম দেবার অধিকারে চলে যাবার নিরুপায় ঈর্ষা আর আক্রোশ ইনিতাকে সেদিন অরিত্রা করে তুলেছিল। শুধু তার প্রকাশ ঘটেনি স্পষ্টভাবে। বোঝতে পারেনি তার গোপন অসহায়তা।

তাই মরিত্রা ইনিতা মাহরাতার মতন দিনের পর দিন বসে থেকেছে সুযোগের অপেক্ষায়। লজ্জার বিনায় কিংবা অভিমানের ঠুনকো অহংকারে মুখে যা সে বলতে পারেনি, একটা একটা করে স্বর্ণ দিন কেটে যাবার আকস্মিকতায় তখনই সে ছটফট করেছে কিন্তু একটা কিছু করবার আকাঙ্ক্ষায়। নিজেকে প্রকাশ করবার ঠিক সময়টি আসার প্রতীক্ষায় যত তার দিন গেছে, ততই সে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একটু একটু করে ঘরে উঠেছে প্রতিশোধপরায়ণী এক নারী।

তবে সব প্রতীক্ষাই স্বর্থক হয় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান আর পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনে হয়তো অনেক প্রতীক্ষার অবসানও হয়। ইনিতারও দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা একদিন শেষ হল এক আকস্মিক সুযোগে। তবে তা সহজ পথের সুন্দর পরিণতিতে নয়। দিনের পর দিন স্বর্থ আশার আশায় ঘুরে ঘুরে পাওয়া একটা ভালবাসার ভাঙাল মনকে গ্রাস করে ফেলা গোপন ঈর্ষা আর না-পাওয়ার আক্রোশ ওকে টেনে নিয়ে গেল প্রতিশোধের কালো রাস্তায়।

অরিত্রা জানত নীলাঞ্জন শুধু ছাত্রের পড়াতেই ভাল নয়, ভালও বাঁশিতে খেলাধুলো আর সংস্কৃতি জগতের অনেক বিষয়ের ওপরেই অগাধ জ্ঞান রাখে। সেই বিশ্বাস থেকেই একদিন সে আবিষ্কার করেছিল নীলাঞ্জন লেখে। তবে আর পাঁচটা বাঙালি ছেলের মতন উঠতি বয়সের আবেগ বুকে নিয়ে কবিতা নয়, গল্প লেখে।

সেদিন অরিত্রার মা বয়স তাতে অবাক হবার আর আবেগের অভিব্যক্তিই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু অরিত্রা তা করেনি। ভালবাসা'কী অভিজ্ঞ বন্ধুর মতনই নীলাঞ্জনকে উৎসাহ দিয়েছে। ভালবাসা দিয়েছে। লেখার চিলেমিতে অভিমানও করেছে। নীলাঞ্জনের মতন মুচিমান পড়ুয়া ছেলে যে ভবিষ্যতে লেখার লাইনে কিছু একটা করবেই এই বিশ্বাসে ওর পেছনে লেগে থেকেছে ছায়ার মতন।

অরিত্রার উৎসাহ আর নীলাঞ্জনের নিজের আন্তরিক চেষ্টায় ধীরে ধীরে যখন ও সত্যিকারের সাহিত্যিক হবার দিকে পড়তে চলেছে ঠিক সেই সময়টাতেই ঘটেছিল ঘটনাটা।

নীলাঞ্জন একটা গল্প লিখেছিল। প্রেমের। উঠতি লেখকের কাঁচা হাতের লেখা। তরুণ বয়সের আবেগে সে লেখা লেখায় লেখায় ছত্রে উঠেছিল বর্ণহীন। অভিনীর এক তরুণ দিল প্রেমিকার প্রতি বিরহী প্রেমিকের দীর্ঘ চিঠি। তাতে যেমন ছিল প্রেমের আকুতি, তেমনই ছিল কাছে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

শুধু উৎসাহ দেওয়াই নয়, প্রথম পাঠিকার নিরপেক্ষ মতামত জানাবার জন্যেই অরিত্রাকে পড়তে দেওয়া সেই গল্প ছিল টেবিলে রাখা খামের ভাঁজে। দুর্ভাগ্য নীলাঞ্জনের। দুর্ভাগ্য অরিত্রারও। ঈর্ষা-জরজর ইনিতার হাতে যেবারই পড়ে গিয়েছিল সেটা। দীর্ঘদিনের মাহরাতা-যৌবনে অপেক্ষার বাঁধ ইনিতা আজ সোনার সুযোগটা হাতছাড়া করেনি। গল্পের খাতা আগ পোপাট করে নিয়ে শুধু চিঠির অংশটা মেখিয়েছিল দত্তবাবুকে। সঙ্গে চোখের জলের অভিযোগ —নীলাঞ্জন নাকি ওই চিঠি লিখেছে ইনিতাকে।

শুধু কথার অপমানই নয়, মেয়ের প্রতি নীমাহীন স্পর্ধার আচরণের যোগ্য শাস্তি দিতে দত্তবাবু সেদিন দত্তচিলা থেকে ওকে বের করে দিয়েছিল ঘাড় ধাক্কা দিয়ে। ইনিতার এমন মিথ্যাচরিতার অবাক অরিত্রা হয়তো ভাবতেও পারেনি মানুষ এমন নীচ আর নিচুর হতে পারে। কিন্তু দত্তবাবুর আক্রোশ থেকে তার আচরণের প্রতিবাদ করা ছোট্ট-চোদ্দ বছরের অরিত্রার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিল না। তাই যে মিথ্যের বোঝা নীলাঞ্জনের জীবনের সমস্ত সম্বল, সব সুনামকে ধুলোয় মিশিয়ে ওকে লোকের চোখে ছোট করে তুলল, তা হাইল সবার অজান্তে।

সেদিন পনেরো বছর আগের আরও অন্ধকার গা-গরম। খবর রটে যায় বাতাসের আগে। তাই ভোর না হতেই নীলাঞ্জনের কথা ছেলে ফেল দল পাঁচের লোক। তাতে কারও কারও অবিশ্বাস। কারও সন্দেহ দত্তবাবুর চালাকিতে। কারও কারও কথায় আবার বিশ্বাসের সঙ্গে অবাক হওয়ার ভান ঃ ওমা, বল কি — এমন ছেলে। — মুখে আর বিশ্বাস করব শো। —

শুধু নীলাঞ্জন সন্ধ্যাটা দিন আসার আগে থেকেছে। হয়তো অরিত্রা এতক্ষণে বলে দিয়েছে আসল কথা। হয়তো অরিত্রার মুখে

সব ওর নতুনদা নিজের ভুল বুঝতে পেরে ওকে ফেরে পাঠাবে। তখন লজ্জায় অপমানে নিজের নীলাঞ্জন হাত জোড় করে বলবে। কিছুতে তখন নতুনদা, এ কাজ আমি করিনি। আমরা গরিব। কিন্তু এমন বর্বর নয়।

কিন্তু তা হয়নি। আশায় আশায় সকাল কেটেছে। বিকেল কেটেছে। রাত্রিও কেটে গেছে। কেউ আসেনি বসতবাড়ি থেকে। কেউ বলেনি ঃ নীলু, তোর কোন দোষ নেইরে। সব ওই ডাক্তিনির কাজ।

পরের দিনটা কেমন এক অদ্ভুত অবসন্নতায় কেটে গেছে নীলাঞ্জনের। কেমন এক বোধহীন শূন্যতায় আকাশ পাতাল ভেবেছে আর ভেবেছে। কিন্তু একটা অসিলা যাবানো মুখ সে আর কাউকে দেখতে পায়নি। কিভাবে কথা আর না-কথার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের এতদিনের চেনা মানুষগুলোকে 'আমি' বলে দোষক্ষালনের সহানুভূতি জানানোর সুযোগও সে পায়নি। নিজের ভাগ্যের ওপর অভিমান করে রাত্রিরের অন্ধকার থাকতে থাকতে ও গাঁ ছেড়ে চলে গেছে কলকাতায়।

২

সেই শুরুয়া। তারপর এই পনেরোটা বছর পার করে ফিরে এল। ও কলকাতায় চলে যাবার পর ওর মা-বাবা আর বেশি দিন থাকেনি এখানে। তাই যোগসূত্রহীন এই পনেরোটা বছর অণু-পরমাণুতে ভড়ানো গাজনতলা -শীতলার থান-শ্যামলায়-নদীর ধারের বুড়ো বট-আর পশ্চিমের দু দু মাঠ হারিয়ে গেছে ওর জীবন থেকে।

হারিয়ে গেছে। কিন্তু ভুলতে পারেনি। অবচেতন ভাবনার আর স্বপ্নের ভেতরে তারা ঘুরেফিরে এসেছে হ্যালুসিনির মতন। সেই স্মৃতি। সেই অসহায় পড়িয়ে যাবার অক্ষম যন্ত্রণার দাহ যখনই ওর ঘুমের ভেতর উথলে উঠেছে, ঠিক তখনই ঘুমভাঙা হয়ে উঠেছে একটা মুখ। ডাক্তিনির। যে ওকে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছে। বুকের গোপনে লুকিয়ে থাকা প্রতিহিংসার উৎসমুখ খুলে দিয়েছে উপহাসের অভিনয়ে। অথচ এখন একটা সত্যিকারের সে চাইল আকণ্ঠ নীরবতায়। নীলাঞ্জনের অন্তরের দাম বুঝে নেবার ঔদ্ধত্যপণ তার হাতে থাকলেও কী এক দুরন্তমন উদাসীনতায় ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে মরিয়ে দিয়ে দেশত্যাগী করিয়ে ছাড়ল নিজেরভাবে।

আজকাল রিকশার ঘর্ষে ভাবনার অতল থেকে ফিরে এল নীলাঞ্জন। এতক্ষণ সে রাস্তার ধারেই ঠায় দাঁড়িয়েছিল। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা যে বোকামী হয়েছে সেটা বুঝে মনে মনে লজ্জা পেয়ে চট্টপিটে একখানা চেয়ার তুলিয়ে নিল।

যা ভেবেছে। সাহেবী পোষাক পরা একজন অচেনা লোককে এমনভাবে বাজারের দিকে চেয়েচেয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনেকেই বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে আশপাশে দু-চার জন উৎসুক মানুষের মোকরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্য — হয়তো অনুধিবেশের পড়া অচেনা বিদেশিকে সাধ্যেমিতরা হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

এরকম একটা অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যেই আর কিছু না ভেবে সামনের দোকানটার দিকে এগিয়ে গেল নীলাঞ্জন। চেনা দোকান। চেনা দোকানী। পনেরো বছর আগের অভিজ্ঞতাই চায়ের গেলাসে চামচ দিয়ে খটখট করে তিনি তলছিল যোগেন ঘোষ। চায়ের গেলাস আর কাপ ডিস রাখা কাঠের টেবিলটা আগের জায়গাতেই রয়েছে। শুধু পনেরোটা বছরের চায়ের কষ আর উপচে পড়া ঘুষের হিপোলে আরও কালো হয়ে উঠেছে।

নীলাঞ্জন ঢুকতেই যোগেন ঘোষ একবার মুখ তুলে চাইল। স্যুট বুট পরা এমন এক-জনকে ওর দোকানে দেখে একটু অবাকও হল। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল।

তার মনে ওকে চিনতে পারেনি। অবশ্য চেনার কথাও নয়। পনেরো বছর আগে ইন্দুল বয়সে খেলা ধেরৎ খানিকক্ষণ তলতলি মারা ন্যাকপাকে নীলু যে এখন একটা বড় বিদেশি কার্গোর চার্টার্ড আকাউন্টান্ট তা ও ভাববে কী করে?

পুরনো দিনের ভারশাটার বসে একটা চায়ের অর্ডার দিল নীলাঞ্জন। আগের সেই মজবুত ভক্তার সঙ্গে সঙ্গে টেবিল নয়। বারশাবে বোকদের হিরি ফেরানোর জন্য অ্যালুমিনিয়ামের পাত মারা চওড়া টেবিলের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেও আজ ভাঙচুরের ছাপ-পড়া। জায়গায় জায়গায় অ্যালুমিনিয়ামের পাত উঠেও গেছে।

চিরটাকাল বেতাবে ঠিক করে চায়ের গেলাস টেবিলের ওপর বসিয়ে নিয়েছে ঠিক সেইভাবে দিল না যোগেন ঘোষ। গরম মতন জল করে কাপ ডিশে সাজিয়ে রাখল। অনেকদিন খদ্দেরদের জন্যে এই ব্যবস্থা ওকে রাখতেই হয়। বিশেষ করে নীলাঞ্জনের মতন একেবারে পুরোপুরি সাহেব বলে কথা। অবশ্য যিনি বেড়াতের জন্যে অনেকবার বেটেবেটে পেট মোটা গেলাস। সে পনেরো বছর আগেও যা এখনও তাই।

সেই সব দিনে এক চামচ বেশি ঘুষ দিতে কালো ভুরুতের গাঁথার মোহন ঘোষ। উঁ— সব কত।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মনে মনে হেসে উঠল নীলাঞ্জন। মোহন ঘোষ একবার যদি জানতে পারত।—

দোকানে খদ্দেরের অনেকেই পুরনো। পনেরো বছর পরে আসার দিনের আশা যারা যুবকেরা প্রৌঢ় হয়েছে। প্রৌঢ়েরা হয়ে গেছে বৃদ্ধ। চুলে পাক ধরেছে। কপালে বলিরেখা। চোখের কোলে অভাব আর চিন্তার কালি। অরে হয়তো অথুলে গেছে। বেরাড়া বেকার ছেলে। মন-উচু উচু ভাসর ভোগর মেয়ে।

আগে এরাই গান্ধীর ঘোর, সুভাষের জোর, মুসোলিনির সাহস, কাইসেক আর মাও-সে তুঙের লড়াকু মন, স্টালিন-লেনিনের বিপ্লবের আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। বেঁটে বেঁটে মোটা কাচের গেলাসে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে গলার শির ফুলিয়ে তর্কে বিতর্কে বিষয় হয়েছে। পালোয়ার জামিজ আর পাঁচানো পাড়ির বাসবাস শব্দে এসের চকচকে চোখের সামনে সুতনুকা দাসী কিংবা কমলতা সেন চমকে চমকে উঠেছে।

এখন সেসব উধাও। রাশ-মায়ের দেওয়া তিন গাঁয়ের টৌপি-পুটি কিংবা বড়জোর অতসী-অপরাজিতার পাছাপেড়ে শাড়ির আঁচল ধরে ঘুলন্ত খোঁপি-পুটিদের ইন্দুল-পাঠশালা আর মুখ-ভাতের জোগান নিতে নিতে একেবারে ফুল গোরু। ছড়গোরা। ফুলে পড়া চোরাল বাঁধানো বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে চেপে ধরে উজরে হাত বোলাতে বোলাতে মনের খুশি তরিখ থেকে তলাস করে কোথায় কার কতো ধাকি দশ দিনের পরানি পুঁজে পাবে।

একদম চকচকে পোষাকের জলো চশমার ভাঁকে কর্সা মিষ্টোল গালের মানুষটাকে অ্যালুমিনিয়ামের সীট মাখা সস্তা কাঠের টেবিলে কনুই রেখে কাঁচা কলাপের চায়ে চুমুক দিতে দেখে সব হাঁ। শহরের কোন কোন বাবু কোন কারণে এসে পড়লে নাকমুখ সিটকে এমন ভাব দেখায় যেন গ্রাম বা গ্রেট ইস্টার্নে ছাড়া উনি চা খান না। কিন্তু এ যে একদম হাসি মুখে মিলিয়ে নেওয়া চায়ে চুমুক। সবে আসর জেঁকে।

আস্তে আস্তে চা-টাপের কয়ে মোহনের কাছ থেকে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে ধরাল। সাদা সুতোয়। বেচুর দোকানের স্পেশাল। ইস্কুলের পাঠ সবে সাঙ্গ করা নীলাঞ্জন অনেক -অনেকদিন আগে লুকিয়ে এখানেই প্রথম টেনেছিল। এই বিড়িতেই। সেদিনের সেই স্বাদ কি ও পেল _?

নাহ _। পাওয়া যায় না। পাওয়া সম্ভব নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরই পেছন পেছন সব কিছু চলে যায় অনেক অনেক দূরে। সেখান থেকে কোন একটা মুহূর্ত, কোন একটা চরিত্র, কিংবা কোন একটা টুকরো ছবি একবারের জন্যেও আনতে চাইলে তা কোনদিনই অবিকল হয় না। বরং সেই হারানো দিনের অনুভূতি না ফিরে পেলে বুকের গোপনে যা মোচড় দেয় তার নাম স্মৃতি।

চা আর বিড়ির দাম মিটিয়ে নীলাঞ্জন ঘোষ কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। বুকের ভেতর হারানো দিনের ঝিক ব্যথা। কেউ ওকে চিনতে পারেনি। এটা একদিক দিয়ে ভাল। স্বচ্ছন্দে এক্সা ঘুরে দেখা যাবে। পনেরো বছর আগের অনেকের দিনগুলো হয়তো নতুনেরা জানে না। কিন্তু সেকথা মনে রেখে দেবার মতন লোকেরও অভাব নেই এখানে। চিনতে পারলে হয়তো খানিকটা উপহাস করেই বলবে শেষ পর্যন্ত তাহলে ফিরে এল্লে নীলু। তা ভাল _। আর বয়সে ওরকম একটু আধটু ইয়ে দোষ সবারকেরই থাকে। কি বল? হে হে হে হে—

সেই উপহাস। সেই অসময় স্মৃতির বুকে ছুরি মেরে হতাশ নীলাঞ্জনের অপমানে হীন হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে ওদের গোপন অমানবিক উল্লাস। ভয় ভয়ে পনেরো বছর আগের এক অভাগা ছাড়িয়ে ওকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল চেনা মানুষ আর পরিচিত পরিবেশ ফেলে রেখে।

রাস্তার কাছাকাছি সোনা পোদ্দারের আনাজপত্তির বাঁধা দোকান। কী একটু ভেবে নিয়ে ও সেইদিকে এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। এখনও সোনার সামনে চটের থলির ওপর বিছানো রঙিনকৃত আলু। তার চার পাশ জুড়ে ছোট-বড় ঝুড়িতে কলা-পাতা পেঁপে-বিলিতি আমড়া। ঘাড়ু। আরও কত কী। একেবারে সকালে ঘুম গাঁ থেকে বাজারে ভেতে আসা কষ্ট-কিসের কাছ থেকে সস্তায় ওইসব জিনিস কিনে নিয়ে বেলায় পঞ্চাশের বেশি দামে বেচে দামলা করাই সোনা পোদ্দারের ব্যবসায় নিত্য দিনের ছবি।

ঝুড়ির ওপর সজিয়ে রাখা কাঁটালি কলার একটা সোনা ছড়া তুলে নিল নীলাঞ্জন। সোনা তটস্থ। হাসল খন্দের। সমীহ করে কথা বলল। গোটা ছড়াটাই নিবেন তো? জোড়া তিন টাকা। তখন সস্তের।

পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো নীলাঞ্জনের চারদিকে ঝুড়ির মতন ছড়িয়ে পড়ছে। বুকের গোপনে উথাল আবেগ। পনেরো বছর আগে যা ছিল ওর কাছে স্পর্ধা। আজ তা মুখরোচক ওড়ানো ঝুকিপূর্ণ কায়দা। এ সেই মায়ের দেওয়া দুটো টাকা সম্বল করে টিপে টিপে হিসেব মিলিয়ে মিলিয়ে কেনা নয়। এ দামি চামড়ার ব্যাগ খুলে কয়কয়ে একশ টাকার তেজী চাউনি।

মোটা করে সুতলি সুতো পরিয়ে তাতে ছড়াটা ঝুলিয়ে দিতে সন্তর্পণে বুকি কেবল দিতে না ওনেই ব্যাগে রেখে ও সোনার চালা ছেড়ে বেরিয়ে এল। একটা বাঁক মেরে বাজারের একেবারে শেষ দিকে কলী দিনের দোকানে পৌঁছে আজও কয়েকের মালে বিড়ি ধরে জলধর মাল। বাবার খুব প্রিয় ছিল। রবিবার রবিবার কিনত। মাসের প্রথম দু-রবিবার নগদ। শেষ দু-রবিবার ধার।

কয়েকের পুরনো প্রজা পাঠক। কিন্তু মনে রেখেছে জলধর। বাঁক দের করে অদ্ভুত ভাঙা গলায় কাত। বার — কদর মান না কেন। আপনকার ভাত তো মেয়ে গলা টিপলে বার হবে। পয়সা তো আর মার যাবেনি। আজ নয়তো কাল। মান — গ্রামস্থ পাবেন।

জলধরের বয়স হয়েছে। কোঁকড়ানো চুল চুলগুলো এখন শনের মতন সাদা। আগে আগে দশ বছরের কাচু আলয় বাপের পেছন পেছন। আজকিনে সে তালড়াই জোয়ান। সে-ই কাটাকুটি করছে। জলধর পাশে আছে তদির-তদারকে।

বাবার সঙ্গে বাজারে এলে যেখানটায় দাঁড়াত এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াল নীলাঞ্জন। বুকের ভেতর যেন উঠল জলতরঙ্গ। সারা বুক জুড়ে অদ্ভুত অনুভূতি। হারিয়ে যাওয়া, ঘুরিয়ে যাওয়া দিনগুলো যেন কালের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে ছবি হয়ে। আজ আর বাবা সঙ্গে নেই। সে একলা। অন্ধকারের হাত ধরে এক লহমায় পাড়ি দিয়েছে পনেরো বছরের পারে এক ছায়াছায়া মুখের, যন্ত্রণার আর উপেক্ষার দিনগুলোতে। _

সেই আশ্চর্য অনুভূতিকে দু'হাতে আগলে ধরে রাস্তা পেরোতে পেরোতে ওর মনে এল অনেক অনেক দিনের হারানো একটা খানখনে গলা ঃ নাদুস বাবু _। পয়সা তো আর মার যাবেনি _। আজ নয়তো কাল _

নিতাই মহরার দোকানের সামনের কাপড়া ভাঙা কাচের শোকেসটা আর নেই। তার ওপরে কাঠের বয়কোনের ওপর ঢালা থাকত গরম জিলিপি। দালদার, ছোট বড় বাতাসা, চিনির আর গুড়ের। পাশে শালপাতায় ভাঁজে ভাঁজে তিলের খাজা। ছোলা আর বাদামের পাটালি। ভেতরে তখনও আলুমিনিয়ামের গামলায় রসগোল্লা আর পানতুয়া।

দিন বদলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন সামনে ঝকঝকে শো-কেস। চকচকে মিঠাইয়ের ট্রেতে রসগোল্লা-পানতুয়া-সন্দেশ ছাড়াও আরও অনেক রকম মিঠাই। কিন্তু সেই খেজুর গুড়ের বাতাসা কই? তিলের খাজা। ছোলা আর বাদামের পাটালিই বা কোথায়?

নিতাই মহরার চুল এখন সাদা। বেঞ্চিটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিয়ে ছোট একটা ছেলের দিকে চেয়ে হাঁক দিল। হ্যাক _ বাবুকে গরম গরম রাজভোগ দে _।

নীলাঞ্জন বাধা দিয়ে বলল ঃ তিলের খাজা নেই? ছোলা-বাদামের পাটালি?

নিতাই মহরা অবাক হয়ে চাইল। ভাবতে পারেনি এমন একজন সাহেবী পোষাক পরা কলকাতার বাবু ওইসব খুঁজবে। হাসর বাড়িয়ে

ধরা ডিশে ডিমটে দিয়ে মুটো পেয়ারা রাখতেও রাখতে সে ওকনো হাসল। সেদিন দিন আর আছে বাদু? যে সময়ের যা। এখন আর ওসব কেউ খোঁজ করে না। সব মর্জার ব্যাপার।

একটু থমকে গেল নীলাঞ্জন। মকল সভ্যতার ঢেউ আজ পা-গয়ের সঙ্গে মৃত্তিকে-ও গ্রাস করে নিয়েছে। এ আওটায় কি নিজের কাছে কিছু থাকবে না?

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে দশ টাকার নোটের হিসেব করতে করতে নিতাই মহন্ত বিনয়ীত হাসল। তা আমার জিনিসের কেমন টেস্ট বলুন ৷ কলকাতার থেকে ভাল কি না?

আলগোছে কেরত টাকাটা ব্যাগে ভরতে ভরতে গভীরভাবে নীলাঞ্জন উত্তর দিল ঘ-উচ্চারণ __ ভাল। __ তবে আগের মতন নয়।

— আগের মত-নয়?

কথাটা কানে দিয়ে ঘট্ করে লাগতেই নিতাই মহন্ত থমকে গেল। চোখ সরু করে নীলাঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে রইল একভাবে। বোঝবার চিনতে চাইল কোনদিন এই বাবুকে ওর দোকানে দেখেছে কি না।

রাস্তা পেরোবার ছল করে আড়চোখে একবার নিতাই মহন্তর দোকানের দিকে চাইল নীলাঞ্জন। নিতাই তখনও মনে করবার চেষ্টায় মাথার চুলগুলো খামচে খামচে ঘরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে।——

৩

বাজার ছাড়িয়ে শিবতলা। শিবতলা ছাড়িয়ে বেন্থ রায়ের বিড়ি তৈরির ফ্যাক্টরি। তার পাশ দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে আটচালা। আর তার পেছনের বাড়িটাই ওদের। সামেক কালের বিশাল দুমহলা বাড়ি। মোক্ষদার অভাবে খাঁ খাঁ করছে।

ফটক দিয়ে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকল। আগের দিন হলে অত সহজ হত না। সদরের মোড়ে বসে থাকা দাদু কাউকে ঘারে কাছে দেখলেই হাঁকড়ে উঠত। কে ওখানে?

দাদু নেই। অনেকদিন হল মারা গেছে। নীলাঞ্জন যাবার আগেই। দাদু ছাড়াও এখন আরও অনেকেই নেই এ বাড়িতে। যেজ ওরফ। ছোট ওরফ। সেজ ওরফ। বড় ওরফেরও কেউ কেউ। চাকরি আর ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধের জন্যে তারা চলে গেছে সহরের দিকে। পড়ে আছে মাত্র কয়েকটা প্রাণী।

নীলাঞ্জন এই সবই অবশ্য শুনেছে বাবার কাছে। আগে বাবা প্রায়ই চলে আসত টানেটানে। এখন আর আসে না। আসতে পারে না। যে বিশাল গমগমে বাড়িটায় বাবার শৈশব কেটেছে। কৈশোর-যৌবন কেটেছে। এখন বার্ধক্যের সীমানায় এসে খাঁ-খাঁ শূন্য সেই ঘরে খোলা হাওয়ায় ব ব আর পরস্পর বকবকম শুনতে শুনতে বুকের খোপনে যে হাহাকারের বেদনা গুমরে গুমরে ওঠে।

সামনের শূন্য মহল পেরিয়ে, পাকসুদ্ধা তলা ছাড়িয়ে। গোলাবাড়ি বাঁয়ে রেখে অন্দর-মহলে ঢুকতে যেতেই রোয়াকে মানুষ পেতে শুয়ে থাকা ঠাকুমাকে দেখতে পেল। তার পাশের মতন চুলে আলতো চিরুনি চালাচ্ছে আরও একজন বৃদ্ধা, পেত্তি পিসি। বাপ-কালের পিসি। ওদেরও পিসি।

জীবনের তিনতাল বাদুন ছাড়িয়ে কটিয়ে এখন শেষ প্রহরে বোধহয় মায়া কাটাতে পারেনি। তাই আজও রয়ে গেছে। আগের দিনের মতনই ঠাকুমার আট প্রহরের সাথী।

পেত্তিপিসিকে কখনও কারের চোখে মনে হয়নি। কিন্তু চিরকালই সে পরিবারের একজন হয়েই ছিল। কাজের লোক ছিল আরও চার পাঁচজন। কিন্তু পেত্তিপিসির মতন মনে হয়নি কাউকে। এরই কোলে পিঠে সব ছেলে মেয়েদের শৈশব কেটে কৈশোর এসেছে। আশ্চর্য আশ্চর্য আবার মিটিয়েছে। মুখ্যুমি করার শাস্তি থেকে রক্ষেও পেয়ে এসেছে।

বিশাল বাদুন বাড়ির ওনু যেজ ওরফের আর্থিক অনটন অনেককে দূরে সরিয়ে রাখলেও পেত্তিপিসি কখনও সরে থাকেনি। বরং এক আশ্চর্য আপন করা ভালবাসার অনায়াস ছেলেমেয়েগুলোকে বুকের কাছাকাছি রেখেছে চিরটাকাল। দূ যরে আসলে রেখেছে বাড়ির সবার তাচ্ছিল্য আর উপহাস পাওয়া পেত্তিপিসির মন-উদাসী হাবলা ছেলেটাকে। .

পায়ের শব্দে মুখটা ঘুরিয়ে ওকে দেখতে পেয়ে ঠাকমা বড়বড়িয়ে উঠে বসল। উঠোনের দিকে পেছন ফেরা ছিল পেত্তি-পিসির। ঠাকমাকে ওরকমভাবে বসে পড়তে দেখে সেও ঘুরে বসল। অনেকক্ষণ ধরে চোখের ঠাহরেও ঠাকমা চিনতে পারল না। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল। অচেনা মানুষ দেখে অভ্যস্ত হাতে পানের আটচালের পানিকটা আঁচায় তুলেও নিল। নীলাঞ্জন কিছু বললও না। এগোলও না। মনে মনে ভরসা পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল এরা কী করে দেখার জন্যে।

এখানে থাকতে থাকতে কোনদিনই প্রিয় বস্তি নাতনির তালিকার ছিল না নীলাঞ্জন। আদরে হাত দেবার আগেই ঠাকমার গলা খান খান হত অকারণ চিৎকারে। ভয়া গোখরোর ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজ ফেলে রেখে ছুটে আসত মা। ওক হয়ে যেত এলোপাতাড়ি চড়চাপড়। পরে সন্ধে বেলায় ক্লাস বাবার কাছে নালিশ জানালে আবার শুরু হত কান-মলা আর উঠবস পর্ব।

সবসেবে সারা বাড়ির দু-দি। কেন ও এমন একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে যা বাড়ির আর কেউ কখনও তা করেনি। অন্তত ও দেখেছে বড় ওরফ আর সেজ ওরফের ছেলেমেয়েরা কেউ আচারে পাকলা মারলেও অম্বিকেতলার ঠাকমার ফোকলা মুখের মাড়ি বেরিয়ে পড়ত ৷ আহা __ বউমা থাকলে যাক __ ছেলেমানুষ __।

তাই নীলাঞ্জন নামের একটা ছেলে যে পরিবার থেকে আড়াল হয়ে গেল তার জন্যে কোনদিন ঠাকমার মাথা ব্যথা হয়নি। দেখার ইচ্ছেও জাগেনি। ফলে কলকাতায় থাকা নীলাঞ্জন কবে যে কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পড়ল। লেখাপড়া শিখে বয়সের সেরা ঘরে উঠল ঠাকমা তা জানতেও পারল না।

পেত্তিপিসির চোখ একভাবে নীলাঞ্জনের মুখের ওপর স্থির। আদি বয়সের দিনই শুধু তার কাটেনি। আদিটা কালবোশেখির ওলট পালটও সে দেখেছে ওই চোখে। তাই এর কোটরে ঢোকা চোখের তারা একটুও কাঁপল না। সরল না। এমনকি সহজ কৌতূহলে মুখ দিয়ে বেরল না ঃ তুমি কেমন আছ?—

একভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে আদিটা কালবোশেখির তাণ্ডব আঁকা পেত্তিপিসির চিত্রবিচিত্র মুখের চামড়া কী যেন ভাবনার নিশ্চিন্ত নিশ্চয়তে আস্তে আস্তে সরল হয়ে এল। বিবর্ণ ওষ্ঠে ঠোঁট মুটো উঠল এক আশ্চর্য মায়াময় হাসি। ঠাহর করে রোয়াকে থেকে

দেখে একঘাত বাড়িয়ে আপনজনের আহ্বানে ডাক দিল। ইঙ্গিতে আয়।

ওর হাবভাব দেখে ঠাকুমা অবাক। মুখ ফিরিয়ে নেতিপিসির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ কে লা?

ঠাকুমার প্রশ্নে নয়। অনেকদিনের অপেক্ষার পরেও নীলাঞ্জনকে ফিরতে পাওয়া গর্বে নেতি পিসির মুখের সেই অমায়িক হাসি এখন আরও উজ্জ্বল। বীরে মুখপোড়া এয়েছে গো। ——— ওরু _ কতদিন পরে যে এলি _। আয় ভাই। বোস। মা-বাপ সব ভালতো?

নেতিপিসি ঠিক আগের মতন। তেমনই আন্তরিক। স্নেহপূর্ণ। ঠাকুমার প্রিয় নাতি-নাতনীরা আজ আর কেউ কাছে নেই। শহরের দিকে চলে গেছে উন্নতির সিঁড়ি তৈরি করতে। তুলেও কেউ আসে না। খোঁজও নেয় না হয়তো। পালে-পার্বণে কিংবা বিয়ে-থৈ'তেয়ের কখনও কখনও বাড়ির সব একত্রিত হয়ে জেঠা আবার বাড়ুনবাড়ি গমগম করে ওঠে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। মানুষের হাসি-কথা-কোলাহলে গ্রাস পায় আগের মতন। ঠাকুমা আবার পুরনো দিনের মতন গয়নার শাড়ি পরে ঘর পাড়া বেড়াবাড়ি করে এ-মহল ও-মহলে।

কিন্তু আগের দিনের মতন প্রিয় নাতি নাতনীদের আর কাছে পায় না। শহরের সফিসটিকেটেড শিক্ষা ওদের গেঁয়ো ঠাকুমাকে আর কোনভাবেই আপন করতে পারে না। হয়তো আপন হতেও দেয় না। নির্দিষ্ট ব্যবধানে সরে থাকে সফিসটিকেশনের তকমা ঘুলে পড়বার ভয় নিয়ে।

একার আপনজনের আকর্ষণিকে ভালবাসা না পাবার সেই দুঃখতায় হয়তো নীলাঞ্জনের অনেকদিন পরে আজকের এই উপস্থিতি ঠাকুমার মনের গোপনে সামান্য হলেও একটু ঢেউ তুলল। তারই আবেগে জীবনে এই প্রথম ওর দিকে সহজ চোখে চেয়ে বোকলা মুখের মুড়ি মেখিয়ে হেসে ফেলল ঃ তাই নাকি? _ আমাদের নীলু_। আয় আয়। বোস।

৪

একটা অদ্ভুত ঘোরে সারাটা বিকেল নীলাঞ্জন একা একা ঘুরে বেড়াল। শীতলার থান _। গাজন তলা _। শ্মশানঘাট _। নদীর ধারের বুড়ো বট _। আমন তলা _। পনেরো বছর আগের ফেলে যাওয়া গায়ের চিহ্ন খুঁজতে খুঁজতে সে আনমনে ঘুরে বেড়াল সারাটা দিন। তারপর বিকেল ঘুরিয়ে সন্ধের আগের ছায়া নদীর থেকে নিয়ে আসতেই তাকে ডাকে পাখ-পাখালির বিচিত্র বিচিত্র শব্দে ভরে দিল।

আলো-আঁধারির সন্ধিক্ষণে নদীর স্থির জলে এখন ঝুঁকে পড়া বটের ছায়া। আর অন্ধকারের ফাঁদ আজা। পুবের আকাশে চাঁদ উঠে পড়েছে থালার মতন। আজ আজে তার গায়ে লাগছে চিকন রাতপরী ঝিলিক। একটু পরেই সেই রূপোলী ঝিলিক ছড়িয়ে পড়বে নদীর জলে। ধু-ধু মাঠের সীমানায়। গাছ-গাছালির মাথায় মাথায়।

ধু ধু চাঁদা হাওয়ায় নীলাঞ্জনের বুকের ভেতর একে আশ্চর্য শীতলতা। অনেক-অনেকদিনের ঘুমে থাকা একটা বোধ যেন আজ ঘরের ঝিলিমে ঝিলিমে থাকা স্মৃতির মতন _. গাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে হালকা কী এক কিসু ব্যথা অজানা কারণে যেন বা যায়। _ এইসব টুকরো স্মৃতি _। স্মৃতির ঘুমপাড়া _। বুকের গোপনে রাখা অজানা বোধের যেন অনুভূতি জাগে _। কীসের অভাবে _। এতদিন পরে এইভাবে ফিরে আসা শুধু কি শেকড়ের টানে _? আর কিছু নয় _? আরও কি গভীর কোন গোপন প্রত্যাশায় _?

পায়ে পায়ে সোন্ধ্যমলনা ঘোলা হয়ে যায় বাড়ির দরজায়। উৎকণ্ঠায় দুই বুড়ি ছটপটে। অনেকদিনের না থাকায় জায়গাটা অজানাই হয়ে গেছে ওদের ধারণায়। তাছাড়া নীলাঞ্জন এখন শহরের মানুষ। গাঁয়ের রাস্তা-ঘাট ওর কাছে এখন আর স্পষ্ট নয়। এখানের সব সাপ আর আঁকবাঁকের মোহাম রাস্তায় পদে পদে ঘাপ্টা লুকানো মৃত্যুর ফাঁদ। ছড়ানো কাঁটাও থাকে। আবার মনের আয়নে নিয়ে অন্ধকার পড়ে থাকে অন্ধকারে রাস্তার ওপরে। তাই শুধু চিন্তা নয়। উৎকণ্ঠাও এসে ভর করে মনে।

নিরাপদ নীলাঞ্জনকে দেখে ওরা স্বস্তি পেল। নিশ্চিন্তও। বহু বছরের পরে মুক্তির সঙ্গে ভেলা, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, পলাবুটি আর তেজানো ছোলা পেয়ে নীলাঞ্জনের বুকের ভেতর উত্তাল পুরনো স্মৃতি। এসব ওর খুব প্রিয়। নেতিপিসি জানে। মনেও রেখেছে।

ঠাকুমার মনটাও খুশিখুশি। আসলে নেতি পিসি ছাড়া এখন আর কেউ নেই কথা বলার মতন। কেউ কেউ আসা যাওয়ায় থাকে, আসা আসিটা কালবৈশাখীর তারাবাজি পারঘাটার মতন। এক বৃক্ষের অন্তরে সময় কাটানোকে আত্মার অন্তরা বলেই মনে করে আজ নীলাঞ্জন আসায় ঠাকুমার সেই একঘেয়ে জীবনে মুঠো মুঠো কথা কলার মতন ফুরসত এসেছে।

খাওয়া সেরে নীলাঞ্জন তিনতলার ঘরে চলে গেল। অনেক দিন পরে পাওয়া এই সন্ধে। তাকে উপলব্ধি করতে একলাই কাটাবে খানিকক্ষণ। ইচ্ছাটা অবেলালানি। আগে জানিসের ঘরে ঘরে ঘুড় টবে ঘুমের গান লাগানো থাকত। এখন বেশির ভাগই ভাঙা। দু একটা আবভাঙা টবে ঘুলো জল হয়ে আছে।

পশ্চিমের জেঁতুল গাছটা আর নেই। তার পাশের তাল গাছটাও। আগে চাঁদের আলো জেঁতুল গাছের ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ত ছাদের ওপর। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তন্ময় হয়ে বসে থাকত নীলাঞ্জন। এখন সেখানে কয়া কেন ঘর তিনতলা বাড়ি। তাই আর চাঁদের আলো নেই। টিলেকোঠার ঘর থেকে ইলেকট্রিক আলো ঠিকরে এসে পড়েছে ছাদের ওপর। এখন আর প্রকৃতি-জীবনের সহজে মায়ামায় আবেশ-ছায়া নয়। নগর-সভ্যতার তীব্র আলো গ্রাস করে নিয়েছে তার অধিকার।

পায়ের খসখস শব্দে চমকে ও সিঁড়ির দিকে চাইল। নেতিপিসি। এতবয়স তবু এখনও শক্ত। তিনতলায় সিঁড়ি ভেঙে দরজার হেলান দিয়ে দাঁড়ানোর ফাঁক সামলাচ্ছে। তার দিকে এগোতে এগোতে নীলাঞ্জন হাসল ঃ কিগো পিসি, কী খবর? কলকাতার গল্প শুনবে নাকি?

নীলাঞ্জনের হাসির উত্তরে নেতিপিসি ওরকম হাসল। কেমন কেন মনে। কীসের যেন ব্যথায় ছেয়ে ছেয়ে কাল ঃ অনেকদিন ধরে তোর জন্যে রাখা একটা পছন্দের জিনিস ধরে বেড়াচ্ছি তাই। নিয়ে আসার ফুরসত দে।

নীলাঞ্জন অবাক। মনের ভেতর ওর প্রশ্নের ঝড়। কী এমন জিনিস নেতিপিসি ওর জন্যে পছন্দের রেখেছে। কী _ রেখেছেই বা কে _?

সাদা থানের আঁচলের গিট খুলতে খুলতে নেতিপিসি চোখ তুলে সোজা চাইল ওর দিকে সংকোচহীন মনের ভরসা একটা মেটে

বাড়িও আর আস্ত রইল না। মন্ত্রণার আমল মস্ত বাড়িটাও না। জলটল সরে গেলে একদিন অরিত্রা বলে মেয়েটা এসে বলল কি - পিসি, আমিও এখন কলকাতায় পড়তে যাচ্ছি। যদি কোনদিন নীলুদা আসে -তো এই চিঠিটা তাকে দিয়ে দিও। আর বোলো-আমি যা করেছি, নিরুপায় হয়েই করেছি। আমাকে যেন ভুল না বোঝে।

নীলাঞ্জন এতটা ভাবেনি। এখানে ফিরে এসে অরিত্রার কী হল তা জানতে ওর খুব ইচ্ছেও হয়েছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি। ফিরেদে ঘুরতে বেরিয়ে বারবার মন্ত্রণিলার দিকে মনটানতে চাইলেও বেদনাময় অতিমানে জোর করে নিজেকে থামিয়ে নিয়েছে। অপেক্ষা করেছে ঠাকুমার যদি কিছু নিজে থেকে বলে। কিন্তু এখন নেতিপিসির কাছে অরিত্রার রেখে যাওয়া চিঠিটা পেয়ে ও একদম থমকে গেল। ইচ্ছে-অনিচ্ছের দোলায়মান মনে চিঠিটা খুলে পাশের বাড়ি থেকে ফিকে আসা আলোয় মেলে ধরল সেটা।

অনেকদিন আগের হাতমাখা কাগজে সবুজের গ্রামে ফিরে অরিত্রার অক্ষরে শুধু কটা কথা বুকের পাঁজরে যা দিয়ে দিয়ে ওকে অস্থির করে তুলল — যদি ইচ্ছে হয় আমাকে খুঁজে নিও।— আমি অপেক্ষা করব —

.—— অপেক্ষা করব — অপেক্ষা করব ..... অরিত্রার চিঠির অক্ষরগুলো যেন ব্রহ্মনগরে সমস্ত চরাচর কাঁপিয়ে নিচ্ছে। —— এখন নীলাঞ্জন বুঝতে পারছে পুরনো সবকিছু পেছনে এখনও যেন ওর মনে এত অপূর্ণতার হাহাকার। আসলে অরিত্রাই যে সেই হারানোর নিটোল পৃথিবী।

সবচেয়ো বড়ের কৈশোরে সে পরিচয় নয়, আরও কী এক দুর্বোধ্য বাঁধনে বেঁধেছিল অরিত্রাকে। অন্নেষণী অরিত্রাও তার অপরিণত মনের অর্ঘ সাজিয়েছিল নীলাঞ্জনের উদ্দেশ্যে। তাই —। তাই আরও প্রতিটি পল অনুপলে ওর হা-হা বুকের শূন্যতায় অরিত্রার অস্পষ্ট মুখ।—

নেতিপিসি নেই। নীলাঞ্জনকে একলা থাকার সুযোগ দিয়ে নিজে চলে গেছে। সে নীলাঞ্জনকে ফেলে। পনেরো বছর ধরে যে অরিত্রাকে বুকে ধরে সে বেড়িয়েছে-নীলাঞ্জন তার মর্যাদা দেবে। অরিত্রা কলকাতায়। সে অপেক্ষা করবে। একদিন হয়তো তার সঙ্গে নীলাঞ্জনের দেখা হয়ে যাবে। হয়তো অনেক-অনেকদিনের জমে থাকা গ্লানি আর বেদনার অভিমান ভালবাসার ঢেউয়ে ধুয়ে যাবে। —

হয়তো অরিত্রা সবকে খুঁজে পাবে না নীলাঞ্জনকে। অপেক্ষায় থেকে থেকে ক্লান্ত হবে। ক্ষত হবে। অনুশোচনার আগুনে দিনে দিনে পুড়ে ছিন্ন হবে। শান্ত হবে। একনিষ্ঠ হবে আরও গভীরতর অনুসন্ধানে। ভালবাসার প্রসাদ আত্মনিবেদনে চিনতে শিখবে আপন-জনের পরখনি। ——

▲▲▲

West Bengal Financial Corporation

Are you looking for financial assistance for your industrial venture within West Bengal? W.B.F.C. has the requisite package for you.

We extend financial assistance for setting up a new Industrial/Servicing Unit or Diversifying/ Modernising/ Expanding your existing unit. We cover entrepreneurs including rural artisans, unemployed youths, ex-servicemen, women entrepreneur, medical practitioners.

For more details please write or call at our District Branch Offices or Head Office at 12A, Netaji Subhas Road, Calcutta - 700 001.

Telephone :220-0055/3259/3084/4954
Fax :(91) (33) 220-1250

শ্রী সরস্বতী প্রেস কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

পরিচালিত
হলিডে হোম দীঘার
হোটেল ডেইজীতে

যোগাযোগ ঃ
সরস্বতী প্রেস লিঃ
১১, বি টি রোড
কলিকাতা ঃ ৭০০ ০৫৬
ফোন ঃ ৫৫৩-১১০৪

বিশ্বখ্যাত বালুচরী শাড়ির একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঃ

বিষ্ণুপুর বালুচরী ও রেশমজাত বস্ত্র শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

বালুচরী শাড়ি সহ সকল প্রকার রেশমজাত বস্ত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র ঃ
রঘুনাথসরোবর, বড়জোড়াতলা
পোঃ অঃ বিষ্ণুপুর
বাঁকুড়া

যাদবচন্দ্র পুঁই	রঞ্জিত কাঁড়ি	কড়িমাস হেঁস
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ (১৯৪৪-৯৪) উদ্‌যাপনের পথে

বিষ্ণুপুর কো-অপারেটিভ উইভার্স সোসাইটি লিঃ

সমিতির সভ্যদের উৎপাদিত শাড়ি, ধুতি, গামছা, পিলোকভার, বেডশিট, বেডকভার ইত্যাদিতে সরকারি ছাড় দেওয়া হয়।

বি. ব. ঃ বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত বালুচরী শাড়ির বিপুল সম্ভারে।

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র ঃ
মন্দিরতলা, বিষ্ণুপুর
শাখা ঃ চকবাজার, বিষ্ণুপুর
পোঃ অঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

সুধীরকুমার সেনাইত	নিবাস পাল	সুবলচন্দ্র মালাল
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আইশমালী লার্জ-সাইজড্ প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

এরুলী, নদীয়া

উক্ত সমবায় সমিতি থেকে স্বল্প সুদে সভ্যদের কৃষি ঋণ দেওয়া হয়। এবং ব্যাঙ্ক মূল্যে সার, কাপড় ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রয় করা হয়।

◆ বর্তমান সমিতির সঞ্চয়ী আমানত খোলার জন্য পরিচালকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। অত্র কিছুদিনের মধ্যে সঞ্চয়ী আমানত খোলা হইবে।

সততাই আমাদের মূলধন

কমল চক্রবর্তী	মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল	ওয়াজেদ আবদুল
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

প্রবন্ধ

বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়

ড. নজরুল ইসলাম

মুসলমান বাঙালীরা বা তাঁদের পূর্বপুরুষরা আরব-ইরান-তুরান-আফগানিস্তান থেকে আসেননি। তাঁদের পূর্বপুরুষরা সেনের হিন্দু-বৌদ্ধদের থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। মধ্যযুগে বাংলার সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে গেলে রাজানুগ্রহের আকর্ষণে, ইসলাম ধর্মের তুলনামূলকভাবে বেশি সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের টানে সুফীদের প্রচারে, এবং সর্বোপরি বর্ণহিন্দু প্রথার নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে বাংলার প্রায় অর্ধেক লোক মুসলমান হয়ে যান। রাজানুগ্রহ এবং উচ্চশ্রেণীর আশায় অভিজাত শ্রেণীর উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন অন্ত্যজ শ্রেণীর তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু বা বৌদ্ধ। হিন্দু-বৌদ্ধ আমল কালে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। মুসলমান হয়েও তাঁদের আর্থিক অবস্থার এমনকি জীবিকার কোন পরিবর্তন হয়নি। মুসলমান নবাব-সুবাদার-সুলতানরা তাঁদের অবস্থার উন্নতির জন্য স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা করেননি। বরং অভিজাত শ্রেণীর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে তাঁরা রফা করেছিলেন। নবাবের নিচে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদগুলিতে তাই হিন্দুদেরই সংখ্যা বেশি ছিল। অর্থমন্ত্রীর সমান দেওয়ান, তন-দেওয়ান, সাত-দেওয়ান, বক্সী প্রভৃতি সর্বোচ্চ পদের মধ্যে ষাটভাগই ছিলেন হিন্দুরা। আদায় ১৯ জন বড় বড় জমিদারের মধ্যে ১৮ জনই ছিলেন হিন্দু। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মহাজনী কারবারেও হিন্দুরা এগিয়ে ছিলেন। সুবার সব থেকে ধনী লোক ছিলেন জগৎ শেঠ, মহতাব চাঁদ, মুসলমান, বিশেষ করে মুসলমান বাঙালীদের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। তবে সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে ছিল বলে সেনাবাহিনী এবং বিচার বিভাগে বেশ কিছু মুসলমান উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। অবশ্য তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অবাঙালী। বাংলার নবাবরাও ছিলেন অবাঙালী।

বাংলার ইংরেজদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে থাকা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ইংরেজ রাজকর্মচারিদের দেওয়ানী-সেরেস্তাদি-বেনিয়ানী-মুৎসুদ্দিগিরী করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করলেন। এঁরা পরিচিত হলেন নব ধনিক শ্রেণী রূপে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সূর্যাস্ত আইনের সুযোগ নিয়ে নীলামে জমিদারী কিনে প্রতিষ্ঠা করলেন নব জমিদার শ্রেণীর। ১৮৩৭ সালে ফারসীর স্থলে ইংরেজী অফিস-আদালতের ভাষা হলে এঁরা সনদধারী চাকুরি এবং ওকালতির মত স্বাধীন পেশায় একচেটে অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। এই যে ইংরেজ রাজত্বে নব ধনিক, নব জমিদার এবং নব সনদধারী চাকুরে —স্বাধীন পেশাজীবীদের যে অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠল তাতে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমানরা ছিলেন অনুপস্থিত।

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে তাঁদের মনে জাতীয়তাবাদের একটা ভাব এসেছিল। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের জন্য ইংরেজদের বিরোধিতা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যার জন্য ইংরেজরা তাঁদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। নিজেদের সাম্রাজ্যের সমর্থক করার জন্য ইংরেজরা তাঁদের বুঝিয়েছিলেন যে, মুসলমান শাসনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতি সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ইংরেজরা তাঁদের সেই অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। এই তত্ত্ব প্রচার করার জন্য তাঁরা তাড়াটে লেখকদের সাহায্যে 'হিস্ট্রি অফ সিখস,' 'হিস্ট্রি অফ মারাঠাজ', 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অফ রাজস্থান' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করলেন। শিখ-মোগল, মারাঠা-মোগল এবং রাজপুত-মোগল প্রভৃতি শতকে-শতকে বিরোধকে তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ রূপে উপস্থাপিত করলেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে রাজার লড়াইকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের লড়াইরূপে দেখালেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ইংরেজদের জালে পা দিলেন। এই সব কাহিনী থেকে উপাদান গ্রহণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীর প্রসার করলেন। ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবি, অমৃতলাল-জ্যোতিরিন্দ্র-গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাট্যকার এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিকের সাহিত্য এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। এগুলির মাধ্যমে একদিকে যেমন হিন্দুদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগল, অন্যদিকে তেমনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য জন্মাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত মজবুত হল। দেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি হল।

তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মত সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা আগে থেকেই খারাপ ছিল। ইংরেজ রাজত্বে সেনাবাহিনীর, বিচার বিভাগের এবং রাজস্ব বিভাগের কাজ থেকে বঞ্চিত হয়ে, নিষ্কর জমি হারিয়ে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদেরও (যাঁদের বড় অংশ ছিলেন অবাঙালী) আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। তারা ইংরেজদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার দুঃখ ভোলা করে ফেলে লাগল। তাঁদের ভুল ধারণা হল যে, সত্যিকার ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য তাঁদের এই দুর্গতি। ফলে অকৃত্রিম ইসলামে প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁরা ওহাবী, ফরাজী আন্দোলন করতে লাগলেন। এতে মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগল, কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে তাঁরা শেষ করতে

পারলেন না। তখন তাঁরা বুঝলেন যে, ইংরেজ রাজত্ব দূর করা অত সহজে হবে না। সুতরাং হিন্দু সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে হলে তাঁদের ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেই করতে হবে তাছাড়া উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দুদের মত ইংরেজ শাসকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চাইলেন।

ততদিনে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ মুসলমানদের মধ্যেও একটা শিক্ষিত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে। কলেজ-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের থেকে যে সব মুসলমান যুবক পাশ করে বেরিয়েছিলেন তাঁরা দেখছিলেন যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এ ব্যাপারে অনেক এগিয়ে আছেন। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁরা এঁটে উঠতে পারছিলেন না। ফলে নিজেদের জন্য এঁরা কোটার অর্থাৎ সংরক্ষণের দাবি করছিলেন। ইংরেজরাও তাঁদের এ দাবিকে মূল্য দিয়েছিলেন। কারণ প্রথমত শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তেজনায় যে সুযোগ-সুবিধা দাবি করছিলেন তা মেটালে রাজত্ব আর তত ভারসাম্যহীন থাকত না। অন্যদিকে সদ্য শিক্ষিত মুসলমানরা সামান্য কোটা পেলেই সন্তুষ্ট। ফলে ১৮৭০ থেকে ইংরেজরা হিন্দু নেতাদের ছেড়ে দিয়ে মুসলমান নেতাদের তোষণ করতে লাগলেন। মুসলমানদের তাঁরা বোঝালেন যে, দেশ স্বাধীন হলে গণতন্ত্রের মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসন কায়েম হবে। মুসলমানদের সমূহ সর্বনাশ হবে। তা যাতে না হতে পারে তার জন্য ইংরেজ রাজত্ব বজায় রাখা দরকার। তাছাড়া লেখকরা আরবি মাঠে নেমে পড়লেন, 'বি ইন্ডিয়ান মুসলমান'-এর মত বই লেখা হল। মুসলমানদের হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা গেল। মুসলমানরা ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, নিজেদের সুবিধার জন্য আবেদন নিবেদনের পথ বেছে নিল। ফলে কংগ্রেস থেকে অধিকাংশ মুসলমান দূরে থাকল।

বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী-স্বদেশি-স্বদেশী-সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের আরও অবনতি হল। ১৯০৬ সালে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়। পরের বছর স্থাপিত হল হিন্দু সভা, যার পরবর্তী নাম হিন্দু মহাসভা। ১৯২৫ সালে স্থাপিত হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ। এই সংগঠনগুলি সমগ্র ভারতবাসীর জন্য চিন্তাভাবনা না করে শুধু নিজেদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করতে লাগল। ফলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ আরও বৃদ্ধি পেল। অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের পর এর রূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করল।

উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই হিন্দু ভারতীয়কে সরকারের কাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত করা হচ্ছিল। হোটলাটের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয় সদস্য নেওয়া হচ্ছিল। আস্তে আস্তে আইন প্রণয়নের জন্য বিধানসভারও সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু পৃথক নির্বাচন প্রথার জন্য তার ফলেও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারেই মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯১৯-এর মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারেও তা বজায় ছিল। ১৯৩৫-এর ভারত শাসনেও এর ব্যত্যয় হয়নি। এই আইনে ২৫০ আসনের বিধান-সভায় মুসলমানদের জন্য ১১৭টি আসন সংরক্ষণকরণে এবং সাধারণ আসনের সংখ্যা ৪৮টি মাত্র হলে হিন্দু-মুসলমান দুয়ে ওঠে।

অবিভক্ত বাংলার মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই তাঁদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে। সংরক্ষণের প্রয়োজন হত কেন? কারণ তখন ভোটার হতে গেলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিতে হত। অধিকাংশে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল। ফলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, মুসলমান ভোটারদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ফলে মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ অঞ্চলেও তাদের জেতার কোনরকম সম্ভাবনা ছিল না। সেজন্যই অর্থাৎ সার্বজনীন ভোটাধিকার না থাকার ফলেই মুসলমানরা সংরক্ষণ দাবি করতেন। ভারতের সর্বসম্মত ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য গঠিত নেহরু কমিটির রিপোর্টে পাঞ্জাব ও বাংলাতে মুসলমানদের জন্য কোন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। মুসলিম লীগ তখনি সার্বজনীন ভোটাধিকার চালু না হয় বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যার অনুপাতে আসন দাবি করেছিল। হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি দলগুলি এ দাবি মানেনি। ঐক্য হতে পারেনি।

১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর, কংগ্রেস-কৃষক প্রজা দলের আলোচনা ব্যর্থ হলে মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভা গঠন করে। এরপর ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রায় দশ বছর ধরে সমানে হিন্দুদিনের বিরতি ছাড়া বাংলায় মুসলিম লিগের শাসনই বজায় ছিল। মুসলিম লিগ ছিল সাম্প্রদায়িক দল। এই দলের শাসনের প্রতি অভিজাত হিন্দুদের সন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ ছিল না। বরং দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকার ফলে তাদের মনে হয়েছিল যে অবিভক্ত বাংলার তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। অবিভক্ত বাংলা পাকিস্তানে যাক, স্বাধীন সার্বভৌম হোক আর ভারতেই আসুক মোটামুটি তখনকার অবস্থায় বজায় থাকবে। সুতরাং তাদের ক্ষমতা দখল করতে হলে হিন্দু প্রধান অংশকে পৃথক রাজ্য করতে হবে। এইজন্য হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা বাংলা ভেঙে বাংলার হিন্দুদের জন্য পৃথক অবাসভূমির জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বাংলা বিভক্ত হয়ে ভারতের অন্তরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং পাকিস্তানের অন্তরাজ্য পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে দিল।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কবল মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলে সেখানে সেকুলার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু মুজিবুর রহমানের হত্যার পর সামরিক শাসনে সেকুলার শাসনের অবসান ঘটিয়ে আবার সেখানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভারতের অন্তরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে সেকুলার শাসন বজায় আছে। তবে সঙ্ঘ পরিবার চোখ চড়িয়ে যাচ্ছে। চড়িয়ে যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার। সম্প্রতি সঙ্ঘ পরিবার কর্তৃক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে মোটা-মুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গ শান্ত থাকলেও কলকাতার কয়েকটি জায়গায় ছোটখাট গণ্ডগোল হয়েছিল। প্রশাসনের তৎপরতায় তা অচিরেই নিয়ন্ত্রণে আসে।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, দেশের এবং দেশবাসীর আমাদের স্বার্থে এখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে

প্রতিষ্ঠা সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া দরকার। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করা দরকার। ইতিহাসের আলোকে, বর্তমান সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। যেমন —

(১) অভিজাত শ্রেণীর উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের ঔদাসিক মনোভাব,

(২) কিছু সংখ্যক হিন্দুর মিলুহানকে শুধু হিন্দুদের দেশ ভাবা,

(৩) মুসলমানদের প্রতি কিছু হিন্দুর ঘৃণাত্মক শত্রুতা,

(৪) মুসলমানদের সম্পর্কে হিন্দুদের কিছু ভ্রান্ত ধারণা,

(৫) অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের ইসলামকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম ভাবা,

(৬) কিছু মুসলমানের দেশের সঙ্গে একাত্ম বোধ না করা,

(৭) মুসলমানদের হিন্দুদের ওপর আস্থা না রেখে প্রতিপক্ষ ভাবা,

(৮) মুসলমানদের সবরকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে ভাবা,

(৯) পুলিশ ও প্রশাসন হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে ভাবা,

(১০) হিন্দুদের সম্পর্কে মুসলমানদের কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা,

(১১) ধর্মাচরণে ও খাদ্যাভ্যাসে বৈশাদৃশ্য,

(১২) গো-হত্যা, মসজিদের সামনে বাদ্যন্ত্র এবং অন্যান্য,

(১৩) আজান, ঘন্টাধ্বনি এবং রাস্তাঘাটে ধর্মস্থান নির্মাণ,

(১৪) সেকুলার অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় করে তোলা,

(১৫) সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা,

(১৬) অবাঙালী নেতৃত্ব ও অবাঙালী স্বার্থ,

(১৭) রাজনৈতিক দলগুলির সুবিধাবাদী নীতি এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতি,

(১৮) বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থপরতা,

(১৯) সংরক্ষণ,

(২০) সেকুলারিজম্ সম্পর্কে ভ্রান্ত এবং পরস্পরবিরোধী ধারণা,

(২১) অভিন্ন দেওয়ানি সম্পর্কে বিভ্রান্তি, এবং

(২২) মৌলবাদীদের উত্থান এবং মূল্যবোধের অভাব।

এখানে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ভাল করতে হলে এই কারণগুলি দূর করতে হবে। অর্থাৎ যেখানে ভুল সংস্কার আছে তা দূর করতে হবে। যেখানে যা বৈশাদৃশ্য আছে তার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করতে হবে। সুবিধাবাদী, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে মৌলবাদীদের রমরমা দূর করতে হবে। মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সর্বোপরি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি সাধারণ উত্তরাধিকারে জোর দিতে হবে। বাংলার বাঙালীদের নামে ব্যবসা-বাণিজ্য সহ সর্বত্র বাঙালী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তা যদি করতে পারি তাহলে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ভাল হতে বাধ্য।

▲▲▲

দি বিষ্ণুপুর টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

(স্থাপিত ঃ ১৯৩০, ফোন ঃ বিষ্ণুপুর ৫২০৪১, জেলা ঃ বাঁকুড়া)

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরবাসীর সেবায় সতত নিয়োজিত

আমাদের বৈশিষ্ট্য ঃ

☐ অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ১% বেশি সুদ ☐ ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্যান্য বিষয়, শিল্প, দুটির শিল্প, লাঘারি ওভারড্রাফ্ট, ঋণভিত্তিক ব্যবসা প্রভৃতিতে ঋণদান ☐ মৈনিক জমা প্রকল্প, বাড়ি বাড়ি প্রতিনিধি পেশ মাফতে ☐ স্বর্ণ বন্ধকি ঋণ প্রদান ☐ গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান ☐ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সান্ধ্য বিভাগ প্রচলন ☐ আমানত বিমা কর্তৃক আমানত সুরক্ষা ☐ উন্নত পরিষেবা

সমবায় আন্দোলন জিন্দাবাদ

অশোককুমার ওঝা
সভাপতি

শঙ্করনারায়ণ মণ্ডল
সম্পাদক

সততা , নিষ্ঠা ও ঐক্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে
কৃষক, ক্ষুদ্রশিল্পী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও কর্মচারিগণের সাথে
হাত মিলিয়ে গ্রামীণ উন্নতির কাজে দুই দশকেরও
বেশি সময় নিরন্তর নিযুক্ত
বাঁকুড়া জেলার সর্ববৃহৎ প্যাকস্

ময়নাপুর অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ময়নাপুর বাঁকুড়া

ধূমপায়ী জনগণের প্রতি আবেদন ঃ

নেপালী ভামাক, সম্বলপুরের পাতা ও সুদক্ষ কারিগর
দলসমূহের দ্বারা প্রস্তুত
খেয়ে ও খাইয়ে আরাম

৫২২ নং ফটো বিড়ি

বাঁকুড়া ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে সুনামের সাথে
ধূমপায়ী জনগণকে তৃপ্তি দিয়ে আসছে।

বাঁকুড়া জেলা বিড়ি কারিগর সমবায় সমিতি

কেরানীবাঁধ, বাঁকুড়া
ফোন নং ঃ ৫০৬৮৮

বাঁকুড়া জেলার কৃষক ভাইদের সেবায় সতত নিয়োজিত
একমাত্র প্রাচীনতম সমবায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দাদন প্রতিষ্ঠান

বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ রামপুর, মনোহরতলা, বাঁকুড়া
শাখা অফিস ঃ ময়রাপুকুর, বিষ্ণুপুর

অল্প সুদে পাম্প চাষ, নিবিড় মৎস্য চাষ, পাম্পসেট খরিদ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের জন্য পাম্প সেট ও
পাওয়ার টিলার, পাওয়ার টিলার ট্রলি প্রভৃতি খরিদ ছাড়াও নন ফার্ম এবং গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে ঋণ দাদন করা হয়।
এই ব্যাঙ্কে সকারী, স্থায়ী, রেকারিং, আমানত, ক্যাশ সার্টিফিকেট প্রকল্প চালু আছে এবং
যেকোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে বেশি সুদ দেওয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি অনুদানেরও ব্যবস্থা আছে।

অজিতকুমার চক্রবর্তী
সভাপতি

করুণাকান্ত সেন
মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক

ক্রীড়াজগৎ

বিশ্বকাপ ক্রিকেট

অর্ণব ঘোষ

বড় ক্রিকেট মানে আমরা এতদিন বুঝতাম পাঁচদিনের টেস্ট ক্রিকেট — পাঁচদিন ধরে একটা চলুইচলুতির পরিবেশে — নতুন জিজ্ঞাইনের হালফ্যাশানের শার্ট-প্যান্টওয়ার কম্বিনেশন পরে ফ্যাশান প্যারেড-উদ্বোধনা-পরা-বিবাদিয়া। তার মধ্যে একটু একটু খেলা দেখা। কিন্তু এখন ক্রিকেট বলতে এই ছবিটা অনেকটাই ঘোঁয়াশা হয়ে গেছে। ভোট, কম্পুটার, স্যাটেলাইট-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ওই ঘুমপাড়ানি ক্রিকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে ফোরফৌড়ের মত পুরোপুরি ফাস্ট-প্যাকড্ উত্তেজনার টানটান একদিনের ক্রিকেট। সময়ের পরিধিও পালটেছে। আগে ছিল সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকেল ৪-৩০ মিঃ অবধি — তাও কালে এখন ফ্লাডলাইটে ঝুটিনের আলোয় দিন-রাত্রির ক্রিকেট। দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ১০ টা।

১৮৬৪ সালে হাত ঘুরিয়ে বলিং প্রথম ওভার আর্ম বল করা দেওয়া শুরু হল তখন থেকে প্রায় একশ বছর ক্রিকেট এক ভাবেই খেলা হয়ে এসেছে।

কিন্তু এই পরিবর্তনটা এলো কেন? পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকেই পাঁচদিনের প্রথম শ্রেণীর খেলা বা পাঁচ দিনের টেস্ট ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছিল। ভারত উপমহাদেশে — ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার তখনও এটা বোঝা যায়নি, কারণ টিভির মাধ্যমে খেলা দেখা তখনও সুদূরের জিনিস ছিল। কিন্তু পশ্চিম দুনিয়ার ও অস্ট্রেলিয়ার এটা বোঝা যাচ্ছিল। পাঁচ দিনের খেলার ক্রমহ্রাসমান দর্শক সংখ্যা দেখে আয়োজকরা পথে পড়লেন এবং কি করে এর জনপ্রিয়তা ধরে রাখা যায়, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। ক্রমে একটা রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল, একদিনের সীমিত ওভারের খেলা এবং প্রথম ক্রিকেট কাপ অনুষ্ঠিত হল ১৯৬০ সালে। ওই বছরকেই ধরা হয় আধুনিক সীমিত ওভারের ক্রিকেটের শুরু বলে।

পাঁচদিনের ক্রিকেটে দুই পক্ষের মুটি করে মোট চারটি ইনিংসে খেলার পর জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। এই পাঁচদিনে চারটি ইনিংস সম্পন্ন না হলে খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। এখানে ক'ওভার বল করা হবে তার ওপর কোন বিধিনিষেধ থাকে না। অর্থাৎ কোন অধিনায়ক বোলারকে যত ইচ্ছে বল করতে পাঠাবেন সেই মতের অধিনায়ক। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে তা হয় না। এই ধরনের ক্রিকেট খেলায় একটি করে ইনিংসে খেলা হয়, অর্থাৎ প্রতিটি দল একবার করে ব্যাট করার সুযোগ পায় এবং বল করার ওভার সংখ্যাও বেঁধে দেওয়া হয়। যার জন্য একদিন দিনের ক্রিকেটের অপর একটি নাম সীমিত ওভারের ক্রিকেট। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাধারণত পঞ্চাশ অথবা ষাট ওভারের খেলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে দল প্রথম ব্যাট করে যত সংখ্যক রান তুলল তার উত্তরে বিপক্ষী পক্ষ সেই রান যদি ওই সীমিত ওভারের মধ্যে তুলে ফেলতে পারে তাহলে বিপক্ষী পক্ষ জিতে যাবে, আর যদি না পারে তাহলে প্রথম পক্ষ বিজয়ী বলে ঘোষিত হয়। একদিনের খেলায় সমতাল খাকা বা ড্র হয় না বা অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয় না। পঞ্চাশ ওভারের সীমিত খেলায় একজন বোলার দশ ওভারের বেশি বল করেন না। ষাট ওভারের খেলায় একজন বোলার হাত ঘোরাতে পারেন ১২ ওভার অব্দি।

জীবন যাত্রার পরিবর্তন, সময়ের অনুকূলতা এবং তাৎক্ষণিক জয়-পরাজয়ের নির্যাস এই একদিনের খেলাকে জনপ্রিয় করে তুলল। যদিও ক্রিকেট খেলায় পৌঢ়া তান্ত্রিক বিশুদ্ধবাদীরা এই ধরনের প্রায় ফাস্টফুড ধর্মিতা খেলাকে কখনই মন থেকে গ্রহণ করতে পারেননি কারণ এতে ক্রিকেটের স্বাভাবিকতার নিয়ম সব সময় মানা হয় না, শুধু এই খেলাই লোক টানতে লাগল এবং আয়োজক সংস্থা অনায়াসেই স্পনসর পেতে লাগলেন। অর্থাৎ সমস্ত প্রতিযোগিতা পরিচালনের ব্যয়ভার বহনের একটা বা একাধিক সংস্থা পেয়ে গেলেন। টিভির আগমনে সেটার আয়ও বেড়ে গেল। কারণ মাঠে স্পনসরের বিজ্ঞাপন টিভির পর্দাতে প্রচুর প্রচার পেল। এই নতুন ধরনের ক্রিকেটের জন্য এর উপযোগী নিয়ম প্রণয়ন হল এবং এর জন্য ভিন্ন প্রশাসকমণ্ডলী ও কৌশলের উদ্ভব হল। এখন প্রতিটি দেশের ক্রিকেটের ঘরোয়া-পরিধিতে টেস্ট ম্যাচ ও একদিনের টুর্নামেন্টকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এখন একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, পাঁচদিনের টেস্ট বাদ দিয়ে শুধু সীমিত ওভারের ক্রিকেটের জন্য ত্রয়ম্পটি প্রণালন বা তিন-চার দেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আন্তর্জাতিক সীমিত ওভারের প্রতিযোগিতার আয়োজন — এতে স্পনসর পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর, আয়োজক দেশ, প্রতিযোগী দেশ ও ক্রিকেটারদের অর্থাগমও হচ্ছে বেশ।

প্রথম সীমিত ওভার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার শুরু হয় ১৯৬০ সালে — জিলেট কাপ ক্রিকেট। ইংল্যান্ডের দুই কাউন্টি সাসেক্স ও ইয়র্কশায়ারের মধ্যে খেলা হয় এবং সাসেক্সের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার, যে ইলিংওয়ার্থ পরিচালিত ইয়র্কশায়ারকে পরাজিত করে। ১৯৬৩ সালে এই জিলেট কাপের খেলার মধ্য দিয়ে সীমিত ওভার ক্রিকেটের শুরু। তখন ইলিংওয়ার্থের বয়স একত্রিশ। এরপরে ১৯৬৯-এ যখন উনি লিসেস্টার শায়ারে কাউন্টির অধিনায়ক হলেন, তখন সীমিত ওভারের ক্রিকেটে উনি কেন ফর্ম করে ফেলেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, তখনও সীমিত ওভারের ক্রিকেট যে পরবর্তী এক দশকের মধ্যে বিরাট হয়ে টেস্ট ক্রিকেটকে চ্যালেঞ্জ জানাবে সেটা ভাবা যায়নি।

কিন্তু কি পরিবেশে এবং কেন প্রথম আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেট খেলা হয়েছিল সেটা একটা মজার ব্যাপার। ১৯৭১ সালের নভেম্বরে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে প্রথম তিনদিনের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট খেলা বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড মুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। ইংল্যান্ড বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে একটি অতিরিক্ত টেস্ট খেলাতে উভয় পক্ষ রাজি হল আর ওই খেলার টিকিটকারীদের জন্য শেষ দিনে একটি চল্লিশ ওভারের একদিনের ক্রিকেটের আয়োজন করা হল। এই খেলায় ঠাট বলে এক ওভার পদ্ধ করা হয়েছিল।

এই ১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া চল্লিশ ওভারের খেলা

প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরের একদিনের ক্রিকেট। ইংলিশ খেলোয়াড়দের তবু এই ধরনের খেলার সঙ্গে পরিচয় ছিল কিন্তু অস্ট্রেলিয়ানদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। একটা ট্রফি খেলার আগে তৈরি হল এবং তখন কেউ যা ভাবতে পেরেছিল চারবছর পর প্রথম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে এবং তারপরে এই খেলা শতাব্দীর টেস্ট ক্রিকেটকে ম্লান করে দেবে।

এবং মজার ব্যাপার হল এই ধরনের খেলার অভিজ্ঞ মুরব্বান অধিনায়ক ইনিংসবার্থ থাকা সত্ত্বেও তার একটি একদিনের ক্রিকেট প্রথম অবতরণ করার সুযোগে ওই স্তরের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত হন। কিন্তু অবিজিত দিল লয়ির অস্ট্রেলিয়া মাত্রটি জিতে নেয় প্রায় ৫৬,০০০ দর্শকের অভ্যর্থনার মধ্যে।

এর পূর্বে ১৯৬৯ সালে ইংলন্ডে জনপ্রিয়তার শীর্ষ চড়িল ওভারের সীমিত ওভারের ক্রিকেট চালু হয়েছিল। খেলাটা হত রবিবার। এবং এই খেলাগুলি টিভিতে দেখান হত। জন প্রেয়ার লীগ খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। টিভির দর্শক ও মাঠের টিকিটপ্রার্থীদের আনন্দ দেবার জন্য আইনেরও কিছু রদবদল করা হয়েছিল এবং ওরেন্ট ইন্ডিজের স্যর গিলেরি কল্‌ট্রাভাইন টেস্ট ডেবিটার, স্যর গারি সোবার্স, ক্লেভি ট্রুয়াস, ক্লাইভ লয়েড, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পোলক ভ্রাতৃদ্বয়ের মত টেকন ব্যাটসম্যানদের ব্যাটের দাপটে রবিবারের এই ক্রিকেট খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। দশ হাজারেরও বেশি দর্শক প্রতি রবিবার মাঠে উপস্থিত থাকত এবং টিভিতে লক্ষ লক্ষ লোক খেলা দেখত। এর জনপ্রিয়তার জন্যেই, ১,০০,০০০ পাউন্ড দিয়ে প্রুডেন্সিয়াল কাপ চালু হল এবং ইংলন্ডের টেস্ট ও কাউন্টি বোর্ড সানন্দে লীগ বা রবিবারের লীগের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আশাবাদী হলেন।

ইংলন্ডের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডও এই একদিনের ক্রিকেট শুরু করল। কিন্তু অন্যান্য দেশে এই সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তখনও কি রকম গড়িমসি ভাব।

এরপরই দুটি ঘটনা একদিনের ক্রিকেটকে একেবারে বিশ্বের দরবারে এনে ফেলল। ১৯৭৫ সালে ইংলন্ডের প্রুডেন্সিয়াল এ্যাস্যুরেন্স নামে ইনিওরেন্স কোম্পানি প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেট আয়োজন করতে টি সি সি বি অর্থাৎ টাউন অ্যান্ড কাউন্টি ক্রিকেট বোর্ডকে সাহায্য করল এবং সমস্ত টুর্নামেন্টটি স্পনসর করল। ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেট পরিপূর্ণরূপে সফল হল। এরপর ১৯৭৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার এক বিরাট ব্যবসায়ী কেরি প্যাকার তার চ্যানেল নাইন শুরু করলেন। সমস্ত ক্রিকেট জগতে এক আলোড়ন পড়ে গেল। বিরাট বিরাট ক্রিকেটারদের প্রভূত অর্থ দিয়ে প্রভূত করে নিজের টিভি চ্যানেল নাইনে খেলা দেখাতে লাগলেন — টেস্ট ম্যাচ এবং একদিনের ক্রিকেট। ক্রিকেট এতদিন শুধু দিনের খেলা হত, উনি শুরু করলেন দিন-রাত্রির ক্রিকেট। পূর্বে ক্রিকেটাররা সাদা প্যান্ট সার্ট পরে খেলতেন, এখানে এক এক দেশের জন্য এক এক রং-এর সাজপোষাক চালু হল। ক্রিকেট সাধারণত লাল বলে খেলা হত, এখানে শুরু হল সাদা বল। মাঠে উইকেটের পিছনের পর্দা সরান কালো পর্দা — এই সব পরিবর্তন আনলেন। বহু বড়ি ক্রিকেটাররা কেরি প্যাকারের দলে নাম লেখালেন এবং তাঁদেরকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট ও তাদের নিজেদের দেশের সংস্থা বরখাস্ত করলেন। কিন্তু কেরি প্যাকার ও তাঁর দল নায়েকবাবা এবং প্রমাণ করলেন ক্রিকেট পুরোপুরি টেলিভিশনের খেলা।

প্যাকারকে থামানর জন্যই ১৯৭৯ সালে আই সি সি তিতীয় বিশ্ব প্রুডেন্সিয়াল কাপ ক্রিকেট শুরু করলেন ইংল্যান্ডে। কিন্তু সেই বছর সেপ্টেম্বরে প্যাকার চালু করল ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপ। খেলাটি হল অস্ট্রেলিয়া-ওরেন্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে, দল ছুই ক্রিকেটারদের নিয়ে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯-এর মধ্যে ওরেন্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান একদিনের ক্রিকেটের মধ্যে এসে পড়ল এবং নিজেদের দেশে বেশ কয়েকটা সীমিত ওভারের ম্যাচ খেলে ফেলল। সব থেকে দেরি করে শুরু করল ভারত ও শ্রীলঙ্কা — ১৯৮১-৮২ সালে। তবে আসরে নেমেই ভারত সাফল্যের চূড়ায়।

পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যাবে একদিনের ক্রিকেটের ক্রমজনপ্রিয়তা। ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্বকাপ পর্যন্ত মোটে পনেরোটি আন্তর্জাতিক খেলা হয়েছিল। ১৯৭১-৭৮-এ ছাব্বিশটি ও ১৯৮০ সালের পরে একদিন আন্তর্জাতিকের সংখ্যা টেস্ট ম্যাচের থেকে অনেক বেশি।

একদিনের ক্রিকেটের অভূতপূর্ব সাফল্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিচালকবর্গকে আরও বড় কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করল এবং ধীরে ধীরে বিশ্বকাপ ফুটবলের আদলে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের কথা ওদের মনে আলোড়িত হতে থাকল। টেস্ট ক্রিকেটের ওপর বিশ্ব প্রতিযোগিতা অবান্তর বলে পরিগণিত হল। টেস্ট ম্যাচের সংস্থা, প্রচুর সময় এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় — তার ওপর দর্শক আকর্ষণের অক্ষমতা — ওই বিশ্বকাপ ফলপ্রসূ হবে না বলে বিবেচিত হল। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতার বোঝা ছিলেছিল সীমিত ওভারের একদিনের ক্রিকেট এইসব সমস্যা ও বাধা জয় করতে পারবে। উপরন্তু ক্রিকেট কাপ (পরে কৌ ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি নামে পরিচিত). রবিবারের জন প্রেয়ার লীগ ও বেনসন এন্ড হেজেস কাপের প্রভূত সাফল্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিচালকবর্গ বুঝতে পারলেন একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে স্পনসর পেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না।

অবশেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা আয়োজনে মনস্থির করে ফেললেন। অর্থনৈতিক সাফল্যের ব্যাপারে সভ্যরা সবাই সন্দেহাতীত ছিলেন। কিন্তু এটাই প্রকৃত ক্রিকেট কি? জনপ্রিয়তার চাপে সে প্রশ্ন অবান্তর মনে হল।

টি সি সি বি (অর্থাৎ টাউন ক্রিকেট অ্যান্ড কাউন্টি বোর্ড)-র সঙ্গে প্রুডেন্সিয়াল ইনিওরেন্স কোম্পানি ১৯৭২ সাল থেকে এক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল যে ইংল্যান্ড ও ভ্রমণকারী বিদেশি দলের মধ্যে আয়োজিত সমস্ত একদিনের ম্যাচের স্পনসর হবে ওরা।

১৯৭৫-এর প্রথম বিশ্বকাপে প্রুডেন্সিয়াল কোম্পানি এক লক্ষ পাউন্ড দিয়েছিলেন। চ্যাম্পিয়ন ওরেন্ট ইন্ডিজ চার হাজার পাউন্ড পুরস্কার মূল্য পায়, রানার্স-আপ অস্ট্রেলিয়া দু'হাজার পাউন্ড ও দুই সেমিফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড প্রত্যেকে এক হাজার পাউন্ড পায়। টুর্নামেন্ট থেকে আয় হয়েছিল অবিশ্বাস্যভাবে ১৮৮৫১৮ পাউন্ড এবং ১১৭৮০৯ জন দর্শক সমস্ত টুর্নামেন্টটি দেখেছিল। স্পনসর, দর্শকবৃন্দ সর্বোপরি পরিচালকবর্গ এই সাফল্যে অভিভূত। বোঝা গেল, বিশ্বকাপ ক্রিকেট ওপুমায় ঢিকে গেল নয়, ঝাঁকিয়ে কলল।

১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য ভারতের কোন প্রস্তুতিই ছিল না। মোট আটটি দেশ, ওরেন্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড,

অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পূর্ব আফ্রিকা অংশ নিয়েছিল। পূর্ব আফ্রিকা ছাড়া ভারত তার গ্রুপের আর সবার কাছেই পরাজিত হয়েছিল। প্রতিটি হারই ছিল লজ্জাজনক। ইংল্যান্ডের ৩৩৪ রানের প্রত্যুত্তরে ভারত করেছিল ১৩২ রান। সুনীল গাভাস্কারের ইনিংসের সূচনা করে শেষ অবধি ৩২ রানে অপরাজিত ছিল। ভারতের খেলা দেখে সবাই বিরক্ত ও হতাশ হয়েছিল।

কিন্তু মহিন্দর অমর, সন্দীপ পাতিল, অমিত আগরকর, মুদাসার নাজের, অশোক ইকবাল ও সন্দেহাতীত বছর বছর জাতের মিয়াদাদ সমৃদ্ধ পাকিস্তান এমন কি ওয়েস্ট ইন্ডিজেরও তীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে ২৮৬ রান তুলে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১ উইকেটে ২০৩ রানের মধ্যে এনে ফেলেছিল। বিরাট চেয়ারম্যান সারফ্রাজ নওয়াজের মুইর বেলিং-এর কাছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রানী-মহারানীরা বরণডালী হয়ে গিয়েছিল। তবে পাক অধিনায়ক মহিন্দর খানের চেয়ে ইংল্যান্ডের একদিনের ম্যাচ খেলায় অভিজ্ঞ ক্লাইভ লয়েড, ডেরেক মারে ও অভিজ্ঞ রবার্টসের সাহায্যে জয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছিল।

পাকিস্তান অল্প রানের ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়ার কাছেও পরাজিত হয়েছিল। তবে তারা শ্রীলঙ্কাকে হারাতে পেরেছিল।

সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সহজেই নিউজিল্যান্ডকে পর্যুদস্ত করে।

২৬ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল সেবার লর্ডসে ফাইনাল দেখতে এবং টিকিট বিক্রি হয়েছিল ৬৯,০০০ পাউন্ড। গ্রেগ চ্যাপেলের দিনে ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম তিন উইকেট অল্প রানে হারালেও গ্রেগ রোহান কানহাই ও ক্লাইভ লয়েড ১৪৯ রান তোলে পঞ্চম উইকেটে। মাঝারী লয়েড ৮২ বলে ১০০ রান তোলে। ষাট ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান হয় ২৯১।

প্রত্যুত্তরে অস্ট্রেলিয়া ২৭৪ রান করে সবাই আউট হয়ে যায় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭ রানে জয়ী হয়। অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড প্রথম গ্লুডেনশিয়াল কাপ জয়ের গৌরব অর্জন করেন।

১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বকাপের সময় একটা সমস্যা দেখা দিল। তখন কেরী প্যাকার রঙিন জামাকাপড় পরিহিত দিন-রাত্রির ক্রিকেট আরম্ভ করে দিয়েছে। প্রচুর পয়সার লোভে অনেকেই সেখানে যোগ দিয়েছে। সেইসব অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের নেওয়া হবে কিনা এই নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান তাদের নিলেও ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া প্যাকার গ্রুপ থাকায় বাদ দিয়েই দল গড়লো। আই সি সি ট্রফি জয়ী শ্রীলঙ্কা ও রানার্স-আপ কানাডা এলো সহ-সভ্য দেশের মধ্যে থেকে।

ভারত তখনও টেস্ট নিয়ে থাকত না একদিনের ক্রিকেটে অনেদিনের কায় — এইরকম অবস্থায়। প্রথম ম্যাচে ভারত ১৯০ রানে সবাই আউট হয়ে যায় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাত্র উইকেটে তাদের গুঁড়িয়ে দেয়। শ্রীলঙ্কা তখনও আই সি সি-র পূর্ণ সদস্যপদ পায়নি অর্থাৎ সদস্য দেশগুলির সঙ্গে 'সরকারী' টেস্ট খেলার যোগ্যতা অর্জন করেনি। তবু তারা ভারতকে আরও সমস্যার মধ্যে ফেলে দিল হারিয়ে দিয়ে। নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে অনায়াসে পর্যুদস্ত করে এই গ্রুপ থেকে সহজেই সেমিফাইনালে ওঠবার রাস্তা পাকা করে নিল।

ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও কানাডা সমন্বিত অপর গ্রুপটি অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। ইংল্যান্ড, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল। আকর্ষণের স্কাপার জিওফ বয়কটের সীম বোলিং-এ অস্ট্রেলীয়রা দাঁড়াতেই পারল না। পাকিস্তানও অস্ট্রেলিয়া ও কানাডাকে পরাস্ত করে সেমিফাইনালে পৌঁছল। কিন্তু দু'দলই গ্রুপ শীর্ষে থাকতে চাইল যাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেমিফাইনালে না মুকাবিলা করতে হয় কেননা 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ 'বি' রানার্স-আপ-এর সঙ্গে খেলবে। এই আকর্ষণীয় খেলায় ইংল্যান্ড ১৬১ রান তোলে। প্রত্যুত্তরে পাকিস্তান ১৫১ রান তুলে দশ রানে হার স্বীকার করে।

কিন্তু নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ডকে অবশ্যই বেল দিল সেমিফাইনালে। প্রথমে ব্যাট (৭১ রান) ও ডেরেক রেডমন্ডের গৌলতে ইংল্যান্ড ২২১ রানে পৌঁছল। নিউজিল্যান্ড দারুণভাবে ব্যাট করল প্রত্যুত্তরে, কিন্তু প্রায় নির্বিঘ্ন বয়কটের সীম বোলিং-এর কাছে মাথা হেঁট করল মাত্র নয় রানে হেরে গিয়ে। বোলারদের ভাল বোলিং-এর সঙ্গে রেডমন্ডের মারাত্মক ফিল্ডিং সাহায্য করেছিল ইংল্যান্ডকে জিততে। ইংল্যান্ড প্রথমবার ফাইনালে এবং নিজেদের মাঠে।

কিন্তু ফেলিস্টন ওভাল মাঠে অপর সেমিফাইনাল প্রতিযোগিতার ফ্রেঞ্চ ছাড় বলে বিবেচিত হল পাকিস্তানের লড়াকু মনোভাবের জন্য। প্রথম ব্যাট করতে শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের গর্ডন গ্রীনিজ ৭৩ রানের ইনিংসে আগুনের ফুলঝুরি দিয়ে গেলেন এবং ডেসমন্ড হেন্সের সঙ্গে প্রথম উইকেটে ১৩২ রান যোগ করলেন। এরপর ভিভিয়ান রিচার্ডসের ঝরঝরে ৪২ ও কলিন ক্রিফের ৩৪ — ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয় উইকেটে ২৯৩।

পাকিস্তান কিন্তু দমবার পাত্র নয়। মহিন্দর খান ও অমির আগরকর দ্বিতীয় উইকেটে ১৬৬ রান যোগ করে দেখিয়ে দিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্রুততম বোলারদের মোকাবিলা করা কিছুই নয়। কিন্তু চা-পানের বিরতির আগেই সর্বনাশটা হয়ে গেল। প্রথমে অমির, তারপর মহিন্দর খান। এ দু'জনের বিদায়ের পর জাভেদ মিয়াদাদ প্রথম বলেই এল বি ডব্লিউ। ফল, এক উইকেটে ১৭৬ থেকে চার উইকেটে ১৮৭। পাকিস্তানের ফাইনালে ওঠা আরও ঝামেলা হয়ে দাঁড়াল।

ফাইনাল অত চিত্তাকর্ষক হয়নি। নিরানব্বই রানের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের চার মহারথী গর্ডন গ্রীনিজ, ডেসমন্ড হেন্স, অ্যালভিন কলিচরণ ও অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড চলে যাবার পর বিশ্বস্ত হাতে ব্যাট করলেন ভিভিয়ান রিচার্ডস এবং তাঁকে সহায়তা করলেন মাঝারি কলিন ক্রিফ তাঁর এক বিস্ফোরণী ৮৬ রানের ইনিংস নিয়ে। পঞ্চম উইকেটে তাঁরা ১৩৯ রান যুক্ত করলেন এবং ইনিংসে ২৮৬ রানে শেষ করে গ্লুডেনশিয়াল কাপ যখনে রাখার পথ প্রশস্ত করে ফেললেন। বয়কট, ওক ও লাম্বকিনের মত ছপোষা ব্যাটসম্যানরা রিচার্ডস-ক্রিফের ওপর কোন দাগ কাটতে পারেননি।

উত্তরে ইংল্যান্ড প্রথম উইকেটে অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলি জিওফ বয়কট মিলে ১২৯ রান তুললেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ৩৮ ওভার চলে গেছে। পরিশেষে দু'উইকেটে ১৮৩ রান থেকে ১৯৪-তে ইনিংসের সমাপ্তি। দীর্ঘদিন ব্যাট করার ফলে ১১ বলে ৫টি উইকেট দখল করেন। ৯২ রানের বিরাট জয়ের সুবাদে গ্লুডেনশিয়াল কাপ আবার

অবতরণ করল ওয়েস্ট ইন্ডিজের।

১৯৮৩ সালের তৃতীয় বিশ্বকাপ ক্রিকেট সব দিক থেকেই নব দিগন্তের সূচনা করল। প্রাইজ মানি চার পাঁচ গুণ বেড়ে পাঁচ লক্ষ পাউন্ডে দাঁড়াল। দর্শক সংখ্যা ২,৩২,০৮১ এবং টিকিট বিক্রি ১,১৯,৫৭,৫১২ পাউন্ড। জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টি সি সি বি (টাউন্স অ্যান্ড কাউন্টি ক্রিকেট বোর্ড) খুশ খেয়ালিতে ডবল্ লেগ করলেন, অর্থাৎ প্রতিটি টিম প্রত্যেককে দুবার করে খেলার পর সিদ্ধের প্রথম দুটি দল সেমিফাইনালে যাবে এই সাব্যস্ত হল।

পরপর তিনবার জিতে হ্যাটট্রিক করতে বদ্ধপরিকর ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু ক্রিকেটের এ পর্বত সমতুল্য বড় অঘটনটি ঘটাল তারত যার একদিনের ক্রিকেটে কোন দাবি কখনও ছিল না। পূর্বের দুটো বিশ্বকাপে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা কলকাতার সমর্থনপুষ্ট কোন হয়েছিল তারতকে। কিন্তু তার পরের চার বছরে তারত যে তলে তলে তৈরি হয়েছে এ খবর রাখেনি বিশ্বের অন্য দেশগুলি। তারতীয় দলে তখন ছিলেন ব্রেট প্রাক্তনিক ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকর, ঘরকুটে বুদ্ধিমত্তাধারী বীকার, টেকনিক সন্দীপ পাটিল এবং কয়েকজন অলরাউন্ডার — যাঁরা ব্যাটে ও বলে সমান পারদর্শী, অধিনায়ক কপিল দেব, মেহিন্দর অমরনাথ, রজার বিনি প্রমুখ। ছিলেন এক নতুন সুইং বোলার কলবিন্দর সিং সান্ধু ও মদনলাল। ফাইনালে লর্ডসের মাঠে মেহিন্দর অমরনাথের বোলিং অসামান্য কার্যকরী হয়েছিল এবং তিনি 'ম্যান অব দি ম্যাচ' নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সবের ওপরে ছিল অসাধারণ ফিল্ডিং ও কপিল দেবের অধিনায়কত্ব।

ফাইনালে তারত প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সংগ্রহ করে ১৮৩ রান। মোটেই বিরাট একটা কিছু নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ খুব তাড়িতাড়ি তারতকে নিয়েছিল। বিশেষ করে ভিভিয়ান রিচার্ডস বেতরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সমর্থকপূর্ণ লর্ডস মাঠের চতুর্দিকে ব্যাট ঘোরাচ্ছিলেন মনে হয় কলকে চাইছিলেন, শ্যাম্পেনের বোতলটা খোল, এই এলুম বলে — এই বালবিলাসের লড়াই আর কতক্ষণ। কিন্তু শেষমেষ শ্যাম্পেনের ছিপিটা কপিলদেবই খুলেছিলেন। ব্যাপার হচ্ছে, ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা এবং ফাইনাল খেলোয়াড়ের মর্মের ওপর নির্ভর করে। তাগ্যদেবী কখন যে কার প্রতি প্রসন্ন হবেন কেউই বলতে পারে না।

লীগ ম্যাচে প্রথমেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে দিয়ে যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল তারত, সেটা শেষ হল সুপার-নিরাশ কাপ জয় করে। বিশ্বকাপ মূল পর্বে যোগ্যতা অর্জনকারী জিম্বাবোয়ের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে দুমড়িয়ে দিয়ে শুরুত করেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে তারতকেও কব্জার মধ্যে এনে ফেলেছিল কিন্তু কপিল দেব রুখে দাঁড়ালেন। অধিনায়কের বিদায়ী ১৭৫ নট আউট সমস্ত দলকে উদ্বুদ্ধ করে।

তারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দুর্বল অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবোয়ে এক গ্রুপে ছিল। অপর গ্রুপে ছিল ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা। প্রথম গ্রুপ থেকে তারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দ্বিতীয় গ্রুপ থেকে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তান সেমিফাইনালে উন্নীত হল। এমন কি প্রথমদিকে তারতীয়রাও ভাবতে পারেনি তারত ইংল্যান্ডকে তাদের দেশে হারাবে। কিন্তু তাই হল।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুই উইকেটে ১০৭ রান থেকে ২১৩ রানে সবাই আউট হয়ে গেল ইংল্যান্ড দলের। অধিনায়কত্বে মেহিন্দর অমরনাথের মিডিয়াম পেস বোলিং ও কীর্তি আজাদের সাধারণ মানের অফ স্পিন বোলিং-এর কাছে প্রতিপক্ষরা ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান যেমন, ডেভিড গাওয়ার, মাইক গ্যাটিং, ইয়ান বথাম ইত্যাদি আটকে গেলেন। অমরনাথ, কপাল শর্মা ও সন্দীপ পাটিল দারিত্বশীল ব্যাট করার পর অধিনায়ক কপিল দেব শেষ শটটা মেরে দলকে জেতালেন। টেলিভিশনে দেখা গেল একটা পোস্টার 'কপিল দেব প্রত্যয়ানে ইয়ান বথামকে খান'।

পাকিস্তান সেমি আগের দল ছিল না। আসেন মিয়াদাদ অনুপস্থিতায় ভাল খেলতে পারেনি এবং মহসিন খান ছাড়া কেউই জাভেদ মিয়াদাদ, মুদাসসর নাসির, জোহেল গর্দার ও ইমতিয়াজ আহমেদকে মোকবিলা করতে পারল না। পাকিস্তান ১৮৬ রানে গুটিয়ে গেল। ১২ ওভার থাকতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ তার প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নিয়ে জিতে গেল।

এরপরে যা প্রত্যাশিত ফাইনাল। তারতের ১৮৪ মোটেই বিরাট একটা রান নয়। কিন্তু বলবিন্দরের একটা ইনসুইসার গর্ডন গ্রীনিজকে এলবো বেলে ফিরিয়ে দিল। এরপর ব্যাট ঘোরাতে ঘোরাতে রিচার্ডসের নামা এবং আর সমস্তেই ৩৩ রান যোগ। কিন্তু মদনলালের একটি বলে বেপরোয়াভাবে ব্যাট ঘোরালেন এবং কপিল দেব অনেকটা দৌড়ে জীবনের ব্রেট ক্যাচটা ধরলেন। এরপর ডেসমন্ড হেন্স, লয়েড, ল্যারি গোমস্ ও মার্টিন ক্রোকসনের মদনলাল, বিনি, সান্ধু এইসব মিডিয়াম পেসাররা তাড়াতাড়ি ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। দুর্ধর্ষ, ক্যালকম মার্শাল ও মেহিন্দর অমরনাথ আউট করলেন। পরাক্রমশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪০ রানে খরাশায়ী হল, তারত ৪৩ রানে জিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল। ইংরেজী পরিভাষায় বলা চলে 'কপিল দেব লেড্ দি টিম ফ্রম দ্য ফ্রন্ট।' ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ যদি কপিল দেবের হয়, ১৯৮৭ সালের তারত উপমহাদেশের বিশ্বকাপ অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক অ্যালান বর্ডারের এবং ১৯৯২-এর অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ নিশ্চয়ই পাকিস্তান অধিনায়ক ইমরান খানের।

তারতের বিশ্বকাপ জয়ের মুখাগেই তদানীন্তন তারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এন কে পি সালভে চতুর্থ বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে তারতীয় উপমহাদেশে আনতে ব্রতী হন। আন্তর্জাতিকভাবে পাক বোর্ডের সভাপতি এয়ার মার্শাল নূর খানেরও সমর্থন পেলেন যি সালভে। আপত্তির ঝড় ওঠে আই সি সি সভায় — পাঁচ তারকার তাল হোটেল আছে কি? আন্তর্জাতিক মানের তাল মাঠ আছে কি? অত বিদেশি মুদ্রা দিতে পারবে কি? ইত্যাদি। কিন্তু এইসব ওজর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও একটা ব্যাপারে সবাই কানু হয়ে গেল পাক-তারত যুগ্ম প্রয়াসের কথা। প্রাইজ মানির পরিমাণ ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে সবাই রাজি হয়ে গেলেন এবং প্রতিটি অংশগ্রহণকারী দেশ তাল অর্থমূল্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেলেন। অবশেষে তারত-পাকিস্তান যৌথভাবে চতুর্থ বিশ্বকাপ করার সিদ্ধান্ত হল। অনেকে স্পনসর করতে এগিয়ে এল কিন্তু রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজেই মূল স্পনসর হিসেবে গ্রহণ করা হল এবং কাপটির নামকরণ হল রিলায়েন্স কাপ। রাজনৈতিক বিরোধ যাই থাক, চতুর্থ বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে সফল করতে তদানীন্তন দুই দেশপ্রধান শর্মীয় তারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সহযোগের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া ৮ থেকে মহেন্দ্রর ৮ অবধি পর্যন্ত এই তিনটি ক্রিকেট উৎসব চলেছিল এই উপমহাদেশে। সচিন, দ্রাবিড়, গাঙ্গুলি ও লক্ষ্মণ রিটায়ার করেছেন। স্কালকম মার্শাল ও গর্ডন গ্রীনিজও অবসরী দলের সঙ্গে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল আগের তিনবারের মত মারকাটারি দল নয়। নিউজিল্যান্ডের রিচার্ড হ্যাডলি নেই। ইংল্যান্ড নিয়ে ভেতিক গাওয়ার, ইয়ান বথাম নেই, অ্যালান বর্ডারের অস্ট্রেলিয়া অবশ্যই আগে যাদের পর খুবই মামুলি। অঘোষিতভাবে ভারত-পাকিস্তান প্রতিযোগিতা কেবারিটি হয়ে গেল এবং সবাই ইডেন উদ্যানে ভারত-পাক ফাইনাল দেখতে উদ্গ্রীব হয়ে পড়ল। ফাইনালের বল আগেই সব টিকিট উধাও। কিন্তু বিধি বাম।

লাহোরের গদাফি স্টেডিয়ামে ৫০,০০০ জন সমর্থনের সামনে পাকিস্তান-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল শুরু হল। যোগ্যতা ওই প্রচণ্ড জন সমর্থন পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করল, সেখানে অস্ট্রেলিয়া খেলা-মনে চূড়ান্ত পেশাদারিত্ব দেখিয়ে ২৮৭ রান করল প্রথম ব্যাট করে। ইমরান খান তিনটি উইকেট পেলেন কিন্তু সেলিম জাফরের এক ওভারে সিক্স ওয়াসের ১৮ রান খেলায় ভাগ ঘুরিয়ে দিল।

প্রত্যুত্তরে ৩৮ রানের মধ্যে রমিজ রাজা, মনসুর আখতার ও সেলিম মালিক আউট। অধিনায়ক ইমরান খান ও জাভেদ মিয়াদাদ বিদ্রুকন লড়লেন। ইমরান আউট হবার পর আর কেউ দাঁড়াতে পারল না।

পরদিন ওয়ানখেড়ে স্টেডিয়ামে আর একটি ইতিহাস। ওই সেমিফাইনাল বিখ্যাত হয়ে থাকবে গ্রাহাম গুচের সুইপ শটের জন্য। ভারতীয় বাঁ-হাতি স্পিনার মনিন্দর সিং ওভু লেগস্টাম্প-এর ওপর বল ফেললেন, গুচ ও পাল্টি সুইপ করে বাউন্ডারি সীমানার বল পাঠালেন। গুচ শতরান, গ্যাটিং অর্ধশত ও অ্যালান লাম্ব ৩২, ইংল্যান্ডের স্কোর দাঁড়াল ২৫৪।

গাভাসকার শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচে মোটে চার রান করলেন। শ্রীকান্ত, সিধু, মোহনরকার সবাই মেমিলে-এর স্পিনের জালে পরাজিত হলেন। শেষে অধিনায়ক কপিল দেবের একটু ঝকঝকি নিয়ে বিদায়। ভারত-পাকিস্তান, দুই কেবারিটের সেমিফাইনাল থেকে বিদায়।

দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল দেখতে কিন্তু কলার কলার পূর্ণ ছিল ৮ নভেম্বর ১৯৮৭-এর ইডেন। প্রায় ৯০,০০০ দর্শক দেখল দুটি চূড়ান্ত পেশাদার দলের খেলা। ডেভিড বুন ও ডেভন অর্ণের প্রথম উইকেটে ৭৫ রান যোগের পর অস্ট্রেলিয়া ইনিংস ২৫০ রানে শেষ হল।

ইডেনের মন্থর উইকেটের উপযোগী অস্ট্রেলিয়ার ভাল কোন স্পিনার ছিল না। মাইক গাটিং ৬১, ইংল্যান্ডের দুই উইকেটে ১৩৫। আর তখনই অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার নিজে এলেন বল করতে। পাঁচ ওভারের মধ্যে খেলার ধারা ঘুরিয়ে দিলেন। বর্ডারের বাঁ হাতি স্পিনের বিরুদ্ধে মাইক গাটিং রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে নিজের ও দলের পতন টেনে আনলেন। সহজ রানে জিতে শেষ হাসলেন বর্ডার ও তাঁর সতীর্থরা। ফলে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম বিশ্বজয়।

এর চার বছর পর বিশ্ব ক্রিকেটের আসর বসল অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড উপমহাদেশে। ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৫শে মার্চ ১৯৯২। এই প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকা যোগ দেয় নবম দেশ হিসাবে। পূর্বের চারটি বিশ্বকাপে আটটি দেশকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে প্রত্যেক গ্রুপের বিরুদ্ধে দুবার করে লীগ খেলত। পঞ্চম বিশ্বকাপে সৃষ্টি একটু পালটানো হল। গ্রুপ ভাগ না করে প্রত্যেকটি দেশ প্রত্যেকের বিরুদ্ধে লীগ খেলবে। লীগ তালিকার প্রথম চার দল সেমিফাইনালে উন্নীত হবে। এবারই প্রথম নিন-হাফির খেলা শুরু হল। যেমন এক যোগের জোস্থলি স্পনসর করায় দক্ষিণ আফ্রিকার নাম হল যেমন এক যোগের কাপ।

পাকিস্তান খুব খারাপভাবে শুরু করে। ভারত সফরের প্রথম তিনটি ম্যাচে পাকিস্তান হেরে যায়, কিন্তু তারপর পর পর পাঁচটি ম্যাচ জিতে সেমি ফাইনালে পৌঁছায়। ভারত মোটেই ভাল খেলতে পারেনি। পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড প্রথম ব্যাট করে ২৬২ রান সংগ্রহ করে সব উইকেট হারিয়ে ৫০ ওভারে। অধিনায়ক মার্টিন ক্রো ৯১ ও কেন রাদারফোর্ড ৫০ রান তোলেন।

নিউজিল্যান্ডের রান সংখ্যা মোটেই কম ছিল না, কিন্তু পাকিস্তানের মারমুখী ব্যাটিসম্যানদের কাছে ২৬২ রান পর্বতপ্রমাণ মত উঁচু গেল। হয় উইকেট হারিয়েই প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নিল পাকিস্তান এক ওভার বাকি থাকতেই। রামিজ রাজার ৪৪, ইমরানের ৪৪, জাভেদ মিয়াদাদের ৫৭ ও ইনজামাম-উল-হকের ৬০ এবং এঁদের যৌথভাবে সংগ্রহ করা রান ২৬৩। পাকিস্তান চার উইকেটে জিতল।

বৃষ্টি বিঘ্নিত অপর সেমিফাইনালে প্রায় জোর করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ইংল্যান্ড অদ্ভুত এক নিয়মের ফাঁদে ফেলে। ইংল্যান্ডের ৪৫ ওভারে হয় উইকেটে ২৫২-এর উত্তরে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৩ ওভারে ছয় উইকেটে ২০২ রান তোলে। তারপর বৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতার আইন অনুযায়ী পেয়ে এই ফাঁকায় যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জিততে হলে এক বলে ২১ রান তুলতে হবে যেটা অসম্ভবের মত। অতএব ইংল্যান্ড ফাইনালে গেল।

বিদেশী পাকিস্তানের পরিচয় পাওয়া গেল ফাইনালে। প্রথম ব্যাট করে ৫০ ওভারে ছয় উইকেটে ২৪১ রান তোলে, ইমরানের অধিনায়োকচিত ৭২, জাভেদ মিয়াদাদের ৪৮ রানের যৌথতে। ইংল্যান্ডের প্রারম্ভিক ব্যাটিসম্যান ক্রোফ্রাদার (৬২) ও গ্রাহাম গুচ ভালভাবেই শুরু করলেন। কিন্তু বাঁ-হাতি ওয়াসিম আক্রমের দুটি সাপের ছোবলের মত ইনসুইংয়ে আলান লাম্ব (০১) ও ক্রিস সুইস (০) ধরাশায়ী হলেন, আর তখনই ইংল্যান্ডের বিজয়ের আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এরপরই ইমরান খান অবসর নেন।

চার বছর পর ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর বসছে আবার ভারত উপমহাদেশে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে। ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ থেকে ৬ মার্চ, ১৬ পর্যন্ত। মোট ১২টি দেশ এবার অংশগ্রহণ করছে। তবে এবার ভারত, পাকিস্তানের সঙ্গে শ্রীলঙ্কাও যৌথভাবে পরিচালনার দায়িত্বে আছে — কমিটির নাম হয়েছে সিলকম — পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, লঙ্কা কমিটি। আই সি সি স্পনসর করছে বলে কাপটির নাম হচ্ছে উইলস কাপ। ভারতে সেমিফাইনাল খেলা হবে দুটি সেমিফাইনাল সমেত। একটি হবে ইডেনে ও অপরটি মোহালিতে। ফাইনাল হবে লাহোরে।

কিন্তু এবারে বিজয়ী কে হবে? বিশ্বকাপের ইতিহাসে দেখা গেছে আয়োজক দেশ কখনও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। অতএব ভারত পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার আশা কম। তাহলে কে? ইংল্যান্ড চারবার সেমিফাইনালে গেছে আর দুবারের ফাইনালিস্ট। আমার বাজি ইংল্যান্ড।

▲▲▲

"একেই বলে সমবায় নীতি। এই নীতিতেই মানুষ জানে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, লোকব্যবহারে এই নীতিকেই মানুষের ধর্মবুদ্ধি প্রচার করছে। এই নীতির অভাবেই রাষ্ট্র ও অর্থের ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে মানুষের এত দুঃখ, এত ঈর্ষা, দ্বেষ, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা, এত অশান্তি।" — রবীন্দ্রনাথ

বাঁকুড়া কালেক্টরেট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেটিড সোসাইটি লিঃ

মাননীয় ধূমপায়ীগণ ঃ

- বিজয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা ভালবাসা গ্রহণ করুন।
- সমবায় সপ্তাহ পালন করুন (১৪-২০শে নভেম্বর)
- বাঁকুড়া সর্বপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ 'লাল তারা' মার্কা কো-অপারেটিভ বিড়ি পান করে পরম তৃপ্তি লাভ করুন।

বাঁকুড়া বিড়ি শিল্পী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
রবীন্দ্র সরণি, পোঃ ও জেলা ঃ বাঁকুড়া
ফোন ঃ ৫০২৮৩

মদন গরাই	অনিল কুণ্ডু	ঝাড়ু গরাই
সভাপতি	*ম্যানেজার*	*সম্পাদক*

বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিমিটেড

(রেজি নং ৭০ বি কে ; স্থাপিত ঃ ইং ১৫-৭-৭৬)

আমাদের সমিতি বিপদে আপদে, ঘর বাড়ি তৈরি, মেরামতী ও জমে, জমি জমে, পুত্র-কন্যার শিক্ষা, বিবাহে, অসুখ-বিসুখে ও নানা প্রয়োজনে সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে নিয়ম মোতাবেক।
মহাজনের হাত থেকে বাঁচতে আজ সমিতি আমাদের হাতিয়ার। আমরা সদস্যরাই সমিতির মালিক।
সমিতি আমাদের ভরসা দিক। আই সমস্তরকম সমবায় ঋণ নিয়মিত শোধ করুন ও সমবায়ের ধারা সমাজের প্রতিস্তরে বিস্তার করুন। সমবায় জিন্দাবাদ।

সুধীরকুমার চ্যাটার্জি	বীরকুমার খাঁড়া	মানিককুমার শাহা
সভাপতি	*সহ-সভাপতি*	*সম্পাদক*

পরিচালকবৃন্দ ঃ
শিবপদ চন্দ্র, অশ্বিনী সহিস, সিদ্ধেশ্বর সহিস, মানারাম সহিস, অসিত দত্ত, সুনীলকুমার মান।
ম্যানেজার ঃ অজিত বোস ও দীননাথ চ্যাটার্জি

অনুবাদ গল্প

স তি না য়া

অনুবাদ : ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়
মূল রচনা : কন্সটানটিন পাউস্তভস্কী

প্রচণ্ড গর্জন করে ঝোড়ো হাওয়া আলাতাউ পাহাড়ের ওপর-গহ্বর আলোড়িত করে বয়ে যাচ্ছিল। তবে একটি ঘর সম্পূর্ণ ঝি ঝি পোকা হাসপাতালের জানালা গলে ভীড় নিল আর মেঝের পর্দার উপর এসে বসল। আহত লেফটেন্যান্ট রুদনেভ্ বিছানার উপর উঠে বসল এবং অনেকক্ষণ বিবি আর পর্দার দিকে তাকিয়ে রইল। পর্দার ওপর বাঁধানো গোলাপ ও ছোট্ট ঘুঁটিওলা মেয়েদের অঙ্কিত হুক ঝরিয়াদত ঘুটিওলী নীল ভঙ্গিতঙ্গকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিল।

সকাল হল। ঝোড়ো হলুদে আকাশ একদম জানালার ঘোঁড়া ছাড়ছিল। পর্বত চূড়াগুলির উপর ঘুটি রামধনু বক্র আস্তরণ রচনা করল। কয় শিওনীর ভিজে মূল জানালার ফ্রেমে ঝুলন্ত কয়লার মত ঝুলঝুল্ করে ঝুলছিল। খাড়া ঢালু পাথরের উপর দিয়ে ঝাপ উঠছিল। অতলান্ত গহ্বরে একটি ছোট্ট ঝরনা জলধারা গর্জন করে উঠল। তার ঝঁকরওলিকে বারবার পাক খাওয়াতে লাগল।

রুদনেভ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল : এশিয়া, ওটা তোমার, কিন্তু ঐ মেয়ের পর্দাটি আমাদের উত্তরের জিনিস এবং এটি নাসত্যিয়া নামের একটি সুন্দরী মেয়ে বুনেছিল।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ। লেনিনগ্রাদের এক শিল্পী বালালয়ক্ শিকার করতে বেরিয়ে পড়ল উত্তরের নির্জন প্রান্তরে।

প্রথমে যে গ্রামটি তার নজর কেড়েছিল সেই গ্রামে সে তার পুরনো ঝম্পচালিত নৌকা ছেড়ে নেমে এক প্রবীণ শিকারীর বাড়িতে আশ্রয় নিল।

ঐ গ্রামে একটি গরীব খাঁটি মেয়ে তার বাবার সঙ্গে থাকত। সে তার দেশ ও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। তার নাম নাসত্যিয়া।

একবার নাসত্যিয়ার বন্ধুরা তার শিকার করতে গিয়ে ভুল করে বালাসতের ঝুড়িতে ওদি মেরে দিল। পরে অনুশোচনায় দগ্ধ বন্ধুরা তার মেয়েকে বালাসতের চাপাগোপনে করার ভার দিল।

আহত বালাসতের প্রতি করুণা থেকে নাসত্যিয়ার হৃদয়ে প্রথম বলিষ্ঠসুলভ প্রেম জন্ম নিয়েছিল কিন্তু তার লাজুক স্বভাবের জন্য বালাসত তা জানতে পারল না। যদিও লেনিনগ্রাদে বালাসতের স্ত্রী ছিল কিন্তু সত্য গোপন করার ফলে কেউ তা জানল না। গ্রামের সকলে জানল বালাসত একা।

সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার আগে বালাসত আচমকা নাসত্যিয়ার বাড়িতে গিয়ে তাকে তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাল এবং একটি উপহার দিল। নাসত্যিয়া খুশি মনে তা গ্রহণ করল।

বালাসত উত্তরের একটি প্রথা জানত না। সেটা হল যদি কোন ছড়ি কোন মেয়ের বাড়িতে দিন আশ্রয়ণে গিয়ে তাকে কোন উপহার দেয় এবং মেয়েটি যদি সেই উপহার গ্রহণ করে তাহলে ছড়িটি মেয়েটির ভাবী বর রূপে গণ্য হয়। এবং এইভাবেই উত্তরে কোন পুরুষ একটি নারীর প্রতি তার প্রেম নিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রথাটি যুগযুগান্ত ধরে প্রচলিত ছিল এবং কোন প্রকার আধুনিকতাই একে বদলাতে পারেনি।

তাই যাবার সময় যখন লাজুক নাসত্যিয়া বালাসতের কাছে জানতে চাইল যে সে কবে ফিরে আসবে, নির্বোধ বালাসত না বুঝে বলল যে সে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

কিন্তু বালাসত ফিরল না। স্বভাবসুলভ ঝালিকাটি তার ভাবী বরের খোঁজে কাউকে না জানিয়ে লেনিনগ্রাদে চলে এল। খুশিতে পায়ে চলে যখন সে ফ্লেতাড়িতে ঢাপল তখন জানল যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ফোনগ্রামে সে বালাসতের ফ্লাটবাড়িতে গিয়ে পড়ল এবং সেখানে সে বালাসতের স্ত্রীকে দেখল। গাঁয়ের কাঁকে সিগারেট ফেলে ঘরে আধুনিকা স্ত্রী প্রথম নাসত্যিয়াকে আশ্চর্যচকিত হয়ে দেখতে থাকে। বালাসত বুঝে গেছে, বাড়ি নেই। শহরের ফ্লাটবাড়িতে ঘুলোকরা সিঙ্কের ডিভান, ঝিকিমিকি পাউডার এবং অবিরাম টেলিফোনের মধ্যে নিজের নাসত্যিয়া এক নির্মম সত্যের মুখোমুখি হয়ে জানল যে বালাসত তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। নাসত্যিয়া বালাসতের স্ত্রীকে কিছু না বলে রাস্তায় নেমে এল, ততক্ষণে লেনিনগ্রাদ একটি মিলিটারি ব্যারাকে পরিণত হয়েছে।

একদিকে যুদ্ধের পরিস্থিতি অন্যদিকে শোকাহতা নাসত্যিয়া নেভা নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়। নদীর অতলান্ত জলো জলেই সে তার অসহ্য যন্ত্রণা ও প্রেমগ্লানি থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চায়। কিন্তু পারেনি। ঠেলা থেকে এক রোগা কাদুদায় ফ্রেফিমভ্ এসে পড়ে এবং তাকে টেনে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রীর হেফাজতে সঁপে দেয়। পাঠকের জানা দরকার যে ফ্রেফিমভের স্ত্রী ছিল এক পুরুষ বিদ্বেষী, সরল এবং হিংসুটি মহিলা।

ফ্রেফিমভের আদরে যখন নাসত্যিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে। ফ্রেফিমভের স্ত্রী তাকে বলে যে বালাসত তাকে ঠকায়নি কারণ উত্তর দিকের প্রথা শহরের লোকের জানা নেই। শুনে নাসত্যিয়া শান্তি পায়। সে ভাল হয়ে ওঠে এবং কিছুদিনের মধ্যে সেবিকাবৃত্তি গ্রহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করল। তার মনের গোপনে আশা ছিল যে সে একদিন আহত সৈনিকদের মধ্যে বালাসতকে খুঁজে পাবেই।

সেই থেকে বালাসতকে সে কত জায়গায় খুঁজেছে। প্রসূন উদ্যানের ওয়াশেসে, ধ্বংসস্তূপে, পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া পরিখায়, আগুন ও বিস্ফোরণের মাঝে, জঙ্গলে ও পাহাড়ে, সমরক্ষেত্রে কোথায় না? বালাসতের কোনো চিহ্ন নেই। যেন আকাশে মেঘেরা না মাটি মিলিয়ে।

ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে বন্ধুকে কাদুদায় ফ্রেফিমভ-এর সঙ্গে নাসত্যিয়ার দেখা হল। ফ্রেফিমভ সবাইকে নাসত্যিয়ার অপূর্ব প্রেমের কথা জানিয়ে দিল। একটা ইউনিট থেকে আরেক ইউনিটে। এক ব্যাটারি

থেকে অনেক ছাউনিতে নাসতিয়ার বলাশভ সম্পর্কের কথা প্রবাদ বাক্যের মত ছড়াতে লাগল।

প্রত্যেক সৈনিকের মনেই তার প্রিয়জন সম্পর্কে দুর্বলতা থাকে এবং দুঃখের কাঁকে সে সময়ে প্রিয়জনদের স্মৃতি লালন করে। নাসতিয়ার কাহিনী একে অপরকে বলার সময় তারা নিজেদের কল্পনাশক্তি অনুসারে রূপায়ণ করে নিত। নাসতিয়াকে কেউই উজ্বেক মেয়ে মনে করত না। ইউক্রেন, সাইবেরিয়া বিভাগের, কাজাকস্তান ইত্যাদি প্রদেশের সৈনিকরা তাকে নিজেদের মেয়ে ভাবত। তবে তারা নাসতিয়ার অজানা প্রেমিককে হিংসে করত।

নাসতিয়া সম্পর্কে রটনা উপন্যাসের অন্য তীরে বলাশভের ছাউনিতে গিয়ে পৌঁছুল। শিল্পী বলাশভও অন্যান্য সৈনিকদের মতই একটি নামহীন মেয়ের নিজের প্রেমিককে খুঁজে বেড়ানোর গল্প শুনে বিচলিত হল এবং তার ভালবাসার প্রেরণায় দ্বারা প্রভাবিত হল। সে প্রায়ই মেয়েটির কথা ভাবত এবং তার মনের মানুষকে ঈর্ষা করত। সে কী জানত যে সে নিজেকেই ঈর্ষা করছে। ফলে নাসতিয়ার কথা সে ভুলেই গেছিল।

বলাশভের ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না। সে তার বিবাহিত জীবনে কিছুই পায়নি। তার এখন সময়ে ভালবাসার মত জীবনের সব আনন্দ উপভোগ করছে। সারাটা জীবন ধরে সে মহান প্রেমের স্বপ্নে দেখে গেছে। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর ভেবে লাভ কী! তার কপালের দুঃখে পাক ধরতে শুরু করেছে।

এরপর যা ঘটল তা হল নাসতিয়া শেষ পর্যন্ত বলাশভের ছাউনির সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু তার দেখা পায়নি — সে তার খুঁজিন আগেই যুদ্ধে মারা গিয়েছিল এবং উপন্যাসের তীব্রতা পাইন বনে তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল।

জানেক্ ভাবছিল — নাসতিয়া আহত সৈনিকদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিল। সে ছিল কমান্ডের সেরা নার্স। আহত সৈনিকদের সেবার মন্ত্র নিয়ে নাসতিয়া কি বলাশভকে হারানোর দুঃখ ভুলতে পেরেছিল?

▲▲▲

[রুশ সাহিত্যে আতন চেকভ্ ও বুনিন-এর পর ছোট গল্পের সর্বোৎকৃষ্ট ধারার অন্যতম ধারক ও বাহক হলেন কনস্তানতিন্ পাউস্তভ্স্কী (১৮৯২-১৯৬৮)। তাঁর রচনায় চার্লস ডিকেন্সের ছাপ প্রকট। ভাল যা কিছু, তা কেন ভাল তার উত্তর পাউস্তভ্স্কীর গল্পের চরিত্রগুলি অবগাহন করলে জানা যায়। একথায় তিনি সোভিয়েত রুশী সাহিত্যের একটি স্তম্ভ। — অনুবাদক]

সমবায় আন্দোলনকে উজ্জীবিত
করতে আমরা সচেষ্ট

ক্যালকাটা টেলিফোন ডিস্ট্রিক্ট
কো-অপারেটিভ লিমিটেড

৮, হেয়ার স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০১

শারদীয়া ও দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বাঁকুড়া জেলার সুপ্রাচীন ও বৃহত্তম কর্মচারী ঋণদান সমবায়

বাঁকুড়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং ঃ ১, তাং ৭-১-৪৪, মাচানতলা, বাঁকুড়া

সদস্যদের জরুরি প্রয়োজনে, মৃত্যুতে, চিকিৎসা, পুত্র-কন্যার শিক্ষার ঋণদান সহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক অর্থে নিয়োজিত

অনন্তগোপাল ঘোষ
সভাপতি

অমরবন্ধু করক
ম্যানেজার

অরুণকেতন ভুনিয়া
সহ-ম্যানেজার

মধুসূদন ভট্টারি
সম্পাদক

দি জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ঃ ১৯১৯

হেড অফিস ঃ টেম্পল স্ট্রিট, জলপাইগুড়ি
(পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর অংশীদারি)

আমাদের পরিষেবা ঃ

- জেলার টাকা জেলার মানুষ, সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখুন।
- সেভিংসে আমানতে যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে সুদ বেশি।
- সেভিংসে আমানত ইন্সিওরেন্স দিয়ে সুরক্ষিত।
- সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা আছে।
- সকল প্রকার বাণিজ্যিক অর্থ করা হয়।

আমানতকারীদের সেবাই আমাদের ব্রত।

শাখাসমূহ ঃ ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জ, বেলাকোবা, নিউমাল ও ধূপগুড়ি

সত্যজিৎ বসু
সভাপতি

নির্মলকুমার রায়
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে

গোপ গন্তার ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং ৪০/১২-২-৪৯

গোপ গন্তার , জেলা ঃ বর্ধমান
ফোন ঃ মেমারী - ২১৬

জনসাধারণের সেবায় আমাদের প্রকল্পসমূহ ঃ
স্বল্প সুদে সকল প্রকার কৃষি ঋণ সমবায়ে
সাশ্রয়মূল্যে রাসায়নিক সার বিক্রয়
কৃষি অর্থে ট্রাক্টর ও মিনি ডিপটিউবওয়েল
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেশি সুদে সকল প্রকার আমানত গ্রহণ।

শাখা অফিস ঃ খোষ শাখা, রায়কালপুর শাখা, মজলকোলা শাখা

অরুণ সমবায়
পরিচালকমণ্ডলী

বাঁকুড়া টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত ঃ ১৯২৯
সুভাষ রোড, বাঁকুড়া
ফোন ঃ বাঁকুড়া ৪০৭৩৩
(একটি আদর্শ সমবায় ব্যাঙ্ক)

- যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংস্থা থেকে বেশি সুদ দেয়।
- সহজ ও সরল শর্তে বিভিন্ন খাতের লকার ভাড়া পাওয়া যায়।
- চলতিমূলধনের পরিবর্তে সরল সুদে স্থায়ীসম্পদ বন্ধকি ঋণের অপূর্ব সুযোগ।
- আপনার পরিচয় আমানত "আমানত বিমা" দ্বারা সুরক্ষিত
- হাইপোথিকেশন, মর্টগেজ, প্লেজ এবং ব্যাঙ্কার গারান্টেরের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয়
- নিজস্ব ভবন, সেবায় ও সহায়তায় অবিচীয়।

হরলালাল ঘরাই
সভাপতি

রবিলোচন সিং
ম্যানেজার-ইন-চার্জ

সুভাষচন্দ্র কর্মকার
সম্পাদক

With Best Compliments From

EASTERN RAILWAY EMPLOYEES' CO-OPERATIVE BANK LIMITED

10, Strand Road, Calcutta - 700 001

Facilities Available to Shareholders :

1. Loan upto Rs. 25, 000/-
2. Own holiday home at Puri
3. Holiday home facilities at subsidised rates at Puri & Darjeeling

Financial Assistance :

4. Spectacle twice during the membership
5. Denture once
6. Educational Assistance
   Madhyamik, H.S. Degree & Technical Education, viz.Engineering & Medical.

অনুবাদ গল্প

উমা লিসি

অনুবাদ ঃ শ্যামল মৈত্র
মূল রচনা ঃ দুও ও

[দুও ও (১৯০০-৩৮) ঝিনুয়াল প্রদেশের চেংদু তাঁর জন্মস্থান। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯২৯ সালে ফ্রান্সে চলে যান উচ্চশিক্ষার্থে। ১৯৩০ সালে ফিরে আসার পর রোমী রোলাঁ ও অন্যান্য ফরাসী লেখকদের গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর মৌলিক রচনাসমূহে ঝিনুয়ার মানুষের প্রতি ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে এই প্রতিশ্রুতিময়ী লেখিকা সন্তান প্রসবের সময়ে প্রয়াত হন।]

সেদিন ঘুম ভাঙলো একটা ভিন্ন শব্দে। অন্য অন্য দিনে গরুর পাল নিয়ে পাহাড়ের উপরে চরাতে যাবার সময় রাখাল বালকদের গানের শব্দে অথবা প্রতিবেশীদের কারও সঙ্গে মায়ের উচ্চস্বরে কথোপকথনের শব্দে আমার ঘুম ভাঙে। আজ ঘুম ভাঙতেই শুনলাম একটা অদ্ভুত , কর্কশ স্বর, 'সে কি, এত বড় হয়েছে!'

বিছানা ছেড়ে উঠেই চোখ খুলে দেখতে চেষ্টা করলাম, কে এলো এই ভোরবেলায়। দেখি, আমার বিছানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মরলা পোষাক পরা, মধ্যবয়সী এক মহিলা, তার চ্যাপ্টা মুখে কসরের দাগ, মাথার চুলগুলো খড়ের আঁটির মত। ঠোঁট ফাঁক করে পোকলা দাঁতে হাসছে।

মনে হল এই কুশ্রীদর্শন মহিলাকে আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। অপলকে তার দিকে চেয়ে স্মৃতির পাতা হাতড়াতে লাগলাম।

'আরে আমি লিউ মসি _ জানি, আমাকে ভুলে গিয়েছ। মনে হল আমার মনের কথা জানতে পেরেছে। 'আট বছর হল দেখনি তো আমায়। আর কত বড় হয়ে গেছ তুমি। রাস্তায় দেখলে আমিও তোমাকে চিনতে পারতাম না।'

'বল কী! তুমি লিউ মসি! সেই মসি, যে আমার দেখাশোনা করত!' আমি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠলাম। চিনতে না পারার লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল। শিশুরা অনেক ছোটখাট ব্যাপার মনে রাখে, কিন্তু যা মনে রাখা উচিত এমন অনেক কিছু ভুলে যায়। যে মানুষটা এতদিন আমার দেখাশোনা করল তাকে এত সহজে ভুলে গেলাম। মানুষ কি অকৃতজ্ঞ।

আমি তার দিকে এগিয়ে যেতে সে পিছোতে লাগল। তার পিছনেই টেবিল, আমি শনি-রবিবার বাড়িতে এলে এটাতে পড়াশোনা করি। টেবিলে ধাক্কা খেয়ে তুলসতেও তুলসীটা উলটে গেল। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি সেতলো ঠিক করতে লাগল। অমিও বাবা দিতে চেষ্টা করলাম।

বললাম, 'মসি তুমি অনেক পাল্টে গেছ।' মসিও মনে মনে ভাবলাম, একসময় আমাকে তো তার পছন্দমতই ছিল।

সত্যিই সে অনেক বদলে গেছে। একসময় আমার বাবা-মার সামনে সে একটু অস্বস্তিবোধ করত। এখন আমার সামনে যেন সে অস্বাভাবিক আচরণ করবে। আমি যখন ছোট ছিলাম, সে তো আমাকে মায়ের মত আদর করেছিল, না। অবশ্য, আমার মনে আছে, সে একটা টুলে বসে আমাকে দু-হাঁটুর মাঝে বসিয়ে তখতল করে আমাকে শোনাত সেইসব চটুল গান, যা গাইতে মা তাকে বারণ করত ; এমন সব রক্ত হিম করা গল্প শোনাত, যা তনলে নিতম্ব ছেড়ে আঁতকে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরত আর সে তখন তার কসরের গুটিকয়া দুধে চুবু দিয়ে বলত আমি কিছুতেই বড়ি হতাম না।

তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ আমারও নয়। কালস্রোতে আর সমাজের নিয়মচরিত ধারা আমাদের মধ্যে এভাবে ব্যবধান গড়ে দেয়।

অবশ্য নীরবতার মধ্যে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকাটা অস্বস্তিকর। মনে হল, কিছু একটা বলা দরকার। মা এসে পড়ায় নিশ্চিন্ত হলাম। মারেরও মেজাজ ভাল ছিল, হাঁটা করে বললেন, 'কিরকম মেয়ের বাড়িতে এসে দেখ, এখনও তোমার কসরে পর্যন্ত পৌঁছয়নি।'

এতক্ষণে খেয়াল হল, আমি বিছানায় বসে আছি আর মসি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

মা বললেন, 'দেখ, মেয়ে আমার চেয়ে মাথায় লম্বা হয়ে গেছে।' আমার পিঠের ওপরকার লম্বা বিনুনী দুটো দেখিয়ে বললেন, 'আজকাল ইস্কুলের মেয়েদের স্টাইল কত দেখ। দেখতে বেশ লাগে, তাই না।'

মিউ যেন তুলেই গেছে যে মায়ের কথার তার অন্তত মাথা নাড়ানো দরকার। কিন্তু মা কি বলছে সেদিকে তার খেয়ালই নেই। তার দুই চোখ শুধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। আট বছর আগেকার সেই বাচ্চা মেয়েটার সঙ্গে কোন মিল আছে কিনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এইটা মায়ের নজর এড়ায়নি। মা হেসে বললেন, 'তোমরা দু'জনেই দু'জনকে চিনতে পারনি। একজন তরতর করে বড় হয়ে গেছে, আরেকজন বুড়ি হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে দিনগুলো যে চলে যায়।'

তারপর আমাকে বললেন, 'দুইও নিশ্চয় কোনদিন আশা করিস নি যে মিউ মসি পাহাড়ের মধ্যে লুকানো আমাদের এই বাড়িতে কখনও আসতে পারে। তোরও তো খুশি হবার কথা। এই বাড়ি খুঁজে বার করতেও তো সময় লেগেছে। তোর মনে আছে, সেদিন ওকে খুব বকেছিলাম? সেদিন সে সবেমাত্র তোর জন্য একগাদা পানিফল আর পদ্মবীজ নিয়ে এসেছিল। আমি ওকে অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।'

মায়ের নিষ্ঠুরতায় অবাক হলাম। মসিকে তাড়িয়ে দিয়েছে সেকথা কি এমন সময় এভাবে কেউ বলে। পানিফল আর পদ্মবীজের কথায় আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। একটা দমকা বাতাস আমার জানালার পাশের আম গাছটার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। আমি তার একটা পাতা টেনে নিয়ে আনমনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মেঝেতে ফেলতে থাকলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে এল,

'তুমি কি করে জানলে এখানে আমরা এসেছি?'

'লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম। তোমরা তো আর কেল ছেড়ে যাওনি — এখন কিছু শক্ত কাজ নয়।' সে আমাদের মধ্যেই চটপট কথা বলে।

আরো কয়েকটা চুমু তাকে করতে যাচ্ছিলাম, মা আমাকে এক ঘোতনা জল আনতে বললেন, লিউকে দেখেন।

'আমি জানি এটাই তোমার সবচেয়ে প্রিয়' মা বললেন। 'যাও, রান্নাঘরে বসে এটা খেয়ে নাও। ওটা কেল পুডিং না, বেশি খেও না। কিছুটা রেখে দিও, বাড়ি নিয়ে গিয়ে বাবার সঙ্গে খেও।'

মসি রান্নাঘরে গেলে মা বললেন যে লিউ এখন একজনকে বিয়ে করেছে তার পাহাড়ে শত শতক দূর (প্রায় এক কাঠা) জমি আছে, তাছাড়া পালকি বাহকের কাজ করে। তিনি অবশ্য লিউ যে ভাসাভাসির থাকে তার নাম মনে করতে পারলেন না। তবে এই মূর্তিমান নারীর প্রতি তাঁর অসীম ধরন।

আমি লিউ মসির অতীত সম্পর্কে খুব কমই জানি। কেউ কেউ হয়ত কিছু বলেছিল। আমার তা ঠিক মনে নেই। এখন মা আমাকে পুরো কাহিনীটাই বললেন।

মসির যখন পনেরো বছর বয়স, তখন তাকে স্কুলের বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এক ধনীর কাছে বেচে দেওয়া হয়। এক রাতে তাকে প্রচুর মদ খাইয়ে তার চল্লিশোর্ধ বয়স্ক মনিব তাকে ধর্ষণ করে। সে যখন গর্ভবতী হয় তারা তাকে সেই বাড়ির পাথরের সিহ্ন কারখানে পেটের ভাইরে বের করে দেয়। বাচ্চা একটা জন্মায় সৌভাগ্যের, রাস্তার ধারে, জন্মের তিনদিন পরে মারাও যায়। একজন দয়ালু কাস্টমার ঐসব দেখে পরিচয় করে মসিকে একটা চেঁড়া মাদুরে মুড়ে কবর দিয়ে আসে। তারপর থেকে সে কখনো সেলাই করে, কখনো কাপড় কেচে দিয়ে অথবা কখনও শহরের প্রান্তে রাস্তার ধারে বসিয়ে হাত পেতে ভিক্ষে করে দিন কাটিয়েছে। কখনও পলিতে তরকারিও বেচেছে। সবশেষে আমাদের বাড়িতে আমাকে দেখাশোনার কাজ পেয়েছিল। এটা তার পরম সুযোগ। জীবন বদ্ধ বিচিত্র।

সে যদি ও পালাসক না হত, মা ওকে তাড়িয়ে দিতেন না। ক্ষমাপনে আপত্তিই ছিল তার সবচেয়ে বড় দোষ। আমার মনের মনটা খুবই নয়, আমার মনে আছে _ আট বছর আগের সেই দিন যেদিন লিউ মসি চলে যায়।

এরকমই গ্রীষ্মের দিন ছিল সেটা। দূরে মেঘগর্জন শোনা যাচ্ছিল। একটা গাছের নিচে হলুদ লিপড়ের সঙ্গে কালো লিপড়ের লড়াই দেখছিলাম। বাঁশের দরজার পর্দার ওপাশে মা জেগে-জেগে কোন এক মহিলাকে কি যেন বলছিলেন। ঠিক সেই সময় লিউ মসি গেট পেরিয়ে ঢুকছে। তাকে দূর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে সে আবার প্রচুর টেনে এসেছে। তার একহাতে মুটো মোটা পাথরীয়, আরেক হাতে পাশপাতার মোড়ানো কিছু একটা। তার মুখে যে কলসিটা ঝুলছিল তাতে তাতের মদ ছিল নিশ্চয়। পাশপাতার প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'তোমার জন্য কয়েকটা জিনিস এনেছি। প্রথমে পলিকলগুলো খেয়ে নাও, তারপর পাথরীগুলো খুলে দিচ্ছি।'

মা আমাকে পলিকল খেতে বারণ করলেন। লিউ মসি যখন আমার জন্য একটা প্লেট নিয়ে এল, তখন যে মহিলা এতক্ষণ মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল, সে মসির দিকে ফিরে গেল এবং কপালে একটা চাপড় মেরে বলল, 'দুই আবার ফিরেছিস? আর নয়, আজই তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যা, অন্য কোথাও কাজ দেখ। তোর জন্য অনেক করেছি। কিন্তু তুই ভাল হলি না। ঐ মূর্খটাকে পাঠাই মন দেলা দুই কিলুতেই ছাড়লি না। আবার মাথায় করে ঐসব বয়ে এনেছিস এই বাড়িতে।'

লিউ মসি তার কথার কোন জবাব না দিয়ে আমাকে পলিকলগুলো খেয়ে নিতে বলল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে ওর হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে মাকে ফিরে গিলাম। মা সারা শিরীরের ওজনে এমব্রয়ডারী করছিলেন। ফুল তোলা চকচকে কাপড় থেকে একটা আভা তাঁর মুখে পড়ে মুখটাকে কঠিন দেখাচ্ছিল। তিনি প্লেটটা চক করে টেবিলে নামিয়ে রেখে আমার দিকে এমন করে তাকালেন কেন আমি তার আগেই কাঁপতে শুরু করেছি। লিউ মসির কি হবে তার জন্য নয়, নিজের কথা ভেবেই।

সেদিন রাতে লিউ মসি আমাদের জন্য খাবার সাজিয়ে বসে ছিল না। আর মা তাকে খাবার জন্য ডেকেও পাঠাননি। মায়ের খাওয়া হয়ে যেতেই আমি রান্নাঘরে উঁকি মারলাম। দরজাটা বন্ধ ছিল।

দেখলাম, আমাদের চাকরেরা সবাই টেবিলের চারপাশে বসে আছে। তাদের প্রত্যেকের সামনে মদের কাপ। মসি যে কলসিটা এনেছিল সেটা টেবিলের মাঝখানে বসানো। তারা মনের আনন্দে খেয়ে চলেছে। জানে না যে একটা মেয়ে মেয়ের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে একজনের দিকে চেয়ে আছে। মসির মুখ লাল, মাথা ওটানো, ব্লাউজের বোতাম খোলা, গলাটা পুরো দেখা যাচ্ছে। এই প্রথম আমি মসিকে এই অবস্থায় দেখলাম, তার হাবভাব দেখে অবাক হয়ে গেলাম। পরে বুঝলাম যে ও যেহেতু আমাদের বাড়ির ভাত আর খাবে না, তাই যাবার আগে যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। গত তিন বছর ধরে তাকে নিয়মে বাঁধার চেষ্টা হয়েছে। পারা যায়নি।

'কাউকে বল না, শিরী মাকে তোমার হয়ে একটু বলুক, তিনি হয়ত রেখে দেবেন,' কে একজন বলল। 'অন্য বাড়িতে কাজ করা, সেখানে যা বলবে তাই করতে হবে।'

'তার কোন দরকার নেই। যখন আমাকে দরকার নেই, তখন থাকতে চেয়ে লাভ কোন মানে হয় না। কি-চাকরদের, এক পা থাকে দরজার এপারে, এক পা ওপারে। সব যদি ঠিকঠাক চলে তুমি ভিতরে ঢুকবে। নয়তো বেরিয়ে যাবে। হাত-পায়ের জোর থাকলে যেখানে খুশি চলে যাবে। একসময় তো ভিক্ষেও করেছি পেটের জন্য। আমার আবার ভয় কিসের।'

ওর ছটফট মা পাছে দেখে ফেলে আমাকে। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসে মায়ের কোটের মধ্যে মুখ ঘষতে লাগলাম। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

আমি শুধু কোঁপাতে কোঁপাতে বার দুয়েক বললাম, 'মা, লিউ মসি_।'

'আমি তাকে কালই চলে যেতে বলেছি। ঐরকম একটা মেয়েমানুষের ওপর আমি তোমার দায়িত্ব দিতে পারব না। তোমার দেখাশোনার জন্য আমি আরেকজন ভাল মেয়ে জোগাড় করব।'

তারপর খানিকটা যেন নিজেকেই বললেন, 'সত্যি বলতে কি, মেয়েটির কিন্তু খুব দরদী মন ছিল। ওর একটাই দোষ, মদ খায় বড্ড বেশি পরিমাণে। ওর জন্য দুঃখ হয় মণিও _ ও আমার জন্য যেকে যা করে নিজেকে সবই দুঃখ করে দেব। তাছাড়া এক মাসের মধ্যেই আর একজন গোস্তক ওকে বিয়ে দেব।'

পরদিন সকালে উঠে দেখলাম, মণী চলে গেছে। আর তারপর থেকে আট বছর পার হয়ে গেছে। কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে সে আবার আমাদের দেখতে আসবে। আমার খুবই অবাক লেগেছে, বিষয়টা সত্যি আমাকে স্পর্শ করেছে।

মা যদি তাকে তাড়িয়ে না দিতেন আজ তার এই দশা হত না, এমন নোংরা ছেঁড়া খোঁড়া পোষাকে তাকে দেখতাম না। তবে সব দোষটা আমার মায়ের ওপর চাপানোটাও ঠিক হবে না। আমার বিশ্বাস, মা হয়ত আমার ওকে আমাদের কাছে রেখে দেবেন।

লিউ যখন রান্নাঘর থেকে খেয়ে এল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'খেয়েছ তো ভাল করে?'

'খুব ভাল খেয়েছি। প্রায় দু'বছর বাদে তোমাদের বাড়ি এসে ভাত খেলাম।'

'তুমি ভাল আছ তো?'

'যে চলে যাচ্ছে কোনমতে। ভাল-মন্দ এখন দুই-ই সমান। ভাল না থাকলেও বেঁচে তো থাকতে হয়।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম, 'আমি বলতে চাইছি, দু'বেলা ঠিকমতো খেতে পাও তো?'

'না, তা পাই না। ও যা আনে তাতে কোনমতে একটাই চলে। পাহাড়ে ওদের এক টুকরো জমি ছিল, সেখানেই থাকি। আমি কাঠ কুড়িয়ে এনে পেটের ভাত জোগাড় করি। বেশির কাঠ পাইনা, কুলির কাজ করি। সন্তর আমি ষাটি পর্যন্ত আমি বাঁচতে পারি।'

'তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে?'

'খারাপ নয় _তোমাদের বাড়ি থেকে যাবার পর আমি তিনজনের সঙ্গে থেকেছি। প্রত্যেকেই আমাকে মারত। যখন সহ্য হত না পালিয়ে যেতাম। শেষ যে লোকটার সঙ্গে থেকেছি, তার কাছ থেকে পালিয়ে এসে এই লোকটাকে বিয়ে করলাম _'

'এ-ও কি তোমাকে মারে?'

'কল কি তুমি! তোমার কি ধারণা যে সবাই তার বৌকে পেটায়?' আমার দিকে চেয়ে সে একটু হাসল, যেন বলতে চাইল, 'তোমার বাবাও কি তোমার গায়ে মারত?' অবশ্য তা না বলে মণি বলল, 'তুমি কেউ বাড়াবাড়ি করতে তাহলে তো আমি সহ্য না করে সেখান থেকে পালিয়ে আসি।'

রাত হয়ে আসছিল। মণিও বাড়ি ফেরার জন্য চিন্তা করছিল।

'অন্ধকার হয়ে আসছে, বৃষ্টিও হতে পারে। আমাকে অন্তত পাঁচ মি পথ হেতে হবে। বাড়ি গিয়ে আমার দুটো মুরগি আছে তাদের খেতে দিতে হবে। পরশুদিনে একটু ঠাঁতা পড়লে একদিন তোমরা দুজনে এসে আমাদের বাড়িতে খেয়ে যেও। ' তারপরই মাথা নাড়িয়ে বলল, 'আমাদের বাড়ি না বলে তোমাদের খোলায় বললেই ভাল হয়। জানি তোমরা আসবে না।'

'আরেকটু থাকো মণি। তোমাকে আরো দুটো কথা বলার আছে। তোমার কি এতাবেই চিরটা কাল চলবে? একটা কাজ খুঁজিয়ে নাও না?'

'কি কাজ পাব? এখন কি তোমাদের সংসারেও আমার মত ভিখারীকে দেবে না। তাছাড়া আমার অভ্যাস তো জান, ঠিক থাকতে পারি না। আর সুস্থ কোন কাজ করতে পারি না, হাতে কড়া পড়ে গেছে। এই-ই ভাল। জীবনটা যেমন চলে, তাই মানিয়ে নিতে হবে। যত ভাই হোক, উপোস তো করছি না।'

আমার আর কিছু বলার নেই। তাকে আর থাকতে বলা যায় না। মা তাকে এক পায় সাদা ভাত আর যোগলে যেটুকু মদ অবশিষ্ট ছিল দিয়ে দিলেন।

এর কিছুকাল পরে আমি শহরে পড়তে চলে গিয়েছিলাম। লিউ মণি আর এসেছিল কিনা বা আমাদের জন্য যে মুরগি দুটো পালছিল, সেগুলো খেয়ে ফেলেছে কিনা, এসব কথা মা আর কোনদিন আমাকে বলেননি।

পরের বছর যখন বাড়িতে এলাম, শুনলাম লিউ মণি নাকি আবার এই স্বামীকেও ত্যাগ করেছে। কেউ জানে না তারপর সে কোথায় ভেসে গিয়েছে।

আমি ঠিক জানি। সে বেঁচে আছে এখনও। আমি আন্তরিকভাবে চাই সে ভাল থাকুক, অন্তত সে জীবনের অর্থ জানে।

▲▲▲

সাহেবগঞ্জ ১নং আঞ্চলিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম ও পোঃ - সৌচালিদা, জেলা ঃ বর্ধমান

আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে সকল সমবায়ীদের জানাই শারদ অভিনন্দন

নারায়ণচন্দ্র হাটী	অজয়কুমার মুখার্জি	দেবব্রত ঘোষ
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

সমবায় সম্বন্ধে জানতে হলে

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আন্দোলনের একমাত্র মাসিক পত্রিকা

ভা ❖ ণ্ডা ❖ র পড়ুন

● সমবায় নীতি, আদর্শ এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতির প্রচারে ● দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে
● জনমানসে মার্জিত রুচি ও বিজ্ঞানমুখী চেতনা সৃষ্টি করতে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত

ভাণ্ডার সর্বদা সচেষ্ট।

সমবায়মূলক প্রবন্ধ, সফল সমবায়ের কাহিনী, পুস্তক বিশ্ব, কৃষিশিল্প, চলচ্চিত্র, গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিষয়ক খবর, সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর সংশোধন, সমবায় বিভাগীয় সার্কুলার এবং সমবায় নিবন্ধকের নির্দেশ, ইস্যুবিহার এবং ভাণ্ডারের সংবাদ ভীমমুখী প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, চলচ্চিত্র ইত্যাদি আকর্ষণে ছাপা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রকাশিত বই

	বইয়ের নাম	লেখক	বর্তমান মূল্য
১।	ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট অফ মিউচুয়ালি এডেড কো-অপারেটিভ সো	অমিয় মজুমদার ও সত্য ভাদুড়ি	৮৫.০০
২।	সমবায় ও পরিবর্তিত উদ্যোগ (২য় সংস্করণ)	অনীশ রায়	২৫.০০
৩।	পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ও প্রয়োগ বিধি (২য় সংস্করণ)	অমিয় মজুমদার ও সুনীল মিত্র	১০.০০
৪।	সমবায় হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি (২য় সংস্করণ)	হরিদেব লাহিড়ী ও অজিত চক্রবর্তী	২০.০০
৫।	অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট (নিঃশেষিত)		
৬।	অ্যান অ্যানালিসিস অফ দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ রুলস (নিঃশেষিত)		
৭।	পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী (৩য় সংস্করণ) (অপ্রাপ্য)	অনীশ রায়	
৮।	আদিবাসী সৃষ্টিতে সমবায়	নির্মল বসু	০.৭৫
৯।	সোনসমান সমবায় (অনুবাদ)	উষা মৌলিক	৮.৫০
১০।	দি-অর্গানাইজেশন অফ কন্জুমার্স কোঅপারেটিভ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল	ডা. বি বি রায়	৫৫.০০
১১।	অ-কৃষিজাত সমবায়ের আজ দিক	অমিয় পালিত	১২.০০
১২।	পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন (১৯৮৩) প্রসঙ্গে		৬.০০
১৩।	সমবায় সমিতি নিরীক্ষণ পদ্ধতি (নিঃশেষিত)	প্রসন্ন মুখার্জি ও অপরেশ সাহা	
১৪।	সমবায় বিষয়ক বিবিধ কথিকা	অনীশ রায়	৫০.০০
১৫।	সমবায় আন্দোলন	অমিয় মজুমদার	১০.০০
১৬।	সমবায়ে মহিলা	—	১.৫০
১৭।	১৯৮৩ সালের সমবায় আইনের সর্বশেষ সংশোধনী		৭.০০
১৮।	বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি পরিচালন বাই-ল (উপ-বিধি) ও ঐ সংক্রান্ত অন্যান্য কথা		প্রতি কপি ৬.০০

বইয়ের মূল্য অগ্রিম পাওয়া গেলে ডাকমাশুলের কথা ভাবতে হয়। তাও পাঠান যায়।
অন্যান্য রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের নিজস্ব অফিস কাউন্টারের প্রতি সদস্যের নিজ এলাকা পর্যন্ত বই ও উপবিধি বিনামূল্যে পাঠান হয়।

গল্প

প্রতিবন্ধী

সারদেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরনো সেই অভ্যেসটা যেন সেই অতি-সকালে। বেলার শব্দটাকে এখন নিজের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে নিয়েছি। মানে, নিজে হয়েছে তাই কি। চাকরিতে ঢোকা অবধি করেছিলাম অনেক। কিন্তু করার। কিন্তু পাওয়ার। আর সব কিন্তু হারিয়ে, অসহায় চোখে যে যে অধিকারবোধে দিন-রাতের চলে যাওয়া দেখি।

যেন ঘোর যে কেটে নিজে হয়ত অনে পড়ে ছাদ দেওয়ার একলা আকাশ হয়েছিল। সেই অসহায়ই মুখ ঘোঁচি। একটা অলৌকিক সুযোগের অপেক্ষায় মনের উত্তেজনা নিবিল করতে অন্ধকারেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি মুখের বেকটার দিকে যাই। আমার মনের সাথে তাল মিলিয়ে আকাশটা তোমনিন থাকে থোবড়া মুখে, তেমনিন সাজে কলমলে রোদে।

বেলার সাথেরও বেলার একটা সীমা আছে। আমি সেই পর্যায়ে এখনও যাইনি। মোটামুটিভাবে, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়ে বলা, মা, ভাই, ছেলের সাথে শুধু দরকারের কথা বলে আর পূর্বাশা চাকরী পাওয়ার পুরস্কারের অজিতের সাথে আজীবনের সম্পর্ক শেষ করে নিজের বেলার বাড়ি অজিত করেছি। প্রতিদিন। একভাবে। পরিপূরকের বেকটার মতো। আমারই মত অজিতের কল্পনাপ্রবণতার নিয়ে।

আর আমি। যেন একা ঠিক পাত্রে সাজে না। যেন শরীরে পড়ে নিয়েছে আজ। অনেক, অনেক বেলা পর্যন্ত আমাদের বাড়িতেনীচের বাবী উনোন যাটের মতো আমারী বেশ্যা। বাড়ি আসে সাজে। যাটের বেকটার মতো আমার আমার মুখে বাবী পীতাম্বরের মেয়েটার মতো।

আমার ইচ্ছে হয়েছিল সেই পথের মাঝে ভঙ্গ হয়ে নিজেকে শেষ। যতক্ষণ না মন্ত্র আমার ওপরে প্রতিবন্ধী অজিতের ক্ষমতা বন্ধ হয়ে আমার সেই আর বাবী আখা দেওয়া যায়।

বাড়ি ফেরতে হয় না। পরিচিতরা আমাকে ঘর নিয়ে ঠিক একটার সময় অজিত বন্ধ করেন। ফোনের আমার বিকেল চারটেতে। ওখান থেকে সারদেন্দু আমি পাই প্রতিবন্ধীর।

আমে নিজে বাড়িতে নিজে আসি। আকাশ ফেরেফেরে তাতমুখ। ফোন পরে এলে নিজেকে ফরেফেরে নিজের মনিন্দ মুখে মুছিয়ে আমার সেই পরির মুখে তাকাতাম।

সন্ধ্যা আমে বীর পায়। আমার দু'পাশের ফোকানগুলো থেকে আলো ছলে ওঠে। সামনে নিয়ে চলে আসা মেলা সুন্দরী মেয়েরা আজ চাদরিতে ফেকে আসে পাশ আত্মীয়ের গন্ধ। কথার পরে রাত বাড়ে। পীতের রাত। বিভিন্নভাবে বেকটা থেকে আকাশ এক এক করে 'সেই ছবেলার' রাজকুমারদের উঠে পড়া শুরু হয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসা আকাশ ফোন আমার জন্য আমরা তিন-চার জন তাকাত বসে থাকি।

আনেকক্ষণ কথা শেষ হয়ে যেত। পেড়া আমাদের পরে যাওয়ার তাড়ি। রাজার ফোনালে মন্ত্র নিয়ে যেন ট্রেনের আওয়াজ কানে এসে আমিও উঠে পড়ি। পা বাড়াই বাড়ির দিকে।

ইন্টিরিয়রীন নিজনেরে মোহনেরা উঠেও প্রতি বড়ী অজিতে ফোন মুছে যেত। আকাশের সারদেন্দু আমা নিয়ে এসে। তখন চলনের যে প্রতিবন্ধী আমার আমা ইচ্ছে নেই। যেন, পোঁড়া, আর মোহনেরা এই আকাশবাতাসই মু'চোখ ভরে দেখতাম। মানুষ মোহনে উদাসভাবে তাদের আর্তার নিয়ে বলতাম, 'আজ যাব, তখনও আমাদের যে এমন পরেনি।' আমার এই কথায় যে আমন পেত আর যে পেত না তা বোঝার পরিচয়।

পীত এমন আর। শুধু আমে আমে যেন কোনদিন টের পাইয়ে যের আমেরাজারের আমিত। আকাশ-আকাশ পীত। আমাকে পীতের একটু বেশিই পড়ায়। মনে আমি সবাই মুকুলমুকুলী হয়ে।

— 'আজ, এল আমি নিশ্চয় পরীক্ষাটা দিতি নাকি। তাহলে টেনশন থেকে কথাটা মুছে দিন।'

যেখা থেকে যেন এসে, বেকটার কথাতে কথাতে নিজু বলল।

চাদরটা আল আমে পাত্রে আমিয়ে নিলাম। তারপর একনজরে উঁচুতে বিলাম যেন একনজরে চার চারটে চাদরি আমার পাওয়া হয়ে গেছে।

— 'মুন, মুন, এ কথা আমি কি হবে।'

আমাদের আজলিন আমে উঁচল। হঠাৎ পাশলামের মাঝে লক্ষ্য করলাম একটা মহীমূর্তি পীতের মুজনা নিশ্চয়টার যৌবন পাশা যেন করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। সচেতন কলাম সবাই।

মহিলার বয়স চল্লিশের কোঠায়। পুষ্ট শরীরে একটা বিলাসী ভঙ্গিমা। পরনে সস্তা চাদরটা যেমনই মানাই ছিল। এখন চিনটাক ভঙ্গ যেমা যায় না।

বউটা আমাদের একনজর কাছে এসে দাঁড়াল। আমাদের কথা শেষে শেষে। চাদরটার এক কোন মুখে চাপা নিয়ে বউটা ভখনও ঠোঁট কাঁপিয়ে। মাজার ইন্টারভেনেই ছলে ওঠা আলোটা স্থির হয়েই দেখি বউটার মু'চোখ নিয়ে যেমন জল পড়ছে।

'কি হল আপনার, ঔমনভাবে যেন।' — প্রায় একসাথে আমাকে নিজে চাদরটা তুলে দিই। চাঁপা কান্নার ওমনটি আরও বাড়ে। আমাদের যেমনভাবে প্রতিবন্ধী অজিতের দিকে আঙুল তুলে যেমন বউটা।

আমরা এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করি। তবে কথা মুকুলরা ওখন ইন্টারভ হওয়ার মহিলার যেন যেতে উঠে দাঁড়িয়েছি।

'কি হয়েছে বলুন না আল করে।' — অজিত তার যেমনের।

'আঁ, আঁ' একটা গোঙানির শব্দ ওনে সবাই আকাশের বউটার মুখের দিকে। যেমা মুখে সমান শুধু ঘোর বৃষ্টি। বাদি ঘোর বড় বড় করে আর হাত দুটোর সমাবেশে আমাদের তার বিশাল যেমনের সে কি

প্রাণপণ চেষ্টায়।

আমরা ওরা সন্ধ্যা সবাই থেকে একরকম নির্বাসিতই, তাদের থেকে সহজ গলায় এখন আর কেউ কথা বলে না, তাদেরকে ভালবাসা আমরা ভেবেছে, ঔপকারী ভেবেছে এই প্রতিবন্ধী মেয়েদুটিকে। টিন্‌টিন্ করছে দুটো। অনেক হাত পেরিয়ে, দিন বদ্লিয়ে ভোরের ডাকই এল আমার চোখে।

বোবা বউটাকে সাথে নিয়ে ছাড়া পেয়েছিলাম আমরা। প্রতিবন্ধী অফিসে পরিতোষদা ছাড়াও আরও দু-একজন বসে আছে। আমাদের দেখেই পরিতোষদা বলেছিল, 'কি ছাপার একসঙ্গে সবাইকে দেখছি যে।'

আমাদের অবস্থা চোখে বউটা সামনে এল আমরা কিছু বলার আগেই।

— 'ও মালতির কথা বলতে এসেছে। আরে এক সমস্যা। ওর মেয়ে এসেছিল বিকেলে অফিসে। ভাতার টাকাটা নিতে। শম্পা অবশ্য ওর মার মতো বোবা না। কিন্তু পোলিওতে ঠিকভাবে হাঁটতে পারে না। হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। মুশকিল হলো, ও নাকি এখান থেকে আর বাড়ি যায়নি।'

মালতি কেঁদে চলেছে তখনও। আমরা কি করব বুঝতে পারছিলাম না। ঘরের বাতাসে অকস্মাৎই যেন শীতের টান খানিক বেশি করে।

'আরে মেয়েটা অতি কষ্টে হাঁটে, দেখতে শুনতেও ভালো নয়। কোন ছেলের সাথে পালিয়ে টালিয়ে যায়নি। ম্যাথো কোন্ বন্ধু বাড়ি খুঁজে এতক্ষণ ফিরে এসেছে। এযাত্রা যাবে কই।' শেষ দিকে পরিতোষদার গলা বিকৃত হয়ে এল বিরক্তিতে।

আর দাঁড়ালাম না আমরা। পায়ে পায়ে ফিরে এলাম প্রতিবন্ধী অফিস থেকে। অবশ্য লাগছিল আমার। এই হঠাৎ পড়া শীত, কাজলতলা মালতিদি আর পরিতোষদার বিরক্তি সব। সবকিছু।

খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের মধ্যে একটা আলোচনা করে নিলাম। মালতির বাড়িতে একবার ফোন করে না হয় শম্পার বন্ধু বাড়িগুলোতে একবার খোঁজ নেওয়া যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত এই অসময়ে হঠাৎ নিরি ঘরে বসবার মালতিদিকে একা ওই সংকটের মধ্যে ফেলে আসতে মন সরল না।

আমরা চলেছি একসঙ্গে। মালতিদি একটু আগে। নীরব পথপ্রদর্শক হিসেবে। এইমাত্র নিরন বাল্‌বের আলো ছেড়ে জ্যোৎস্নার আওতায় পড়লাম। চারধারের বাড়ি ঘরেও পরিবর্তনের স্বাক্ষর চোখে পড়ল। দু-চারটে পাকা বাড়ি এদিক সেদিকে। আর সব বেড়া দেওয়া কাঁচা বাড়ি। তার মধ্যে কোনটার থেকে ট্রানজিস্টরের গান ভেসে আসছে।

রেললাইন, ঘাট-সরকের কেওড়াকে ঘিরে সেওড়া এসিয়েছে। লাইন টপকে মাঠে নেমে একটু নিচে মালতিদির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। উঠোনের চার পাশে কৃষ্ণকলি গাছের ঝাড়। ঝি ঝি ডেকে চলেছে একসঙ্গে। ঘরের দাওয়ায় হ্যারিকেন নিয়ে আসা জ্যোৎস্নার সারা গায়ে চুমকি বসিয়েছে দরিদ্র।

মাটির বারান্দায় একটা চৌকি পেতে বুড়োমত একজন লোক বসেছিল। আমাদের পায়ের আওয়াজে মুখ তুলে চাইল। ঘেন শতাব্দীর ঘুম ভেঙে উঠল। লাইনের জল আলোতেও মুখের ভাঁজগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'ও মালতি, শম্পা এখনও আসেনি যে।' বুড়োর গলার স্বর কেমন করুণ শোনায়। কথাটা শুনে ফেলেই মালতিদি ছিটকে সরে এল ঘরের সামনে থেকে। রেল লাইনের দিকে ঘেন পা চালাল সজোরে।

কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম আমরা। আমরা মানে আমি, পিন্টু আর গোপাল। বুড়ো আমাদের দিকে আর ফিরেও চাইল না। কাশতে লাগল একমনে, দমকে দমকে। আমরা জানলাম না বুড়ো শম্পার কে?

অন্ধকারের ভাবটা এখন চোখে অনেকটা সয়ে এসেছে। গাছগাছালির যাত ঘরে আরামের জায়গায় নেমে এসেছে চাঁদের আলো। উঠোনে দুটো বাড়ি একটা ঢুকে ভারে মেলা। একটা বোধহয় স্কুল ড্রেস, কাঁধের ব্যাগটা ঝোঁড়া। হয়তো ওকিয়ে ফেছে কিন্তু ঘরে তোলারও অবসর হয়নি। মুহূর্তের জন্য এই আলো আঁধারির আবছায়াতে দাঁড়িয়ে পরীক্ষীর মেয়েটাকে ঘেন স্পষ্ট দেখলাম। খোলা মাঠের দিগন্তের নরম ঠাণ্ডা ঘাস বুকে নিয়ে নীল জ্যোৎস্নায় ঝিলিয়ে যাচ্ছে।

'কি যে চল, মালতিদি যে অনেকটা এগিয়ে গেল।'

'যাঁ যাঁ, চল' — চমক ভাঙে আমার।

প্রায় দৌড়েই ধরলাম মালতিদিকে। ও ঘেন ঢেউগুলা ঝাড়িয়ে হেঁটে চলেছে সামনের দিকে।

'মালতিদি, ওর বন্ধুর বাড়িগুলো আগে দেখি। আপনি শুধু বাড়ি দেখিয়ে দেবেন, আমরাই খোঁজ নেব। তয় পাবেন না, আমরা তো আছি।' গোপাল বলে।

জ্বাল জ্বাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল মালতিদি। আমাদের মুখে বোধহয় ওর আত বিপদের ভয়াল রূপের ছায়া পড়েছিল।

তারপর একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মালতিদি হাত তুলে দেখাল তার সব-গুলোতেই খোঁজ নিলাম আমরা। উত্তেজনা বিতিয়ে পড়ে এখন বিরক্তি আস্তে আস্তে মাথাচাড়া দিচ্ছে। ক্লান্ত লাগছে খুব। কিন্তু মালতিদির সামনে দাঁড়িয়ে ওর সেই রক্তশূন্য সুতীর চামড়াটা, কম্পমান গাল, বোবা মুখের নির্বাক অসহায়তায় ঘেন নতুন করে খারাপ লাগছে।

আজ শম্পা ঘেন বন্ধুর বাড়িই যায়নি। ঘেন বাড়ির থেকে এও শুনতে হল —

'এঁা, তলে তলে এতো।' অবশ্যই চাপা গলায় ওনিয়ে। মানুষের বিপদে আনন্দ পাওয়া মানুষ, মানুষের দুঃখকে স্বার্থের রঙে রাঙান মানুষ-পশুর ভিড় সমাজের প্রতিটি তলায়।

'পিন্টু কি করবি বল্' — আমি বললাম।

যে কোন ধরনের বিপদে অসহায় ঠাণ্ডা থাকে ওর মাথা। আজকে ওর কপালেও ঘাম। আমরা তাহলে কি করি!

'চল, থানায় চল্। একটা ডায়েরি করে আসি। ঘেন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলেও তো ওরাই খবরটা দেবে। ওদের জানানো উচিত' — চাপা অস্থিরতা পিন্টুর গলায়।

'ঠিকই বলেছিস, চল তাড়াতাড়ি' — গোপাল বলল।

এরপর আমার মতামত জানানো নিষ্প্রয়োজন। মালতিদিকে পাশে নিয়ে ওদের পিন্টু পিন্টু থানার দিকে হাঁটা লাগালাম।

থানায় ঘেতে পৌঁছে লোকজনের ভিড়ে ঘেন কিছুটা টেনশন কমল। মালতিদির দিকে তাকানো যাচ্ছে না। বিধ্বস্ত অবস্থায় থানায় ঢুকলাম। থানার ঘেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজল। 'ইস্, এর মধ্যে ন'টা ঘেজে

গেল।'

থানায় ও সি নেই। কোথায় যেন ইন-ভেস্টিগেশনে গেছেন। ক্লান্তিক অবস্থা আর একটু ভালো হলে নির্ঘাত হেসে ফেলতাম। বড়বাবু গোছের একজনের সামনের একটা বেঞ্চে হেলেদুলে আমরা সবাই বসে পড়লাম। ভদ্রলোকের সামনে মেলাই ফিড়। একসাথে তিন চারজনকে কি অসম্ভব দ্রুতভার সাথে প্রশ্ন করছেন।

বসেই রইলাম আমরা। কখন বিড়ালের ভাগ্যে শিঁকে ছেঁড়ে এই আশায়। একটা সিগারেট খেলে হত। বাইরে যাওয়ার জন্য বেঞ্চ থেকে যেই উঠতে গেছি অমনি মালতিদি আমার হাতটা, ওর দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রইল। ভয়ে, ভরসা হারানোর ভয়ে। আমার আর যাওয়া হল না।

প্রায় ঘন্টাখানেক এভাবে বসে থাকার পর আমাদের ডাক এল। ভদ্রলোকের মেজাজটা, নামুস-সুদুস চেহারায় পুলিশের পোষাক একদম বেমানান। কেমন ভালমানুষ ভালমানুষ চেহারা। বেশ আন্তরিকভাবেই আমাদের কথা শুনলেন। লিখে নিলেন ডায়েরী।

'স্যার, যত তাড়াতাড়ি পারেন একটা ব্যবস্থা করুন। বুঝতেই পারছেন স্যার' — কিসের প্রায় গলে যাওয়া শিশুর স্বর।

'আজ্ঞে, পুলিশকে কি মনে করা তোমরা। আমাদের পারারও তো একটা সীমা আছে। আমরা চেষ্টা করব ঠিক। এখন যাও তোমরা।'

এরকম সমস্যা নিয়ে আসা যুবকদের আপনি বলার নিয়ম বোধহয় পুলিশী আইনে নেই।

থানা থেকে বেরিয়ে টেন পেলাম পেটের ভেতরটা খিদেতে খুঁইখুঁই করছে। একটা সস্তা চা ভাতের দোকানে এসে ঘুঘনি আর পাউরুটির অর্ডার দিল সোপাল। মালতিদি এখনও যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে। আমরা যৌথ করে সিগারেট ধরালাম।

দোকানের বাচ্চা ছেলেটা ঘুঘনি নিয়ে গেল প্লেটে করে। আর সেঁকা পরম পাউরুটি। ঘুঘনির প্লেট থেকে হালকা ধোঁয়া উঠছে। জল মুখে চলে ফুটে ভাত হচ্ছে। ভাতের গন্ধ নাকে আসছে। ঘুটো গন্ধ আমাদের সাক্ষী রেখে মিশে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে, দোকানের সবাইকে অবাক করে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল মালতিদি। চিরকুটের রূপ নেবে তার মনে পড়েছে সন্তানের মুখ।

থানায় একদম কাইটার বলে জীবনে এই প্রথম অনুভব করলাম আমরা প্রত্যেকে কত অসহায় — কি ভীষণ প্রতিবন্ধী।

▲▲▲

With Best Compliments From

The Gannons' Staff Cooperative Credit Society Ltd.

23A, N. S. Road (4th floor)
Calcutta - 700 001
Phone : 220-0261 (4 lines)

দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা -৭০০ ০০১
এর পরিচালিত
পুরীতে অবস্থিত হলিডে হোম
কয়েক বছর ধরে সদস্য ও বন্ধুদের চাহিদা যথাসাধ্য মিটিয়ে আসছে

হলিডে হোম ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সোসাইটির অফিসে পাওয়া যাবে

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী

(তৃতীয় সংস্করণ)
সর্বশেষ সংশোধনীসহ
অসীম রায়-কৃত

আনুষ্ঠানিক অনুবাদ বইটি শীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে।
৫ বা তদূর্ধ্ব কপির জন্য ২০% কমিশন পাওয়া যাবে আমাদের কাউন্টার থেকে।

বর্তমান গ্রাহক চাঁদা ঃ

প্রতি সংখ্যার মূল্য	৫.০০ টাকা
ষান্মাসিক চাঁদা (সডাক)	২৫.০০ টাকা
বাৎসরিক চাঁদা (সডাক, ১১টি সংখ্যা)	৫০.০০ টাকা
আজীবন চাঁদা (সডাক)	৫০০.০০ টাকা

সাধারণ ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপনের হার ঃ

চতুর্থ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা	৭০০.০০ টাকা
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা	৬০০.০০ টাকা
ভিতরে এক পৃষ্ঠা	৪০০.০০ টাকা
ভিতরে অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০.০০ টাকা
ভিতরে এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	১৫০.০০ টাকা
রঙীন এক পৃষ্ঠা (ভিতরে)	৬০০.০০ টাকা

- ছয়টি অথবা তার বেশি সংখ্যক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে শতকরা ২৫ টাকা ছাড় দেওয়া হয়।
- বিজ্ঞাপনদাতাদের পক্ষে ভাণ্ডার একটি কমপ্লিমেন্টারি মাধ্যম।
- ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপন দিয়ে সমবায় আন্দোলনের এই মুখপত্রের আর্থিক বনিয়াদ শক্তিশালী করুন।
- মাসিক ভাণ্ডারে আপনার দেওয়া বিজ্ঞাপন পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অগণিত সমবায়ীর কাছে পৌঁছে যাবে।
- আপনার বাৎসরিক গ্রাহকমূল্যের মধ্যেই পাবেন অপূর্ব প্রচ্ছদ ও প্রতিযশা কবি-সাহিত্যিকদের মনমাতানো লেখায় সমৃদ্ধ বৃহৎ কলেবরের এক 'শারদীয় ভাণ্ডার'। মূল্য পঁচিশ টাকা।
- ভাণ্ডারের গ্রাহক চাঁদা এবং বিজ্ঞাপনের মাশুল "West Bengal State Co-operative Union"-এর অনুকূলে ব্যাঙ্ক ড্রাফট/চেক অথবা মানি অর্ডার যোগে পাঠাতে হবে। তবে ড্রাফট/চেক কলকাতার উপরে হওয়া চাই।
- নিজে এসে কিংবা প্রতিনিধি মারফত টাকা সরাসরি জমা দিতেও পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

সম্পাদক, ভাণ্ডার
২০এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন ঃ ২২০-৮১৯৮

ছোটগল্প

হায়েনা

রতন মুখোপাধ্যায়

রাস্তায় পা দিয়েই কমলা বুঝতে পারল আজ তার অনেক দেরি হয়ে গেছে। এতটা দেরি করা উচিত হয়নি তার। অবশ্য উপায় ছিল না। ঘরে মায়ের শরীর বিশেষ ভাল নেই। হপ্তা দুয়েক ধরেই ঘুসঘুসে জ্বর, সেইসঙ্গে গায়ে প্রচণ্ড বেদনা। তার ওপর তার যা চিরকেলে দুর্বল। সারা জীবন দুঃখ-ধান্দা করে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গেছে। সেইজন্য শরীর খারাপটা খুব একটা ভাল ঠেকছে না। ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন খুবই। কিন্তু সে ভাল করেই জানে, তাদের সংসারে ডাক্তার দেখানোটা বিলাসিতারই সামিল। যে সংসারে রোজগেরে বলতে ওই কমলাই, আর খাওয়ার লোক পাঁচজন — কমলা নিজে ছাড়াও মা, দু'বোন আর এক ভাই। বাবা অনেক কাল আগেই গত হয়েছেন। বরাতজোরে সে সাবানের কারখানাতে এই কাজটা পেয়ে গেছে। তাইতেই তো সংসারের ঘানিতে কয়েক ফোঁটা তেল জুটে যাচ্ছে। অবশ্য মা ছাড়া দু' বোন, ভাই এরাও সাহায্য করে সংসারে — ঠোঙা বানিয়ে, সেলাই করে, বুড়ি ভেঙে, এইসব টুকিটাকি কাজকর্ম করে।

কমলা এতদিন ঘড়িতে কিছুই জানায়নি। ভেবেছিল মায়ের চিকিৎসোটা করা দরকার। নিজের থেকে যে কি হয় কে জানে। তাছাড়া দিনকে দিন বাজার যা হচ্ছে। তাই ওরই কারখানার সবিতাদির কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। বিকেলে ছুটির পর ঘণ্টা তিনেক ওভারটাইম করার জন্য। মালিক লোকটা ভাল। তার দুঃখের কথা সবই জানে। তাই সে এ ব্যাপারে কমলাকে আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিল।

সেই ওভারটাইমের টাকাটা আজ হাতে পেয়ে খুব খুশি হয়ে উঠেছিল কমলা। ভেবেছিল কাল রবিবার আছে। কালকেই মাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আনবে। কিন্তু কারখানা থেকেই বেরোতে দেরি হয়ে গেল। কিন্তর কাজ জমেছিল। সেগুলো সেরে, ওভারটাইমের হিসেব বুঝে টাকা নিয়ে যখন রাস্তায় পা দিল, তখন — তা রাত ন'টা তো হবেই। বুকটা দুরদুর করে উঠল। এমনিতেই এই আধা শহর-আধা গাঁয়ের রাস্তাঘাট রাতে ভয়ানক, তার ওপর এটা কার্তিকের শুরু। বাতাসে শীতের কামড় না থাক, একটা শিরশিরানি আছে। টাকাগুলো রুমালে বেঁধে ব্লাউজের ভেতরে রেখে, গায়ের কাপড়টা টানটান করে জড়িয়ে নিয়ে কমলা একটু পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল। মিউনিসিপ্যালিটির টিমটিমে আলোগুলো দূরে দেখা যাচ্ছে। ওইদিকে লক্ষ্য রেখেই সে এগোতে লাগল। মিউনিসিপ্যালিটির অফিসের পাশেই একটা বড় মাঠ, সেটা ছেড়ে কোনক্রমে একবার মাঠ পার হতে পারলে বস্তির মুখে পড়বে। কমলার বুক দুরদুর করছে। সেওয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছে। সেওয়াল কোনওরকমে টিকে আছে। মাথার ওপর ছাদেরও সেই দশা। তবুও কমলা যখন মায়ের পাশে শুয়ে অন্য ভাই বোনদের জড়িয়ে ধরে রাতে ঘুমোয়, সারাদিনের ক্লান্তির পরে, তখন সে স্বপ্ন দেখে — সত্যিই তাদের ভাঙা ঘরটা একটা রাজপ্রাসাদে পরিণত হয়ে গেছে। কত শান্তি, কত আনন্দ। ঈশ্বরের ভালবাসা যেন তাকে ক্লান্তি কর্মক্লান্তির ঘুমিয়ে দেয়।

তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে কমলা হোঁচট খেল। সামলে নিয়ে আবার হাঁটতে থাকে। তার রুগ্ন মা হয়তো ভাতা ধরনের বেলান নিয়ে বসে আছে — তারই পথ চেয়ে। বোনগুলো মায়ের পাশে বসে মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, ভাই হয়তো ঘরবার করছে — দিদি কেন এলো না। ভাবতে গিয়ে তার বুকচোখে জল এসে যায়। ভগবান যদি তাদেরকে সুখের মুখ দেখার, ভেবে তার মনের সমস্ত দিত — তাহলে আমের সংসার সোনার হয়ে যেত।

কমলা মাঠে নামার আগে ঘুরে হাত দিয়ে আলগোছে ব্লাউজের ভেতরে ওভারটাইমের টাকাটা স্পর্শ করে। মনে মনে ভরসা পায়। জীবনে এই প্রথম চাকরির টাকা ছাড়াও বাড়তি টাকা সে রোজগার করেছে। এই বাড়তি টাকাটুকু দিয়ে সে মায়ের চিকিৎসা ছাড়াও অনেক কিছু করার পরিকল্পনা করে নেয় মনে মনে।

মাঠের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অনুব চলে বলে, মাঝ উঠে মৃত্তিকা মেয়ের সিঁথির মত সরু রাস্তা তৈরি হয়েছে। আঁধারে সে রাস্তা চেনা যায় না। তবুও আলোয় ভরা ঘরে কমলা মাঠ ভেঙে এগোতে থাকে। আঁধারের বেলায় নিজস্ব একটা আলো থাকে — সেই আলোর সঙ্কেতচিহ্নের মত এগিয়ে চলে। খানিক দূরে এগিয়ে তার নাকে একটা উৎকট গন্ধ ধাক্কা মারে। পিছন ফিরে তাকাতেই একটা লাল আগুনের কিণ্ডু নজরে পড়ে। কমলার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে ওঠে। বুঝতে পারে, একটা লোক চুল্লি পরিষ্কার পাশ কাটিয়ে গতিরোধ করে তার সামনে দাঁড়ায়। লোকটার চোখ-মুখ চেনা যায় না। লোকটা ধমক ছাড়ে —

— দাঁড়াও।...

অন্ধকারের বুক চিরে বিড়ির আগুনটা জ্বলছে — কখনও তীব্র, কখনও ক্ষীণ। কমলা বাকহারা। পরে যেন লোমার শেষল পরিয়ে দিয়েছে কেউ। তার নজর এড়ায় না। — অন্ধকারে হায়েনার চোখের মত জ্বলতে জ্বলতে আরও দোটা তিনেক লাল আগুনের কিণ্ডু এগিয়ে আসছে। খানিক দূরত্ব রেখে তারা পাশে দাঁড়ায়। সব লোকগুলোকে তার মনে হয় ভূত, পিশাচ। নামাবলের নোংরা তাদের চোখ জ্বলছে, জিভে লালসার লাভারোভ ঝরে চলেছে। প্রথম লোকটা গলায় মৃদুতা এনে বলায় —

'— কি আছে। সব দিয়ে দাও।' —

— কি-কিণ্ডু নেই আমার কাছে' — কমলার কণ্ঠ কেঁপে ওঠে। সে জড়সড় হয়ে দাঁড়ায়। তার মনে হয় — এই লোকটা ওদের পাতা, — বাকিগুলো চেলা চামুণ্ডা। সে অদৃশ্য ঈশ্বরের কাছে মনে মনে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। হঠাৎ গলায়

জোড় এনে উপস্থিত করা হলো ঘরে বলে,

— 'আমায় ছেড়ে দিন দয়া করে। আমার মা অসুস্থ-খুব অসুখ' - অন্ধকারে হাহাকারের সাঁয় ভাসলো। একজন বলে—

— 'ওস্তাদ। মেয়েটা সহজে মানবে না মনে হচ্ছে ——

প্রথম লোকটি বলে,

— 'ভালভাবে সব কিছু দেবে — না, ইজ্জতে হাত দেব।

বাকি তিনটে হাহাকার অশ্লীল হাসি হাসে। কমলার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। সর্দার গোছের লোকটি তার একটা হাত চেপে ধরে। কমলা লোকটির সাঁড়াশির মত হাতটা ছাড়াতে ছাড়াতে বলে।

— বিশ্বাস করুন, আমার কাছে কিছু নেই, আমার মায়ের খুব অসুখ।

লোকটি কমলার হাত ছেড়ে দেয়। বোধহয় মায়া হল। কঠিন গলায় সে প্রশ্ন করে,

— 'কোথায় থাকো। একটু ভেবে আমায় জিজ্ঞাসা করে - 'এদিকে, এতরাতে কোথায় গিয়েছিলে?'

কমলা কথামত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে,

— 'আমি সাবানের কারখানায় কাজ করি। কাজ থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেছে।' একটু থেমে উত্তরীয় কণ্ঠে অবস্থানটি করার তাগিদে বলে,

— 'ওইখানে, ওই ঘাটের ধারে একটু দূরে আমার বাড়ি।'

লোকটি সরে দাঁড়ায় কমলার চলার রাস্তা থেকে। বলে,

— 'এতরাতে এদিকে আর কোনও দিন এসো না।' তারপর ধমকের সুরে চিৎকার করে ওঠে,

— 'যাও।'——

কমলা কয়েক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল। এত আসান হয় নাকি। শিকার হাতে পেয়ে কেউ ছেড়ে দেয় না কি? তারপর মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে — দৌড় লাগায়, অন্ধকারে , মাঠ মাঠ ভেঙে, - বাঘের থাবা থেকে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাওয়া হরিণীর মত।

সর্দার গোছের লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে তার শাকরেদরাও অবাক হয়ে গিয়েছে। একটা যুবতী মেয়েকে এভাবে পেয়ে অন্ধকার রাতে কেউ ছেড়ে দেয়। সর্দার কি পাগল হল। নাকি অন্য কিছু। —

বিড়ির আগুন নিভিয়ে তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করে,

— 'ওস্তাদ। তোমার হল কি? টাকা পয়সা কিছু নিলে না।' ——

লোকটাকে থামিয়ে সর্দার খেঁকিয়ে ওঠে,—

— 'গরিব ঘরের মেয়ে টাকা পয়সা কোথায় পাবে, শুনি' —

অন্য একজন বলে

— 'কিন্তু অমন একটা ছুঁড়ি পেয়েও' ——

— 'বাজে কথা বলবি না।' — ধমকে ওঠে সর্দার।

তৃতীয় জন বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,

— 'তোমার হলটা কি, সেটা তো বলবে। এমন তো কোনও দিন দেখিনি' —

সর্দার বিড়িতে শেষ টান দিয়ে, সেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে ,

— 'ওই রকম আমার একটা বোন ছিল যে' ——

▲▲▲

With Best Wishes From

WTIL Employees' Co-operative Credit Society Ltd.

4 & 5 Canal West Road
Calcutta - 700 039

With Best Compliments of

The Shipping Corporation Cooperative Credit Society Ltd.

13, Strand Road, Calcutta - 700 001

Step in our Holiday Home at

"HOTEL AJANTA"
Rajbari Compound
Digha, Midnapur

"আমার যদি জন্মই হয় তবে যেন ঐ রকম নীল-ধীরেন পর্যটিতে অভাব অনটনের মধ্যে পল্লীর মধ্য তেরো প্রথম নদী, পাহাড়পাল, নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মেয়েরা মৃদুস্বরে মধ্যেই হয়।"

— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওপর সেই ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ৩৭ বছর ধরে
গ্রাম বাংলার কৃষক ভাইদের অতি পরিচিত বর্তমানের

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ বি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন ঃ ৪০-১৭৮৬, ৪০-১৭১৮, ২৪৭-৭৮৭২, ৪০-১১০৮

আঞ্চলিক অফিস ঃ কর্মধন ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস ঃ পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বস্তরীণ উন্নতি ও কৃষিই নয়-কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পেও উপরও নির্ভরশীল। ওপর সেই সমবায় ভাবি বহুমুখি ব্যাঙ্ক স্থাপনকল্প পরিকল্পনার সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

এক নজরে

- বর্তমান আর্থিক বছরে ঋণ দানের লক্ষ্যমাত্রা ৫০ কোটি — তার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ৩২ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সাড়ে ১৪ কোটি ও আবাসন প্রকল্পে সাড়ে ৬ কোটি।
- বিগত আর্থিক বছরে ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কৃষিতে ২৩ কোটি ১৭ লক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ, আবাসনে ১ কোটি ৪ লক্ষ, প্রাথমিক স্তরে আদায় হয়েছে ৪৭.০৮% এবং বিগত বছরে ২১.১১% উপকৃত হয়েছে ঋণ গ্রহিতাই।
- ঋণদান ও বিপণন প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এল সি ডি সি-টু ও বি প্রকল্পে উপকৃত আদিবাসী ও প্রান্তিক সমবায় সমিতি।
- এল এইচ বি ও এইচ ইউ ডি সি ও (হাউজো)-র সহায়তা আবাসন প্রকল্পে ঋণের ব্যবস্থা আরও স্বচ্ছন্দতর
- প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে ভাই সি এম এ আর ডি (ইকমার্ড) কর্মসূচির (ট্রেনিং অফ ট্রেনার্স) সমবায় আন্দোলনের এক নব ইতিহাস।

ড. রেজাউল্লা খোন্দ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডল, এম এল এ
চেয়ারম্যান

ছয় দশকের অধিককাল জনসেবায় নিযুক্ত

দি শিবপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৭৩, ১৭৪ নং শিবপুর রোড
হাওড়া - ৭১১ ১০২
ফোন : ৬৬০-২০৫৮

আমাদের কল্যাণমুখী প্রকল্পের কয়েকটি :

- বোটানিক্যাল গার্ডেন অঞ্চলে শাখা অফিস।
- সভ্যদের জন্য সুবিধাজনক শর্তে ঋণ।
- গৃহ নির্মাণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ।
- স্বল্পমেয়াদি ঋণ।
- অনগ্রসর ও দুর্বল শ্রেণীর জন্য সহজ শর্তে ঋণ।
- মূল্যবান সামগ্রীর সুরক্ষায় লকারের ব্যবস্থা।
- প্রায় সকল প্রকার জমার ক্ষেত্রে অধিক হারে সুদ।
- সকাল সন্ধ্যায় ব্যাঙ্কিং-এর সর্বাধিক সুবিধা।
- বকখালি, পুরী, দীঘা, দার্জিলিং এবং কোয়েলে সর্বস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত হলিডে হোম।
- সর্বসাধারণের জন্য সহজ শর্তে এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা।

আলোচনা

স্তালিন - রটনা ও ঘটনা

গত আগস্ট ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী শ্রী ভরত সান্যাল তাঁর প্রবন্ধ (ঘরিয়া না মরে সমাজতন্ত্র) সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের সভাপতি জোসেফ স্তালিন সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেছেন। সেভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি একবার ১৯১৮-১৯ সালে যে ঘোষণা দিয়েছিলো "বুলেশভিক সমবায়ে ১৯২৮ সাল থেকে একটু ঘুরানোভাবে একই কাজ করেছিল স্তালিন। যে প্রতিবাদ করেছে তার আশা ভাঙা দেখে যা সে নির্বাসিত হয়েছে"

সত্যি কি তাই?

স্তালিন জন্মেছিলেন রাশিয়ার দ্বারা নির্যাতিত জর্জিয়ার এক ভূমিদাস পরিবারে - বাবা ছিলেন পেশায় মুচি, মা পরিচারিকার কাজ করতেন। তাই জন্মসূত্রেই তাদলোকদের কাছে তিনি ছিলেন ছোট্ট। অবশ্যম্ভাবেই তিনি কমিউনিস্ট হয়ে সারা জীবন ছোট্ট হয়ে রইলেন। মৃত্যুর পরও তাঁর ছোট্ট নয় কুখ্যাতি। তাঁর প্রধান অপরাধ তিনি শ্রেণীচ্যুত হননি।

কেমন লোক ছিলেন স্তালিন? তিরিশের দশকের মিনস্কলিতে (১৯৩৬-৩৮) সেভিয়েত ইউনিয়নে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন জোসেফ ডেভিস। তিনি তার মেয়েকে একান্ত একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে স্তালিন সম্পর্কে জানাচ্ছেন—

"আমার আদরের সোনামণি, মস্কো-৯ই জুন, ১৯৩৮

কৃষ্ণ সাগর ভ্রমণ সেরে মস্কো ফেরার পর থেকে মার্শারী (জোসেফ ডেভিসের স্ত্রী) আর আমি তোমার অভাব যে কতটা অনুভব করছি তা বলে বোঝাতে পারবো না। তুমি এখানকার পরিস্থিতির তাৎপর্য পুরোটাই অনুধাবন করতে পারো এবং সে কারণেই তুমি গত সপ্তাহের অভিজ্ঞতার সঙ্গী হতে পারতে। তাই তোমার অনুপস্থিতি আমাদের কাছে নিদারুণ মনে হয়েছে —

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অধিনে ছেড়ে এবং প্রধানমন্ত্রীর পদে বসার পর থেকে কলহের ঝড় কয়েক মিনিটের মধ্যে মুহূর্তাদের খোলা দরজা দিয়ে এক স্তালিনকে আসতে দেখে পুরোপুরি বিস্তারিতভূত এবং চুপ. হোয়া হয়ে গেলাম। এরকম ঘটতে পারে তার সামান্যতম ধারণাও আমার ছিল না। প্রথমত তিনি রাষ্ট্রপ্রধান নন আর তাঁকে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান থেকে দূরে রাখাই তাঁদের উদ্দেশ্য। তুমির জান কোন কূটনীতিকই তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারে বা অন্যভাবে ব্যক্তিগত উপহার দেয়া করেন না। বস্তুত তিনি এরকম সাক্ষাৎকার এড়িয়েই চলেন। এত অতিথাবে তাঁকে জনসমক্ষে দেখে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে তিনি যখন কোন বিদেশিকে অভ্যর্থনা জানান তা প্রায় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি ভিতরে এলে আমি উঠে এগিয়ে গিয়েছিলাম। উনি হেসে আমাকে আন্তরিক সম্ভাষণ জানালেন - খুব অমায়িকভাবে অন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁকে দেখে মনে হল তিনি প্রজ্ঞাবান এবং এক দৃঢ় মনের অধিকারী তাঁর স্বভাবী চোখ অতিরিক্ত সহানুভূতিশীল এবং স্নিগ্ধকর। -যে কোন শিশু তাঁর কোলে বসতে চাইবে, কুকুর চাইবে কাছে গা ঘেঁষে। তাঁর ভদ্রতা এবং ধরনধারণ ও শান্ত সরলতার সাথে রেড আর্মি সেনাপতিদের মধ্যে অবস্থিতদের ঘনিষ্ঠতার ও মিলন এবং এইরকম আরো যা এখানে ঘটেছে তা মুক্ত করা কঠিন। তার বন্ধুরা বলেন এবং রাষ্ট্রদূত ব্রায়ানেরও তাদের সঙ্গে একমত যে জার্মানীর বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষার জন্য এসব করতে হয়েছিল এবং একদিন "তাঁদের অবস্থান" মার্কিনিরা বুঝতে পারবে।

আমরা সেই টেবিলে বসলাম এবং একজন দোভাষী নিয়ে দুঘন্টা কথা বলেছিলাম। স্বাভাবিকভাবে আমাদের আলোচনা এখানে বিস্তৃত করা যাবে না কারণ তা কেবল প্রেসিডেন্ট, স্টেট-এর সেক্রেটারি এবং অন্যদের সারসংক্ষেপ জন্য। তবে আমি বলতে পারি যে আলোচনার পরিধিতে অর্থনীতির পুরো ক্ষেত্র, রাশিয়ার জন্য শিল্প সংক্রান্ত পরিস্থিতি, যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিত্ব, ইউরোপের অবস্থা সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি সবই খুব সাবলীলভাবে ছিল। এ সবিতেই বুদ্ধিদীপ্তি সঙ্গেও তাঁর আনন্দের, যা আমরা উপভোগ করেছিলাম। আদ্যোপান্ত আমরা কৌতুক করেছিলাম এবং মাঝে মধ্যে হেসেছিলাম। তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ আছে। আছে মহান মনোবৃত্তি তা তাঁর, ভিতরে আর সর্বোপরি সুবিবেচিত প্রজ্ঞাদীপ্ত-অন্তত আমার এমনই মনে হয়েছে। তবি তুমি এখন একটি ব্যক্তিত্বকে চিত্রিত করতে পারো যা যে কোন স্থানে উৎকৃষ্টতম স্তালিন বিরোধীর কল্পিত চরিত্র চিত্রায়নের সম্পূর্ণ বিপরীত তাহলেই তুমি এই মানুষটির প্রকৃত ছবি পাবে।

যে পরিস্থিতি এখানে বিরাজমান বলে আমি জানি আর তাঁর ব্যক্তিত্ব ঠিক যেরকম ব্যবহারে। এই অন্তের সরলত্ব ব্যাখ্যা দিলতে পারে যে মানুষ ধর্মের জন্যে অথবা একটা উদ্দেশ্যের সঙ্গে যা করবে অন্যথায় তারা তা কখনোই করবে না। পৃথিবীর নৃশংসতম আচরণসমূহ কর্মোন্মত্তরাই এনেছে।

বস্তুত আমি এসমস্ত লিখছি এই বৃদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে যে তোমাদের মধ্যে কেউই এখন এ চিঠি প্রকাশ করবে না। তবে আমার মনে হয় সামনের দীর্ঘ বছরগুলিতে এসব তোমাদের কাছে কৌতূহলকর এবং মূল্যবান হবে। কারণ, এটা সেই মানুষটির এবং যে অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিল তার অকপট এবং বস্তুনিষ্ঠ চিত্র।

তাঁর কথা এবং অন্তত থেকে যাওয়া কথা থেকে আমেরিকার বর্তমান রাষ্ট্রদূতের থেকে এমনতরো আলাদা ব্যবহারের কারণ আমার মনে হয়েছে একারণে। সর্বাগ্রে এই সরলত্বের যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সদয় অনুভূতি আছে। তার নিচে রাশিয়ার জনসাধারণও আমেরিকাবাসীদের প্রতি সদয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভূতি আছে। মৌলিকভাবে তারা গ্রহণ করতে পারে না এমন কিছু আমাদের নেই। তাদেরও এমন কিছু নেই যা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। আর

এই দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক একেবারেই আসলে এটাই সবচেয়ে জরুরি। তাহলে তাঁদের বক্তব্য থেকে মনে হয় যে আমার কাজের চরিত্র ও বৃদ্ধিজীবী -এ দুইয়ের দ্বারা তাঁরা খুব প্রভাবিত হয়েছেন। স্তালিন তাঁদের নিয় সম্পর্কের অবনতির ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বললাম। তিনি বললেন সম্ভবত আমি তাঁদের সম্পর্কে অন্য কোন বিদেশীর চাইতে ওয়াকিবহাল আর সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়নে যাঁরা আছেন তাঁদের চাইতেও। কারণ আমি অনেক ব্যাপকভাবে অধি সম্মতিই ঘুরেছি। আপাতভাবে আমার উৎসাহ এবং কাজ তাঁদের সবাইকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। পর সন্ধ্যায় ক্রিমলিনে ভজনায় (প্রথমে ভবন) আমাদের বিদায় উপলক্ষ্যে সরকারের দেওয়া ভোজসভায় বিদেশমন্ত্রী মিলোটনভের বন্ধুতার নকল আমি সঙ্গে নিয়ে। এ বিষয়ে এটা আলোকপাত করবে। তা ছিল স্পষ্ট এবং অত্যন্ত আত্মতৃপ্তিকর, আমি নিশ্চিত তিনি যা বলেছিলেন।

তার মর্ম এরকমই তারপর তাঁরা আমার দৃষ্টিকোণের লক্ষ, তথ্যসংগ্রহে প্রচেষ্টা আর ব্যক্তিগত জান নির্ভর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়।

তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁদের উপর প্রভাব ফেলেছিল আমার সততা, যেমন তাঁরা বলেন কারণ আলাপচারিতায় আমি প্রায় নির্বিচারভাবে স্পষ্টবক্তা ছিলাম-নিজস্বভাবে, রাজনৈতিক ধ্যান এবং প্রক্রিয়ার আনন্দের সঙ্গে তাঁদের স্বভাবের বৈপরীত্যের সমালোচনায়। আমি সব সময়ে মনে মনে পরিস্থিতির মোল ঘটিয়েছিলাম। তবে এই সহনশীল পরিস্থিতিতে যে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামতের অধিকার আছে এবং কেউই গোঁড়ামি বা আক্রমণাত্মক ভাব নিশ্চিত হতে পারেন না যে একমাত্র তাঁর মতই সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। তাঁরা সবাই সেটা বিষয়েই স্বীকৃত করেছেন। এমনকি লন্ডন থেকেও আমি তা শুনেছিলাম, লেডী ঊইলনিয়ানস টেলর আমাকে বলেছিলেন যে সেখানকার রুশ রাষ্ট্রদূত তাঁকে বলেছিলেন "আমরা ডেভিসকে পছন্দ করি। তিনি আমাদের সঙ্গে একমত নন কিন্তু আমরা তাঁকে অত্যন্ত সৎ লোক বলেই বিশ্বাস করি।"

তোমার কথা

(এই চিঠিটির উদ্ধৃতাংশ নেওয়া হয়েছে জোসেফ ডেভিসের 'মিশন টু মস্কো' বই থেকে)

এবার শোনা যাক চিলির বিপ্লবী কবি ও বুদ্ধিজীবী পাবলো নেরুদার মুখ থেকে —

সোভিয়েত রাশিয়াতে যখনই গিয়েছি, কিন্তু কখনও মলোটভ, খ্রিশ্চিভ, ব্রেজনেভ বা মিখেয়েল কালিনের সঙ্গেই সাক্ষাতকারের সুযোগ আমার হয়নি। তবুও আমি জেনেছিলাম যে, তাঁরা অনেক বেশী সাধারণ ও অনেক কম রহস্যময় ব্যক্তি।

স্তালিনকেও আমি কয়েকবার একই জায়গাতে দেখেছি-তাও অনেকখানি দূর থেকে দা ১মে ও ৭ই নভেম্বরে রেড স্কোয়ারের মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে। স্তালিনের নামাঙ্কিত 'স্তালিন পুরস্কার' কমিটির একজন সভ্য হিসাবে ক্রেমলিনে আমি বেশ কয়েক ঘন্টা কাটিয়েছি কিন্তু কোনদিনও স্তালিনকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। কোনদিন কোনো ভোটাভুটির সময়ে বা বিপ্রাহরিক আহারে আসনে এমনকি সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার হিসাবেও স্তালিনের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়নি। সাধারণত 'স্তালিন পুরস্কার' টি সর্বসম্মতিক্রমেই দান করা হতো। অবশ্য মাঝে মাঝে এই নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক হয়। তখন আমার মনে হতো হয়তো অন্তিম মুহূর্তটিতে স্তালিন এসে হাজির হবেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে আমাদের তাই গ্রহণ করতে নির্দেশ দেবেন। কিন্তু আমার মনে পড়ে না যে, কোনো সময়েই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বা মতের দ্বারা আমাদের প্রভাবিত করেছিলেন বা আমাদের কোনো সিদ্ধান্তকে তিনি আমল দিয়ে অসম্মান করেছেন। আমার কাছে আশ্চর্যের কথা — যার কয়েকটি দেওয়ালের ব্যবধানে থেকেও তাঁর উপস্থিতিটা আজও তিনি আমাদের জানতে দেননি। এই রহস্যময় মানুষটি সম্বন্ধে আমার মনে হতো-হয়তো তিনি খুব লাজুক, নয়তো নিজের রচিত রহস্যজালে তিনি নিজেকে সদা সর্বদাই আবৃত করে রেখেছেন। আমার মনে হয়েছে রহস্যের বেড়াজালে আবদ্ধ স্তালিনের জন্য বেরিয়াই হয়তো দায়ী। কারণ তখন দেখেছিলাম, একমাত্র বেরিয়াই যে কোনো সময়ে স্তালিনের ঘরে যাবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী।

যার একবারই এই রহস্যময় মানুষটির সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশ সাক্ষাৎকার হয়েছিলো। সেবার আমি ও এ্যারাগোঁ-সস্ত্রীক মস্কোতে 'স্তালিন পুরস্কার' সমিতির সভায় যোগ দেবার আগে ওয়ারশতে দুদিন কবির মতে আটক পড়ে গেলাম। আমাদেরই সঙ্গী একজন রুশিয়ানকে আমাদের পরিচয় জানিয়ে অনুরোধ করলাম যাতে মস্কোতে তিনি টেলিফোন করে আমার ও এ্যারাগোঁর মনোনীত ব্যক্তিকে আমাদের 'ভোট' দেওয়ার জন্য সমিতিকে খবরটা দেন। এই রাশিয়ান ভদ্রলোকটি টেলিফোনে খবর পাঠিয়ে উত্তর পাবার পর আমার একান্তে ডেকে নিয়ে যে কথাটি বললেন তা শুনে সেদিন স্তম্ভিত ও বিস্মিত না হয়ে পারিনি। তিনি বলেছিলেন-কমরেড স্তালিনের কাছে যখন এ বছরের 'স্তালিন পুরস্কার' দানের সম্ভাব্য নামের তালিকা দেখানো হয়েছিলো তখন তিনি নাকি প্রশ্ন করেছিলেন, এই তালিকায় মধ্যে 'পাবলো নেরুদার নাম নেই কেন?

পরের বছরই মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং পৃথিবীতে শান্তির প্রচারের জন্য আমি এই পুরস্কার পেয়েছিলাম, এবং এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে যদিও আমার মনে হয়েছিলো-এটি আমার যথার্থই প্রাপ্য তবু সেই রহস্যময় মানুষটি আমার অস্তিত্বকে না জেনেও কেন স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে পুরস্কারটি আমারই প্রাপ্য তা আজও আমার কাছে রহস্যাবৃত।

আরো কয়েকটি ব্যাপারে স্তালিনের নিজস্ব হস্তক্ষেপের সংবাদ আমি জানতে পারি। তখন বিশ্বজনীনতা বা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়ার চেষ্টা চলেছে এবং সেই দলের কিছু গোঁড়া লোক ইরেনবুর্গের মাথাটা কেটে নেবার জন্য আগ্রহী।

এই সময়ে একদিন সকালে ইরেনবুর্গের বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠলো। লুবিয়া টেলিফোন তুলতেই টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে অস্পষ্ট একটা জেনা গলা শোনা গেল।

'ইলিয়া গ্রীগরিভিচ্ কি বাড়িতে আছেন?'

লুবিয়া উত্তর দিলেন, 'আপনার পরিচয়ের ওপরই সেটা নির্ভর করছে।'

উত্তর এল 'আমি স্তালিন বলছি।'

দুনিয়া টেলিফোনটি ইহরেনবুর্গের হাতে তুলে দেওয়ার সময় বললেন, 'মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে কেউ রসিকতা করছে।'

কিন্তু ইহরেনবুর্গ স্তালিনের গলা চিনতে ভুল করেননি। স্তালিন বলেন,

'সমস্ত রাত ধরে তোমার লেখা উপন্যাস 'পারীর পতন' পড়েছি। আমার টেলিফোন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রিয় বন্ধু এরেনবুর্গ তুমি এই ধরনের লেখা আরো অনেক অনেক আগে লেখো সেজন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।'

হয়তো স্তালিনের সেদিন সকালের এই আকস্মিক টেলিফোনই ইহরেনবুর্গকে দীর্ঘ জীবন দান করেছিলো।

আরো একটা ঘটনা। মায়াকোভস্কি তখন মৃত, কিন্তু তাঁর লেখা সমালোচকরা সোভিয়েত সাহিত্যের মানচিত্র থেকে তাঁর নামটা মুছে দেবার জন্য প্রায় বদ্ধপরিকর। কিন্তু হঠাৎ কি যেন হলো দেখা গেল সব চুপচাপ। মায়াকোভস্কির প্রতিভা চিনি ক্রিক স্তালিনকে একটা চিঠিতে সব কিছু জানিয়ে অনুরোধ করেছিলেন যাতে মায়াকোভস্কি সৃষ্ট সাহিত্য-সম্ভার এই মারাত্মক আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানো যায়। উত্তরের সেই চিঠির এক কোণে স্তালিন নিজের হাতে লিখেছিলেন ঃ 'সোভিয়েত সাহিত্যে মায়াকোভস্কি সর্বোত্তম কবি'। এর ফলে মায়াকোভস্কির কঠোর সমালোচকদের দলবদ্ধ অভিযান একটা প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এর পরেই মায়াকোভস্কির নামে রাস্তার স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হলো এবং তাঁর অসামান্য প্রয়োজনীয় বহু সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকলো। যেহোতার যন্ত্রণাঘাতে মায়াকোভস্কির সত্যরূপ বোঝা হয়ে গেছেন।

আমি শুনেছিলাম, স্তালিনের মৃত্যুর পর একটি সোপন ফাইল পাওয়া গিয়েছিলো যার উপরে তাঁর হাতের লেখা ছিলো ঃ 'সোপনীয় এই ফাইল যে কেউ খুলো না।' এই ফাইলের কাগজপত্রে যে কজনের নাম প্রথমেই ছিলো তাঁরা হলেন সঙ্গীত রচয়িতা শস্টাকোভিচ্, আইসেনস্টাইন, বরিস পাস্তারনেক, ইহরেনবুর্গ ইত্যাদি।

অনেকেই আমায় বলেছেন আমি স্তালিনপন্থী। স্তালিনবাদী ও প্রতিবিপ্লবীদলরা আমার সম্বন্ধে বলে থাকেন আমি নাকি স্তালিনের কাছথেকে তাঁতা ঃ আজকের এই মারাত্মক বিভ্রান্তির মূলে যে কোনো সত্যতাই সত্যপর।

আমাদের-কমিউনিস্টদের ব্যক্তিগতভাবে এটাই দুঃখের যে, স্তালিন সমস্যার সম্মুখীন হতে গিয়ে অনেক সময়ে আমরা উপলব্ধি করি সত্যটাই ঠিকপথে। ঘটনার এই রহস্য উদ্ঘাটন আমাদের সকলকে স্থবির করে তোলে। কেউ কেউ মনে করেন তিনি চরিত্রহীন হয়েছেন। কেউ কেউ শত্রুপক্ষের কথায় বিশ্বাস করে তাদের দ্বারাই প্রভাবিত হন। আবার কেউ কেউ বিশে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কমিউনিস্ট একতার কথা চিন্তা করে পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে চান এর সত্যাসত্য এবং আন্তর্জাতিক সামাজিক দায়িত্ব।

এই কথাটা খুবই সত্য যে, ঘটনাটা আমাদের সকলকেই ভাল করে দিতে হবে। যদি কোনো অপরাধের সমালোচনা আমরা না নিতে শিখি, তাহলে আমাদের নিজস্ব সমালোচনা ও ব্যাখ্যার আমাদের নিজেদেরই বলতে হবে এবং আমাদের সেই অস্ত্র খুঁজে বার করতেই হবে যাতে কমিউনিস্ট জগতের যোগাপড়ার মধ্যে একটা সমঝোতা থাকে।

আমি বিশ্বাস করে দেখেছি যে, স্তালিন বারবারই আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমার অজান্তে অবচেতনে তেন করে তাঁর আলোকময় উপস্থিতি অনুভব করেছি। কবির মতই ছিলো আদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য, সহজ ও সরল ছিলো তাঁর হৃদয়। এই মানুষটিই রাশিয়ার বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর আদর্শকে রক্ষা করেছেন, মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর নাম মুখে নিয়ে রাশিয়ার লক্ষ কোটি মানুষ হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন।

একজোড়া বিরাট গোঁফ নিয়ে ছোটোখাটো চেহারার এই মানুষটি অপরাজিত এক সেনানায়ক মতো রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে হিটলারের হাজার-লক্ষ ফাসিবাদী সৈন্যকে ধ্বংস করেছেন। অন্ত আমি আমার মাত্র একটি কবিতা তাঁর জন্য উৎসর্গ করেছি। এই কবিতাটি আমি তাঁর মৃত্যুর সময়ে লিখেছিলাম যা আমার রচনাবলীর মধ্যে পাওয়া যাবে। ক্রেমলিনের এক চক্ষু এই মানুষের মৃত্যু সেদিন সারা পৃথিবীকে কাঁদিয়ে নিয়েছিলো। মানুষের জগল সেদিন আতঙ্কে শিহরিত হয়ে উঠেছিলো, আমার কবিতায় পৃথিবীর সেদিনের সেই আতঙ্কেই রূপ দিয়েছিলাম।

(অনুস্মৃতি-পরলো নেরুদা)

□ মনসুকুমার রায়

▲▲▲

আজি কী তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে মঙ্গল শোভাতে।

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে
বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।।
মাণিক গাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কনে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে
কুঞ্জছায়া ওঞ্জরণের সংগীতে
ওড়না ওড়ার একি নাচের ভঙ্গিতে
শিউলি বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি।।

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

৫ি ১৬১/১, বি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ৩৪-৪৯০১/৩৪-৫৬১৪

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।
বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ● মৎস্যের পুষ্ট প্রজাত লালন-পালন ● মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ● মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যন্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ● বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা প্রকল্প ● সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ব্লকভিত্তিক কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সবিস্তার সম্প্রসারণ
● কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবার জন্য মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

যাঁরা, বেনফিস বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটিএকনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Limited

11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone : 248-9413, 248-2621

Membership Over 28,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U.P., H.P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Accounts allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guid lines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Reinvestment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

IN THE

CHANGING SCENARIO

AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION

INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOUR SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL COOPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind

In Eastern India, rendering services

for 76 years by a net work of 34 branches

throughout the district in the field of

Agriculture, Cottage and Small Industries, etc

SAVE WITH

BARDHAMAN BANK

FOR

YOUR SAFETY

BHANDAR ☐ Regn. No. 5451/62 ☐ Sept. & Oct. 95 ☐ Vol. XXXIII ☐ Postal Regd. No. WB/CC-199

আপনার, আমার, সকলের ব্যাঙ্ক

বালী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

৩৯৬, জি টি রোড, বালী, হাওড়া
দূরভাষ - ৬৫৪-২১০৮

- সকাল ও সন্ধ্যা উভয় সময়েই লেনদেনের সুযোগ, এমনকি রবিবার সকালেও।
- বিভিন্ন জমা প্রকল্পে যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিক সুদ।
- সহজ শর্তে এন এস সি/আই ভি পি/কে ভি পি এবং স্বর্ণ বন্ধকি অগ্রিমের সুবিধা।
- গিফ্‌ট চেক, পে-অর্ডার, 'লকার'-এর সুবিধা আছে।
- একটা পূর্ণ ব্যাঙ্কের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা গ্রহণে আজই আসুন।

মনে রাখবেন, এই এলাকার আমানত এই এলাকার আর্থিক মানোন্নয়নেই ব্যয়িত হয়।

দিনীপকুমার ভাদুরী
সভাপতি

নিরঞ্জন দত্ত
সম্পাদক

সুবীর ব্যানার্জি
চিফ এক্সিকিউটিভ্

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অসীম রায় কর্তৃক ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (আটতলা), কলিকাতা - ৭০০ ০০১ (ফোন নং ২২০-৮১৯৮) থেকে প্রকাশিত এবং আরডি প্রিন্টার্স, ১৮০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত।

শারদীয় সংখ্যার মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা